ভারতের সাধিকা

প্রথম পর্ব

ভবেশ দত্ত

প্রথম প্রকাশ : শুভ নববর্ষ ১৩৫৭

প্রচ্ছদ শিল্পী—প্রভাত কর্মকার

: সুমিতা করাতি, দাশনগর, হাওড়া ।
সুনীলকুমার রুদ্র, রুদ্র এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
লেন, কলিকাতা—ছয় ।

শ্রীসন্তোষ কুমার সরকার

শ্রীমতীবেবী সরকার কে !

—বাবা

● প্রথম কথা ●

পুত্র শোকের নিদারুণ বেদনায় যখন হৃদয় জ্বলে পুড়ে ছাই হোয়ে যাচ্ছিল তখন সেই বেদনা নিবারণের জন্য নানারকম প্রলেপ দিয়েছিলাম। শেষে একমাত্র ঈশ্বরের নাম, স্মরণ ও তাঁর চিন্তা এই তাপদগ্ধ হৃদয়কে কিছুটা শান্ত কোরেছিল। ঈশ্বর যে পরম করুণাময় ও তাঁর নামে, স্মরণে, মননে যে প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করা যায় এ মহাজন বাক্য যে কত সত্য তা কিছুটা অনুভব করেছি নিজের এই তাপদগ্ধ জীবনে।

সত্যশান্তি দায়ক এই ঈশ্বরানুরাগ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী অনুধ্যানে, ফলে আমার মধ্যে জন্ম নেয় তাঁদের কয়েক জনের প্রতিচ্ছবি। যাদের পবিত্র জীবনলীলা আর কথামৃত আমার হৃদয় কমলে ফুটে ওঠে, তাঁদের কথা দিয়ে তাঁদেরই কথা লিখি। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা। তাঁরা হোলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা, সাধক কমলাকান্ত, প্রভুনিত্যানন্দ ও নিগমানন্দ পরমহংস।

একদিন মনে হঠাৎ চিন্তা এলো যে নরদেহেও কি ঈশ্বরের আবাসস্থল কিন্তু তা তো নয়! পুরাকালে মুনি ঋষিদের চিন্তাধারার ভিতরে সমান ভাবে প্রবাহিত। তাই হৃদয়ের মাঝে একে একে দেখতে পেলাম মীরাবাঈ, সারদামণি, বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরীমাতা ও রাণী রাসমণিকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্যের পোষাকে সজ্জিত পরমআত্মা। এইবার অনুভব করলাম জীবের ভিতরে যখন প্রকৃত শক্তির আধার হয় তখন জীব হয় শিব। সংগে সংগে একটা প্রার্থনা মনে জাগল যেন পরম করুণাময় ভগবান আমাকেও একটু কৃপা করেন! তাঁর কৃপা পাবো এমন সুকৃতি আমার কই? তাই মনে হোচ্ছে, ধন্য ঈশ্বর নাম গান যাঁর কৃপায় আমার মতন কীটানুকীটও ধন্য হয়!

প্রথম খণ্ড লিখতে গিয়ে যে সমস্ত ঈশ্বর কৃপা বর্ষিত লেখকবৃন্দের পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি তা হোল "মীরা"—ব্রজনন্দন সিংহ, ভক্তমাল গ্রন্থ। "বিষ্ণুপ্রিয়া"—মৃণালকান্তি দাসগুপ্ত। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"—হরিদাস গোস্বামী। "রাণী রাসমণি"—শ্রীসুধীন

বন্দ্যোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ কথামৃত, "রাণীরাসমণি"—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, "গৌরীমাতা"—সারদেশ্বরী আশ্রম প্রকাশিত। "শ্রীশ্রীসারদামণি"—শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

পরিশেষে আর দুজনের নাম করে এই ভূমিকা শেষ করব। তাঁরা হোচ্ছেন জ্ঞানতীর্থের কর্ণধার শ্রীকানাইলাল দাস এবং আমার পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রীঅজিত বসুমল্লিক এঁদের উৎসাহ এবং সহোযোগিতা না পেলে এই ধরনের লেখা আমার হোত কিনা সন্দেহ। জানিনা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ আমার এই অধম লেখনী প্রসূত লেখা পড়ে কতখানি প্রশান্তি লাভ করবেন। তবে শ্রেণী বিশেষ পাঠক-পাঠিকাদের রুচি বা সাহিত্য তৃপ্তির ওপর নির্ভর করে লিখিনি, লিখেছি লেখার আনন্দে! যদি পাঠক বৃন্দ কিছু মাত্র আনন্দ লাভ করেন তবেই নিজেকে ঈশ্বরের কৃপাধন্য বলে মনে করব।

ভবেশ দত্ত

গিরিধারীপ্রিয়া

মীরাবাঈ

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নতুবা আদি অবশানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।"

গ্রামে বিয়ে। সন্ধ্যেবেলায় বর এসেছে পাত্রীর বাড়ী। আশপাশের বাড়ী থেকে মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে বর দেখতে। বাজী বাজনায় চারিদিক আমোদিত। কেউ বোলছে, কি সুন্দর বর! দেখতে যেন রাজপুত্তুরের মত। কেউ বোলছে মেয়েটার কি সুন্দর ভাগ্য এমন স্বামী পাবে।

পাঁচ বছরের মীরা একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে বর। দুচোখের পলক যেন পড়ছে না—কোন তিথির চাঁদ যেন আকাশে! সে যেন একদৃষ্টে দেখছে।

বর দেখে সবাই ফিরলো।

মীরা ফিরে এসে মাকে বোললে: মা আমার বর কই, আমার বর কবে আসবে?

মা মেয়েকে আদর কোরে কোলে তুলে নিয়ে বোললেন: তোর বর তো কবে এসে গেছে।

মীরা কোল থেকে নেমে বোললে: কই মা কোথায় আমার বর?

—ঐ তো, তোর বর—গিরিধারীলাল।

—গিরিধারীলাল! কি সুন্দর বর আমার।

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন বোই।
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহি কোই।
ছোড় দই কুল কি কাল ক্যা করেগা বোই॥
সন্তন টিগ বৈঠি বৈঠি লোকলাহ খোই।
অঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বেল বৈ॥
আব ত বেল্ ফৈল গই আনন্দ ফল হোই।
দাসী মীরা গিরিধর প্রভু, তার অব মোহি॥

মীরা সেই থেকেই গিরিধারীলালকেই চিরজনমের মত স্বামীত্বে বরণ কোরে নিলেন।

পাঁচবছরের মেয়ে মীরার সমস্ত অন্তর যেন কানায় কানায় পূর্ণ হোয়ে গেলো। গিরিধারীলাল যার স্বামী তার আবার অভাব কিসের। তার আবার দুঃখ কোথায়।

মীরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো।

আকাশের চাঁদ এর কাছে বুঝি কিছু নয়। ঐ যে গগনঘেরা কোটি কোটি নক্ষত্র, ঐ যে আকাশ আলো করা পূর্ণ চন্দ্র, এ সব যাঁর সৃষ্টি সেই গিরিধারীলালই তো মীরার স্বামী।

সারা জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যিনি শ্রেষ্ঠ প্রেমিক, যিনি জীব-ত্রাতা, পাপীতাপী উদ্ধারকারী, শোকে শান্তি, দুঃখে পরামানন্দ, অশ্রুজলে হাসির ঢেউ তিনিই তো পরম করুণাময় শ্যামসুন্দর গিরিধারীলাল।

জীবনের যিনি জীবন, প্রাণের যিনি প্রাণ, অন্তরের যিনি অন্তর সেই গিরিধারীলাল আজ মীরার একান্ত আপন জন, অন্তর দেবতা।

মীরার একমাত্র ইষ্ট হোল গিরিধারীলাল।

পাঁচ বছরের মেয়ের এত ভালবাসা এত প্রেম?

কেমন কোরে তা সম্ভব হোল। যে বয়সে মেয়েদের ভালো কোরে কথা উচ্চারণ হয় না, অক্ষর পরিচয় হয় না, দেহ মন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় না, মীরা সেই বয়সে এমন ভালোবাসা আর প্রেম পেলো কোথায়?

এ প্রেম গোপনে বুঝি হৃদয়ে ছিল।

এ ভালোবাসার বাসা বুঝি আগে থেকে তৈরী হোয়েছিল।

তা না হোলে প্রেমিক নাগর কিভাবে এসে প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে মিলবেন।

ভক্ত মীরা হৃদয়টা কোরে রেখেছেন প্রেম সরোবর।

এ সরোবরে ডুবতে পারে যে, সে তো গিরিধারীলাল ছাড়া আর কে হবে। যুগে যুগে প্রেমিক ভক্তের হৃদয়েই তো ভগবানের আসন।

ভক্তের ডাকেই ভগবান চঞ্চল।

মীরা বুঝি ডাকা সুরু কোরেছেন কোন্ জনম থেকে তার প্রেমিক-নাগরকে তা কে জানে—হয় তো এক জনমেই তাঁর পূর্ণ সিদ্ধি হবে। কে জানে পাঁচ বছরের মেয়ে কখনও সারা জনমের মত এক জনের কাছে বিকিয়ে যেতে পারে। মীরা বুঝি জানে সে কলাকৌশল—কেমন কোরে সর্বস্ব ত্যাগ কোরে ভবের হাটে দুনিয়ার বড় মহাজনের কাছে নিজেকে বিক্রী কোরতে হয়, কেমন কোরে ধন ঐশ্বর্যের সাজ-সরঞ্জাম ফেলে দিয়ে জীবন নাট্যের মহান অধিকারীর কাছে আত্মসমর্পণ কোরতে হয়।

মীরা জেনেছেন বোলেই তো পেরেছেন, পেরেছেন বোলেই তো পেয়েছেন, পেয়েছেন বোলেই তো আটকেছেন।

আত্মনিবেদনই তো আত্মবিনোদন।

আত্মসমর্পণেই তো আত্মার মুক্তিস্নান।

চোকড়ী গ্রামে প্রায়ই এদেশ সেদেশ থেকে সাধুসন্ত আসতেন একদিন মীরাদের বাড়ীতে এক সাধু আসলেন। সাধুর পরনে গেরুয় মাথায় ঝাকড়া চুল তাতে বড় বড় জটা, হাতে একটা ত্রিশূল, কাঁ একটা ঝুলি। মীরা সাধুকে দেখে ভয় পেলেন না। তিনি সোজা গি একটা প্রণাম কোরলেন। মাথা নীচু কোরতে যে জানে সে কিছু কিছু পায়। মীরার এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হোলো না।

সাধু তাঁকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কোরে বোললেন—আ

বাপ্‌রে এ তো বিচ্ছু লেড়কী, তোমহারা গোড়পর সারা দুনিয়া মাথ লোটায়েংগা।

মীরা সাধুর কথা বুঝতে পারলেন না।

কৌতূহলবশতঃ সাধুর ঝুলির ভিতর হাত দিয়ে বার কোরলেন গিরিধারীলালের একটা মাটির মূর্তি।

মীরা মূর্তিটা দেখে একেবারে পাগল হোয়ে গেলো।

এ মূর্তিটা তাঁর চাই।

সাধু তাঁর হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝুলিতে রেখে বোললেন—বেটি এটা ছাড়া আর যা চাও তোমাকে দিতে পারি। বলো, তুমি কি চাও। মণ্ডা, মিঠাই, খেলনা।

সাধু বলে কি!

দুনিয়ার সকল মণ্ডা মিঠাইয়ের চাইতেও যা মিষ্টি বেশী তাই তো রয়েছে ঐ ঝুলির মধ্যে। ধন রত্ন ঐশ্বর্য মণি মাণিক্য হীরা জহরৎ রাজ প্রাসাদের সব কিছুর চাইতেও যা শ্রেষ্ঠ তাই তো রয়েছে ঐ ঝুলির মধ্যে।

না। না। তাঁর ঐটাই চাই।

মীরা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

মাটিতে গড়াগড়ি খায়। আপন হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

চোখ মুখ লাল হোয়ে গেলো।

কেউ তাঁকে বোঝাতে পারে না। কত রঙ বেরঙে পুতুলে ঘর ভরে গেলো।

কত দামী দামী পুতুল নিয়ে আসা হোল।

মীরার কান্না থামে না.

এসব মেকী জিনিষে তাঁর প্রয়োজন নেই।

আসলের যে সন্ধান পেয়েছে তাঁর কাছে এসবের কোন দাম নেই।

সাধু চলে গেলেন।

মীরা খাওয়া ত্যাগ কোরলেন। ঐটুকু মেয়ের কি অসাধারণ শক্তি।

ক্ষুধাভ্রম হোয়ে গেলো, তৃষ্ণা নেই, শুধু কান্না।

চোখের জলে স্নান না করালে প্রেমের ঠাকুর দেখা দেন না।

আকুল সুরে না ডাকলে কি তাঁর সাড়া পাওয়া যায়।

কাঁদতে কাঁদতে চোখ যখন ঝাপসা হোয়ে যাবে তখনই তো খুলবে ভিতরের চোখ। তবেই তো দরশন তবেই তো পরশন।

মীরার এ কান্না সেই দরশনেরই কান্না। পরশনেরই কান্না।

প্রেমের ঠাকুর বুঝি বুঝতে পারলেন।

ওদিকে সাধু আদেশ প্রাপ্ত হোলেন—এ মূর্তি মীরাকে দিয়ে এসো, দরকার তাঁরই। তোমার নয়।

সাধু আর দেরী না কোরে মূর্তিটা এনে মীরার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার জিনিষ তোমাকে দিয়ে গেলাম।

মীরার চোখের জল শুকিয়ে গেলো এক লহমায়।

সারামুখে কি তার আনন্দ, কি অপরিসীম তুষ্টি, কি অনাবিল সুখ।

মীরা মূর্তিটা বুকের ভিতর চেপে ধরলেন!

ভগবানের আশ্রয় তো ভক্তের বুকেই।

সর্বগুণনিধি গিরিধারীলাল মীরার বুক জুড়েই রইলেন।

একেই বলে চাওয়া। একেই বলে পাওয়া।

হৃদয় দিয়ে অনুভব তবেই তো ভাব।

এই ভাবের মাঝেই তো তিনি আসবেন। এই ভাবের সাগরেই তাঁর দর্শন।

ভাবলে তিনি আসবেন।

এই তো মন্ত্র, এই তো জপ তপ।

ভাবো শুধু ভাবো।

তিনিও 'আসবো' 'আসবো' বলবেন।

ইংরাজী ১৫০৩ সালে মেড়তা প্রদেশের চোকড়ী গ্রামে গিধারী-প্রিয়া মীরার জন্ম হয়। যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন সরদার

রাও যোধাজি। যোধাজির পুত্র দুদা আজমীড়ের শাসকের কাছ থেকে মেড়তা প্রদেশ কেড়ে নিয়ে ১৪৬৬ সালে মেড়তা নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যোধপুর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে তিনি ১৪৬৮ সালে মেড়তাকেই রাজধানী কোরলেন। সেই থেকে রাও দুদার বংশধররা 'মেড়তা রাঠোর' নামে পরিচিত হোলেন। রত্নসিংহ ছিলেন রাও দুদার চতুর্থ পুত্র। রত্নসিংহ পিতার নিকট থেকে বারটি গ্রাম পেয়েছিলেন—এই বারোটী গ্রামের মধ্যে চোকড়ী গ্রাম একটা। চোকড়ীর মাটিতে জন্ম নিলেন মীরা।

মেড়তা গ্রামে জন্ম মীরাবাঈ নাম
রাণী যে রাজার বধূ গুনে অনুপম
একান্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অনন্য মানস
প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাহে বশ ॥
অন্য কথা অন্য চেষ্টা অন্য সঙ্গহীন
কাম ক্রোধ লোভ আদি আপন অধীন
অন্তরে শ্রীমূর্তি এক প্রকাশ করিয়া
যতনে সেবা করে ভাবাবিষ্ট হইয়া ॥

রাও দুদা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পূজার্চনা ধ্যান ধারণাতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। ছোট বেলাতেই মীরা মাকে হারানোর পর রাও দুদা তাঁকে মানুষ কোরতে থাকেন। মীরার কৃষ্ণভক্তির পাঠ প্রথম জীবনে রাও দুদার কাছেই। রক্তের স্রোতে যাদের কৃষ্ণনাম আর কৃষ্ণভক্তির আবেগ তাদের বংশের সন্তান হোয়ে মীরা যে কৃষ্ণ প্রেমিক হবেন না সে কথা ভাবতে গেলে আশ্চর্যন্বীত হোতে হয়।

মীরার সংগীত সাধনা ছোট বেলা থেকেই শুরু হয়। তাঁর কণ্ঠে যেন সুরের মুর্চ্ছনা লেগেই আছে। কাজের ফাঁকেও তিনি গুনগুন কোরে ভজন গাইতেন। কচি গলায় ভজন এত মিষ্টি শোনাতো যে অতি সংগীত বিদ্বেষীরও মন গলে যেতো।

মেবারের মহারানা সংগ্রাম সিংহ একদিন রাত্রে অনন্যোপায় হোয়ে

চোকড়ী গ্রামে রত্নসিংহের গৃহে রাত কাটাতে বাধ্য হন। তিনি পরিচয় গোপন করে সে রাতে অতিথি হোয়ে ছিলেন। রত্নসিংহ অতিথি নারায়ণ জ্ঞানে তাঁর সেবা যত্ন কোরলেন। রাত্রিতে হঠাৎ তাঁর কানে কচিগলায় গানের সুর ভেসে এলো--

কুন্দনকে হম ডলে হঁয়ে জব চাহে তু গলা লে,
বাওর না হো তো, হাম্‌কোলে যে অজে আজমা লে,
জৈসে তেরী খুশী হো, সব নাচ তু নচা লে,
সব স্থান্ করলে হর, তৌর দিল জমা লে,
রাজী হঁয়ে হম্ উসীমে জিসমে তেরী রজা হাঁয়,
ইঁহা ইওঁভী বাহবা হাঁয়, আওর উঁওভী বাহবা হাঁয় ॥

মেবারের মহারানা সংগ্রাম সিংহের দুচোখ দিয়ে অবিরাম ধারায় জল গড়াচ্ছে। ভাবের পাত্র বুঝি কাত হোয়ে পড়েছে তাই এই জল ধরা।

সংগ্রাম সিংহ ভাবছেন—এমন গান যে গাইছে তার কতই বা বয়স হবে সে কি জানে এর মানে কি।

রাত পোহালে তিনি রত্নসিংহের কাছে অনুরোধ জানালেন মেয়েটিকে দেখবেন বোলে।

মীরা এসে প্রণাম কোরলেন।

কি অপরূপ চোখ মুখের চেহারা, কি সুন্দর ভক্তিময়ী রূপ।

সংগ্রাম সিংহ মুগ্ধ হোলেন মীরাকে দেখে!

আপাদ মস্তক দেখে তিনি বোললেন: কাল রাতে তুমি গান গাইছিলে?

মীরা মাথা নীচু কোরে বোললে: হ্যাঁ।

—ও গানের মানে জানো।

মীরা নিরুত্তর।

কি জবাব দেবে, সত্যিই তো মীরা তখন জানে না ও গানের মানে কি তিনি শুধু এইটুকু বোঝেন যে তাঁর গিরিধারী লালের পজার

মন্ত্র তো তিনি জানেন না। এ গান তিনি শুনেছেন লোকমুখে তাই এই গান গেয়েই গিরিধারীলালের পূজা করেন।

মানে তিনি বোঝেন না সত্য। কিন্তু এ গান গাইতে তাঁর কণ্ঠ কেন মাঝে মাঝে স্তব্ধ হোয়ে যায়। চোখ কেন জল ঝরায়। মনের গহনে কোথায় যেন তোলপাড় করে। চোখে যদি জলই এলো তাহলে আর মানে বোঝার কি বাকী রইল। সংগ্রাম সিংহ বিদায় নিলেন।

কয়েকদিন পরই তিনি রত্নসিংহের কাছে তার পুত্র কুমার ভোজরাজের সংগে মীরার বিয়ের প্রস্তাব কোরে এক পত্র দিলেন।

রত্নসিংহ রাজী হোয়ে গেলেন।

শুভদিনে মীরার সাথে কুমার ভোজরাজের বিয়ে হোয়ে গেলো।

মীরা স্বামীর ঘর কোরতে চললেন। সংগে গেলেন গিরিধারীলাল।

স্বয়ং গিরিধারীলাল যাঁর স্বামী তাঁর আবার বিয়ে হোল সামাজিক ভাবে।

বিয়ের পর কটা বছর নিজের স্বামী ভোজরাজ ও জগৎস্বামী গিরিধারীলালের সেবা কোরে দিন কাটছিল।

কিন্তু মীরার এ পুতুল খেলার সংসারে বোধন হোতে না হোতে বিজয়ার বাজনা বেজে উঠলো।

কুমার ভোজরাজ মারা গেলেন। মীরার তখন বয়স উনিশ কি কুড়ি।

বিপদ একা একা আসে না।

বাবরের সংগে খানুয়ার যুদ্ধে মারা গেলেন রত্নসিংহ ১৫২৭ সালে। ১৫১৫ সালে মারা গেছেন রাও দাদাজী। রাণা সংগ্রাম সিংহ ১৫২৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কোরলেন।

পর পর এতগুলো বিচ্ছেদাঘাতে মীরা সম্পূর্ণ উদাসীনা হোলেন।

অনিত্য যা সবই প্রায় চলে গেলো।

রইল যা চিরনিত্য গিরিধারীলাল।

মীরার বাঁধন সব যেন ধীরে ধীরে খুলে যায়। গিরিধারীলালের সেবা আর আরাধনাই তাঁর জীবনের নিত্য ব্রত হোল।

মীরা এইতো মনে মনে চেয়েছিলেন।

সংসারে নিত্যবস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া কোরতেই তো তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। গিরিধারীলাল মাঝখানে তাকে এই সব শোকতাপ দিয়ে যেন চালুনি দিয়ে একটু চেলে নিলেন।

অত বড় বংশের মেয়ে অত বড় প্রবলপ্রতাপান্বিত শিশোদীয় বংশের তিনি কুলবধূ।

সব ভুলে গেলেন তিনি।

অংগের যত স্বর্ণ মণি মাণিক্য সব তিনি খুলে ফেললেন। ছেড়ে ফেললেন স্বর্ণজরী দেওয়া রাজবেশ।

সারা অংগে লেপন কোরলেন তিনি কৃষ্ণপ্রেম চন্দন।

রাজকুলবধূ মীরা কপালে তিলক কাটলেন, গলায় দিলেন তুলসীর মালা, কাপড় রাঙালেন গেরুয়া রঙে।

রাজার মেয়ে হোলেন বৈরাগী।

বৈরাগী মন ঘিরে ফেললেন বৈরাগ্যের পাঁচিল দিয়ে।

তিনি দুহাত তুলে কীর্তন করেন গিরিধারীলালের মন্দিরে কখনও কখনও ভাবাবেশে নৃত্যও করেন।

যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন।

সারাজীবন ধরে এমনি ভাবে গান গেয়ে তাঁর অন্তরের দেবতাকে প্রেম নিবেদন কোরেছেন, অন্তরের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা উজাড় কোরে দেবেন গানের সুরে।

কুল দেবতা ভীমা দেবী আছেন মন্দিরে জীবন্ত বিগ্রহ রূপে।

কই মীরা তো সে মন্দিরে যান না। ভীমা দেবীর আরাধনায় তো তাঁর দিন কাটে না।

এই ধরণের উগ্র কৃষ্ণভক্তি দেখে অনেকেই অসন্তুষ্ট হোলেন।

কুল গুরু, কুল পুরোহিত আর কুল দেবতা ত্যাগ করা উচিত নয়। শাস্ত্রের বচন। অথচ মীরা সেই কুলের বধূ হোয়ে কি কোরে কুলবিরুদ্ধ কাজে রতা আছেন।

মীরার ওপর সবাই অসন্তুষ্ট হোলেন।

শাশুড়ীও ক্রোধভরে মীরাকে অনেক কিছু বোললেন।

কুমার ভোজরাজও জীবিতকালে এই অপরাধে মীরাকে নিজের প্রাসাদ থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন।

মীরার এক কথা।

গিরিধারীলাল ছাড়া তিনি আর কাউকে জানেন না। চেনেন না।

তাঁর এই অনঢ় স্বভাবে রাজবংশের মান সম্মান ধূলায় লুন্ঠিত।

ননদ উদাবাঈ মীরাকে বলেন: তুমি নিজের সর্বনাশ তো নিজেই কোরছ এমন কি রাজবংশেরও সর্বনাশ কোরছ। তুমি কুলদেবতাকে ছেড়ে গিরিধারীর পূজো করো কেন? তুমি সাধু বৈষ্ণবদের সংগে সবার সামনে নাচগান করো এতে তোমার লজ্জা করে না!

মীরা জবাব দেন গিরিধারীলালের নাম কোরব তাতে আবার লজ্জা কিসের।

সাধু আর বৈষ্ণব ওরা তো কৃষ্ণদাস, ওদের চরণই তো আমি সিঁড়ি কোরেছি। ঐ সিঁড়ি বেয়েই তো আমি জ্ঞান ভক্তির ঘরে পেঁাছাবো। উদা, তুমি ওদের বলো আমার দ্বারা তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। গিরিধারীপ্রিয়া আমি—তাঁরই হাতে আমার জীবন মরণের ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে বসে আছি।

—বৌদি এসব তিলক মালা ছাড়ো। তুমি না রাজকুলবধূ, তোমার অভাব কিসের, সোনার আভরণে তুমি স্বর্ণময়ী প্রতিমা সাজো।

উদা, বোন আমার! মীরার দুচোখ জলে ভরে আসে।

বলেন—উদা ভাব আর ভক্তিই আমার স্বর্ণ আভরণ। কৃষ্ণনাম আর কৃষ্ণপ্রেম আমার কণ্ঠহার।

মীরা উদাবাঈকে জড়িয়ে ধরে বলেন—উদা বোন আমার! আমার একটা জিনিষের বড় অভাব আছে তুমি আমাকে দিতে পারো।

—বলো না বৌদি তোমার কি চাই আমি তোমার সব অভাব দাদাকে বোলে পূর্ণ কোরব।

—ঠিক্ বোলছ পূর্ণ কোরবে। উদা আমি জনম জনম তোমাদের দাসী হোয়ে সেবা কোরব যদি আমার সেই অভাব পূরণ কোরতে পারো।

—বলো বৌদি রাজকোষের অর্থ যদি সব শেষ হোয়ে যায় তবুও তাতে এতটুকু দুঃখীত হবেন না রানা.

মীরা একটু থেমে বলেন—আমার বড় অভাব কৃষ্ণভাবের, বড় অভাব কৃষ্ণপ্রেমের, তোমরা আমাকে তাই দিতে পারো।

উদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোললে—বৌদি এ পথ তুমি ত্যাগ করো, তুমি বৈষ্ণবদের সংগ ত্যাগ করো, জাগ্রত দেবী ভীমার চরণে আশ্রয় নাও।

—উদা তা হয় না বোন, বৈষ্ণবরা আমার প্রাণ!

> সংসার নিস্তার হেতু বৈষ্ণব ঠাকুর।
> প্রেমভক্তি দিয়া কৈলা পাপ তাপ দূর॥
> বৈষ্ণব শরীরে কৃষ্ণ করেন বিহার।
> যে বৈষ্ণব সেই কৃষ্ণ যেন অনিবার॥

এই যে বৈষ্ণব সে সংগ আমি কি কোরে ত্যাগ করি।

মীরা যেন একটু অন্যমনা হোয়ে গেলেন।

তাঁর দুচোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়ায়।

উদা বোলে ওঠে, বৌদি তুমি কি পাগল হোলে।

—নারে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল আর হোতে পারলাম কই। সেই কপাল কি আমি কোরেছি। শোন উদা একটা কথা বলি।

—বলো বৌদি।

দেবী ভীমাই বা কে আর গিরিধারীলালই বা কে? এ দুইই কি এক নন? অন্ধকারে জলের রঙ একরকম আর জোৎস্নার আলোয় আর এক রঙ। জল তো জলই শুধু চোখের দেখার জন্যই তো দুই রকম। পরমাত্মা পুরুষরূপেই তো প্রকাশ হোলেন আমার গিরিধারীর ভিতরে আবার প্রকৃতিতে তিনিই তো ভয়ঙ্করী ভীমা। এ সন্দেহ তোমাদের কবে যাবে। বহুর মধ্যেই তো এক পরমধন

বিরাজ কোরছে। পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন। যে শ্যাম সেই শ্যামা। রাধার মান রক্ষা কোরতে কৃষ্ণ কালী সেজেছিল। আমার গিরিধারী-লাল তিনি সারা দুনিয়ার। তাঁর কোন আদি নেই অন্ত নেই।

উদাবাঈ আর কোন কথা না বোলে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেলেন।

মীরা গান ধরলেন :

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নতুবা আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

মীরার মন ভয়ানক চঞ্চল হোয়ে উঠলো। এ রাজ্যের কেউ তাঁকে চায় না। সবাই তাঁর প্রতি বিরাগভাজন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর প্রাণের ঠাকুর গিরিধারীলাল যদি তাঁর কাছে থাকেন তাহালে তিনি কোন কিছুতেই শংকা করেন না।

গিরিধারীলালের চরণে যাঁর আশ্রয় তাঁর তো কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। তাঁর মূর্তি হাতে কোরে তিনি একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

ভক্তের ওপর তিনি কি অন্যমনা হোলেন ?

তবে কেন তাঁর মুখে আজ সে মধুর হাসি নেই।

তিনি বুকে চেপে বোলতে লাগলেন : হে প্রভু! ক্ষমাসুন্দর তুমি আমাকে কৃপা করো, তোমার কৃপা না হোলে আমার জীবন বৃথা। আমার শত অপরাধ তুমি ক্ষমা কোরে এ প্রেম কাঙালিনীকে তোমার চরণে স্থান দাও।

মীরা কাঁদছেন। জগত স্বামী গিরিধারীলালের জন্য তাঁর চোখ জলে ভরা। প্রভু ওরা বলে তুমি নাকি নিষ্প্রাণ, তুমি যদি নিষ্প্রাণ হবে তবে এ জগতে প্রাণ আছে কার? একমাত্র প্রাণবন্ত তো তুমিই—আমি যে তোমার বাঁশীর সুর শুনেছি। আমি তো শুনেছি তোমার

নূপুরের নিক্কন। পৃথিবীর যত জীব বাসনার মোহান্ধভারে আচ্ছন্ন, তাদের চোখে লোভের কাজল। পুত্রকন্যা জায়াজননী নিয়ে তারা জন্মমৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম কোরছে। একবারও কি ভেবে দেখেছে তারা যে তিনিই একমাত্র জীবের সার বস্তু। প্রভু! করুণাসিন্ধু আমাকে নিয়ে চলো হাত ধরে যেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। যেখানে চারিদিকে শুধু তোমারই অনুভব, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে শুধু তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাময় জগত ছাড়া আর তো আমার কিছু কাম্য নয়।

মীরা আপনমনে ধ্যান কোরতে কোরতে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়ে পড়েছেন তিনি জানেন না।

এক ধ্যান, এক মন, এক নিষ্ঠা, এক চিন্তা। জীবের পারাপারের এই তো কড়ি। হোকনা এ ভবসিন্ধু যতই উত্তাল, উঠুক না ঝড়।

একমনে ডাকো, জানতেও পারবে না কখন তুমি পার হোয়ে গিয়েছো। মীরা বসেছেন সেই একাগ্রতার সাধনাতে, সেই মহাতিতিক্ষার সাধনাতে, সেই একনিষ্ঠতার সাধনাতে। ডুবতে হবে মনের গভীরে, আত্মার কিনারে কিনারে ছড়িয়ে দিতে হবে সমস্ত চেতনাকে তবেই মিলবে পরমধন। এই দেহের প্রতি কুঠরীতে তিনি আছেন। কখনও দোর খোলা, কখনও বন্ধ। এই আছেন এই নেই। জীবের সংগে জনমে জনমে তাঁর এই লুকোচুরি খেলা চলছে। ধরতে যে জানে সে ধরছে।

—মা!

চমকে উঠলেন মীরা!

—কে!

আমি মা—আপনি ক্ষুধার্ত তাই দুধ এনেছি।

মীরা উঠে পড়লেন—এসো এসো আমি আমার গিরিধারীলালকে নিবেদন কোরে খাচ্ছি।

পরিচারিকা বিজাবর্গী দাঁড়িয়ে আছে দুধের বাটি হাতে কোরে।

—কই দাও। মীরা তার হাত থেকে দুধের বাটিটা নিয়ে নিবেদন কোরলেন তাঁর গিরিধারীলালকে পরে তিনি চরণামৃত জ্ঞানে সবটুকু খেয়ে নিলেন।

বিজাবর্গী দাঁড়িয়ে আছে, তার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঘামের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটি কি এক মহাঅমংগলের আশংকায় যেন ঠিকরে বের হোচ্ছে। কাঁপছে বিজাবর্গী। সে জানে রানা ঐ দুধের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন। উগ্র বিষ! যে বিষের একটু স্পর্শেই জীবন হোয়ে যাবে নিস্তেজ প্রাণহীন।

কৃষ্ণভক্তি এমনই জিনিষ যাতে বিষও অমৃত হোয়ে যায়। ঐ চরণে নিবেদন কোরে যা মুখে দেওয়া যাবে তা তো অমৃত হবেই।

বিষ আদি খাওয়াইল।
কিছুই না হয়
হরির ভকত জনে
কিছুই না হয়।

রাজকুলের কারও মনে সুখ নেই। কুলদেবতা দেবী ভীমাকে যে আরাধনা করে না তার জীবনেরও কোন প্রয়োজন নেই। যে ভাবেই হোক তাকে শেষ কোরে ফেলতেই হবে।

রানা এক পরিচারিকার হাতে একটা সুদৃশ্য কৌটার ভিতর বিষধর সাপ পাঠালেন।

রানা ভাবছেন—এবার আর নিস্তার নেই। ঐ বিষধর সাপের বিষেই মীরার দেহ নীল হোয়ে যাবে। ঠেকাক তার গিরিধারীলাল।

অন্ধ রানা কি বুঝবে ঈশ্বরের মহিমা। আপন ঐশ্বর্যে ভুলে আছে সে, ভাবছে ঐশ্বর্যের জোরেই সারা জগত বুঝি তার কাছে বাঁধা।

মূঢ় আর কাকে বলে? মীরা যে অগ্নিশিখা তার গায় হাত দেয় এমন লোক পৃথিবীতে কি আছে। কৃষ্ণের যিনি প্রিয়া তাঁর ক্ষতি কোরবে কে? কৃষ্ণাশ্রয় যাঁর পরম আশ্রয় কি করবে তাঁকে ঐ বিষধর সর্প। যিনি বিষহরি তিনিই গিরিধারী। তাঁর অংগ স্পর্শ করে কে?

পরিচারিকা চুপি চুপি কৌটাটা মীরার ঘরে রেখে এলো।

মীরা কৌটা খুলে সাপটাকে মালা ভ্রমে গলায় ধারণ কোরলেন

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতি।

মীরা গিরিধারীলালকে বুকে কোরে সুর ধরলেন—

ভজ মন চরণ কঁবল অবিনাশী।

জেতাই দীসে ধরণী গগন বীচ, তেতাই সব উঠি জাসী।

কহা ভয়ো তীরথ ব্রত কীন্হে, কহা লিয়ে করবত কাশী॥

ইস দেহী কা গরব ন করনা, মাটি মেঁ মিল জাসী।

য়ো সংসার চহর কী বাজী, সাঁঝ পড়্যো উঠি জাসী॥

কহা ভয়ো হৈ ভগবা পহর্যা, ঘর তজ ভয়ে সন্ন্যাসী।

যোগী হোয় জুগতি নহিঁ জানি, উলটি জনম ফির আসী॥

অরজ করো অবলা কর জোরে, শ্যাম তুমারী দাসী।

মীরা কে প্রভু গিরিধারী নাগর, কাটো জম কী ফাঁসী॥

রে মন! যে জিনিষের বিনাশ নেই তার ভজনা করো। এ দুনিয়ায় যা কিছুই আছে সবই নষ্ট হোয়ে যাবে। তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত উদযাপন সবই নিস্ফল! এ দেহের গর্ব কিসের? এ তো যে কোন সময় মাটিতে মিশে যাবে।

এ সংসার তো ভোজবাজী। সন্ধ্যা হোলেই সব শেষ। আর কিছুই থাকবে না। তুমি যদি মোক্ষর জন্য পোষাক রাঙাও, গৃহত্যাগ কোরে সন্ন্যাসী হও তবে কোন লাভ নেই। যোগী হোলে মুক্তি যদি না আসে তাহালে আবার এ দুনিয়ায় ফিরে আসতে হবে। হে প্রভু! গিরিধারী নাগর। মীরাকে তুমি রক্ষা করো, মীরাকে তুমি কৃপা কোরে চরণে ঠাঁই দাও।

মীরার ওপর এইসব অত্যাচারের কথা তাঁর পিতৃব্য বীরমদেবের কানে গেলে তিনি বড় উতলা হোয়ে পড়লেন। তিনি তাঁকে মেড়তায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

মীরার জীবনে যেন নতুন সূর্য উঠলো। সারা মনপ্রাণ তিনি ঢেলে

দিলেন গিরিধারীলালের আরাধনায়। ১৫৩৮ সালে যোধপুরের রানা বীরমদেবের কাছ থেকে মেড়তা নিয়ে নেন।

মীরার মন এবার ছুটলো গিরিধারীলালের লীলাক্ষেত্র ব্রজভূমি বৃন্দাবনে। সুখ যদি কিছু মেলে তা মনেও নয় বনেও নয় বৃন্দাবনে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি ছড়ানো যে মাটিতে সে মাটিতে সুখ হবে না তো আর কোথায় হবে।

বৃন্দাবনে তখন চৈতন্যদেবের একানিষ্ঠ সেবক ভক্ত শ্রীজীব গোস্বামীর নাম সর্বজন বিদিত। মীরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে দর্শন কোরবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে পড়লেন। স্বয়ং ভগবানের চরণাশ্রিত যিনি তাঁর চরণ দর্শন তো মহাভাগ্যের কথা।

মীরা যেখানে গেলেন সেখানে শ্রীজীব গোস্বামী আছেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী বোললেন, তিনি বনে জংগলে থেকে সাধন ভজন করেন তিনি কোন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন না।

মীরা আশাহত হোয়ে বোললেন: সেকি আমি তো ভেবেছিলাম বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ গিরিধারী লালই আছেন আর এখানে সবাই তো আমার সখা। তবে ইনি আবার এলেন কোথা থেকে।

এতদিন শুনি নাই
শ্রীমন্ বৃন্দাবনে
আর কেহ পুরুষ আছয়ে
কৃষ্ণ বিনে।

শ্রীজীব গোস্বামী অত্যন্ত লজ্জিত হোয়ে মীরার কাছে যান। দুজন ভগবান চর্চায় সারা দিন কাটান।

দুইজনে পরস্পর কৃষ্ণ কথা রসে
মগন হইল প্রেম আনন্দ উল্লাসে।

রানা সংগ্রাম সিংহের পুত্রবধূ মীরা আজ নিশ্চিন্তে রাজবেশ পরে রাজ প্রাসাদে থাকতে পারতেন—কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম এমনই জিনিষ যে তার কাছে সবই তুচ্ছ মনে হয়। বৈষ্ণব হোচ্ছে তাঁর প্রাণ। সেই

বৈষ্ণবের নিন্দা যেখানে, সেখানে তিনি কি কোরে থাকবেন। বৈষ্ণবরা হোচ্ছেন কৃষ্ণের দাস তাঁদের বর্জন কোরতে বলাও যা মৃত্যু বরণও তাই। ননদ উদাবাঈ কি বুঝবে বৈষ্ণবকে।

ঐশ্বর্যের ভিতর থেকে বৈষ্ণব চেনা যায় না।

তাই তিনি ব্রজধামে এসে বৈষ্ণবের চরণ সেবা কোরবেন।

হে কৃষ্ণ, জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন।
দন্তে তৃণ ধরি করি এই নিবেদন
বরঞ্চ অগ্নিতে পড়ে মরি সেই সুখ
সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খায় তাহে নাহি দুঃখ।
বরঞ্চ কুম্ভীরে খাউ জলে ডুবাইয়ে
তথাবহে ভয় নাহি এ মোর হৃদয়ে।
কিন্তু যে বৈষ্ণব প্রতি বিমুখ যেই জন
যে আমি বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দন
বৈষ্ণবের অপমান ভ্রমে যেই করে
অপরাধ করি যে না করে পরিহারে
তার সংগে সংগ কভু নাহি হয়
তার অন্নজল যেন খাইতে না হয়॥

মীরা কিছুদিন বৃন্দাবনে থাকার পর আবার ফিরে এলেন রানা সংগ্রাম সিংহের প্রাসাদে। কেন এলেন তা কেউ জানে না। হয়তো বা মনের খেয়াল নয় তো গিরিধারী লালের আদেশ।

প্রাসাদে এসে আবার সেই জ্বালার ভিতর ডুবলেন।

ননদ উদাবাঈ পরম সমাদর কোরে ঘরে এনে বোললেন: বৌদি তুমি সূর্যকুল বধূ মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরাভয় দায়িনী ভীমাকে কি কোরে এতদিন ভুলে ছিলে। তাঁরই আরাধনা করো, ভুলে যাও তোমার কপটের শিরোমনি গিরিধারীলালকে।

মীরা তার দিকে চেয়ে বোললেন: বোন তোমরা সব তমঃ গুণে রঞ্জিত মায়াপাশে আবদ্ধ। আমার গিরিধারী লাল নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম

আত্ম ভোলা তটিনীর মত সর্বজীবে প্রেম বিলিয়ে চলেছেন—হরিভক্তির অগ্নি শিখায় তোমাদের যত তমরূপী হৃদয়ের জঞ্জাল সব পুড়িয়ে ফেলো। জীবের এ ছাড়া গতি নেই। জীবের এ ছাড়া ধর্ম নেই। কর্ম নেই।

—না, না, বৌদি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা,—ননীচোর' ঐ লম্পট গোপালকে তোমায় দূর কোরে দিতেই হবে।

উদাবাঈ ক্রোধে প্রজ্বলিতা হোয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এত দর্প। এত অহংকার। ঘৃণ্য জীবের।

ভগবানকে যে করে তুচ্ছ জ্ঞান তার মত মহাপাতক আর কে আছে।

মীরার বুকে গিরিধারী লাল রয়েছেন।

মীরা আপনমনে তাকে বুকে চেপে বোলছেন: প্রভু! শিশুকাল থেকে তোমাকে ভালবেসেছি। তোমার পূজায় দেহমন সব সমর্পণ কোরেছি আর আজ তোমাকে ওরা ভুলতে বলে। ঐ কালোরূপে যাব মন মজেছে তার আর কি ভালো লাগে। এমন ভুবন ভুলানো রূপের কাঙালিনী আমি। প্রভু! আমাকে বোলে দাও আমি কি কোরব। আকাশ কালো হোয়ে মেঘ জমলে ভাবি তুমি বুঝি এলে। কালো অন্ধকারে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াই। যমুনার কালো জলে কত খুঁজেছি, কই তুমি তো দেখা দিচ্ছ না। জনমে জনমে ঐ কালো রূপেই তো আমি মন রাঙিয়েছি। আর যে আমি তোমার অদর্শন সহ্য কোরতে পারছি না।

ভক্তের আকুল আহ্বানে দেবতা কি চুপ কোরে থাকতে পারেন।

মীরা দেখছেন তার গিরিধারী লাল যেন হেসে হেসে অভয় দিচ্ছেন তাঁর মন প্রাণ যেন কি এক অজানা আনন্দে ভরে ওঠে।

মীরা গেয়ে ওঠেন—

মাধব বহুত মিনতি করি তোমায়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিণু
দয়া জনু ন ছোড়াবি মোর।

গনইতি দোষ   গুণমেনা না পাওবি

যব তুঁহু করবি বিচার।

তুঁহু জগন্নাথ   জগতে কহায়সি

জগবাহির নহি মুঞি ছাব॥

—ওগো গিরিধারী! তুমি এসো আমার হৃদয় মাঝে। ওগো প্রিয়তম মন তমালের শাখায় বেঁধেছি, প্রেমের দোলনা, তুমি এসো। আমার জনম জনম চাওয়া পাওয়ার হিসেব মিটিয়ে তোমার মাঝে আমাকে বিলীন কোরে দাও।

যা ছিল সবই তো তোমাকে দিয়েছি আর তো তোমাকে দেবার আমার কিছুই নেই। ঐ রাঙাচরণে আমাকে আশ্রয় দাও।

গিরিধারী লালকে সিংহাসনে বসিয়ে মীরা চেয়ে আছে সতৃষ্ণ নয়নে।

—সাড়া দাও, সাড়া দাও প্রভু! কত জনম কেটে গেলো। কৃষ্ণ-ভক্তির ঢেউয়ে মেবারবাসী তো ভেসে গেলো না। মায়ার বন্ধন ছিন্ন কোরে সবাইকে তুমি স্নেহছায়ায় আশ্রয় দেবে তবেই না তুমি পতিত পাবন। কত পাপীতাপী তুমি উদ্ধার কোরছো। এদের তুমি মুক্তির পথ দেখাও শুধু একা আমি কাঁদবো জনম ভোর। তোমার নামে এদের চোখে কি এক ফোঁটা জলও নেই। এদের গর্ব তুমি মাটিতে মিশিয়ে দাও। তোমাকে যে পায় তার আর কি চাই। ধন জন যৌবন—কিসের প্রয়োজন। তোমাকে যে জেনেছে সেই তো সুখী। সেই তো ভাবের বাজারে লাভবান। মীরাও তোমাকে পেয়ে সেই সুখে সুখী হোতে চায়। কৃষ্ণদাসী হোয়ে তোমার মীরা কোটি জনম নরকে ঘুরে বেড়াতে পারে।

সিংহাসনের সামনে মাথা রেখে মীরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিন কি রাত্রি তাও বুঝি তাঁর বিস্মরণ হোয়েছে।

মেবারের রাজপ্রাসাদ আর মীরার ভালো লাগেনা। এর চেয়ে শ্বাপদসংকুল অরণ্যও বোধ হয় শ্রেয় আশ্রয়। এখানে মানুষ কোথায়? কতকগুলি ক্রিমি কীটের আস্তানা। মানুষের এ কি বিকার!

দুর্লভ জনম মনুষ্যজনম—সেই জনম লাভ কোরে ভুলে রইল তার,

সৃষ্টি কর্তাকে। কীট পতংগেরও বুঝি গতি আছে কিন্তু মানুষের কোন গতি নেই। এরা শুধু আমার আমার কোরেই জীবন কাটালো।

ধ্যানমগ্না মীরা অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে গিরিধারী লালের সামনে বসে আছেন। হয়তো সমাধিবস্থা, হয়তো নয়—মাঝে মাঝে হাসছেন, মাঝে মাঝে চোখের জলে গণ্ড ভেসে যাচ্ছে। কখনও বুঝি কার সাথে কথা বোলছেন। হৃদিপদ্মে বুঝি প্রেমের ঠাকুর এলেন। তাঁর পাদস্পর্শে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝি চোখের সামনে একাকার হোয়ে গেলো। একি ভাবাবেশ মীরার। এ যে কৃষ্ণভাব। এ যে কৃষ্ণপ্রেম অভিসার। কোন কথা নেই, নেই কোন সাড়া—

দুজনে শুধু মন দেওয়া নেওয়া। ভক্ত আর ভগবানে। ভগবান আর ভক্তে।

কে একজন পরিচারিকা এসে ডাক দেয় এমন সময়: মহারাণী!

মীরা চোখবোজা অবস্থায় বোলে ওঠেন: মহারাণী, কে মহারাণী—কে আমি কিবা আমি। কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম, এ দেহ কারাগার থেকে যেদিন আমি মুক্ত হবো সেদিন আমি কোথায় যাবো! এ দেহে আত্মা থাকতে থাকতে তুমি দেখা দাও হে পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন পুরুষরতন গিরিধারী, এ অনিত্য বন্ধনে আর কতদিন আবদ্ধ রাখবে। মহাকাল সর্প যে ছুটে আসছে গ্রাস কোরতে। লগ্ন যে বয়ে যায়। এ লগ্ন চলে গেলে আর তো হরিনাম করার অবসর মিলবে না। অবিরাম হরিনাম করো—কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসো!

মীরা হাততালি দিয়ে সুর ধরলেন:

নিতি নাহনেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাহুড় বাঁদরাই॥
তিরণ্ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হায় খোজা।
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎসওয়ালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা॥

—প্রভু আমার 'আমি' কে তুমি বিনাশ করো। কর্মই তো জীবাত্মার এক মাত্র ধর্ম। সেই কৃষ্ণধর্মেই তো আমার দিন কাটছে তবে তুমি আমাকে দেখা দিচ্ছনা কেন। আর কতকাল তোমায় আসার আশায় পথ চেয়ে থাকবো।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ কৃপাময়ে
সর্বতরে সং ভক্তৌ সর্ব ভক্তজনাশ্রয়ৌ॥
গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈস্তআলয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তয়ে নমোনমঃ॥

অন্ধকার রাত। বহুদূরে কোথায় যেন কি একটা পাখী ডাকছে। সেও কি কৃষ্ণপ্রেমের কাঙাল।

আকাশে নক্ষত্ররাজি কচিছেলের মত চোখ টিপ্‌টিপ্ কোরছে। সমস্ত জগত যেন সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

মীরা এই গভীর রাতে কার ডাকে যেন উঠে পড়লেন।

সিংহাসনে গিরিধারী লাল শুয়ে আছেন। মীরা এদিক ওদিক তাকালেন না কেউ তো কোথায় নেই। তবে কে তাঁকে অমন কোরে ডাকছে।

কৃষ্ণপ্রেম যার একবার হয় তার ঘুম জাগরণ সব সমান হয়। ঘুমে জাগরণে স্বপনে একই চিন্তা যার কৃষ্ণ তো তাঁরই।

কবে কৃষ্ণধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব এ পাপ পরণে।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাব প্রাণপ্রিয়া
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান।
কৃষ্ণ ভক্ত অঙ্গ হেরি কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করি
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন,
অর্চণ স্মরণ ধ্যান নবভক্তি মহাজ্ঞান
এই ভক্তি পরম কারণ।
রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান স্বপ্নেও না বল আন
প্রেম বিনা আর নাহি চাও।

যুগল কিশোর প্রেম যেন লক্ষবান হেম
আরতি পিরীতি রসে ধাও।
জল বিনু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ুহীন
প্রেম বিনু এই মত ভক্ত।
চাতক জলদ গতি এমতি একস্তে বর্ণিত
জানে যেই সেই অনুরক্ত।

মীরা আবার ধীরে ধীরে এসে শয্যায় আশ্রয় নিল। রাত এগিয়ে চলে। কৃষ্ণকালো রাত। তন্দ্রা এলো মীরার—আবার যেন কানে আসছে কার বাঁশীর সুর। এতরাতে বাঁশী বাজায় কে। আর কি কেউ শুনতে পাচ্ছে না শুধু তারই কানে আসছে। তাঁর গিরিধারী লাল যেখানে আছেন সেই ঘরের দোরে বসে মীরা আকুল হোয়ে সুর ধরলেন:

মহাঁরো জনম মরণ কো সাথী
থাঁনে নহিঁ বিসঁরু দিনরাতি
তুম দেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ, জানত মেরী হাতী।
ঊঁচী চড় চড় পন্থ নিহাঁরু রোয় রোয় আঁখিয়া রাতী।
য়ো সংসার সকল জগ রুঠো রুঠো কুলরা নাতী।

মারার বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। হঠাৎ তিনি কান পেতে শুনলেন ভিতরে কে যেন নাচছে। তাঁর নূপুরের ধ্বনি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। মীরার মন উল্লসিত হোয়ে ওঠে। তাঁর গিরিধারীলাল নৃত্য কোরছেন।

এতদিনে বুঝি সাড়া দিলেন। প্রভু তোমার সময় হোল!

মীরা আনন্দে উল্লসিতা হোয়ে হাততালি দেন আর গুনগুন কোরে গান ধরেন—

"মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর হরি চরণাঁ। চিত্ত রাতী।
পল পল তেরা রূপ নিহারুঁ নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥"

ভিতরে তেমনি নূপুরের ধ্বনি বাহিরে মীরার সুর। অন্তরের সমস্ত সুর আছড়ে পড়েছে নৃত্যের তালে তালে।

অন্তরের সমস্ত সুর আছড়ে পড়ছে নৃত্যের তালে তালে সুরের খেয়া বেয়ে বুঝি ভক্ত চলেছেন মহাচেতনার বৈতরণী পারে। সেই কৃষ্ণকালো অন্ধকার রাত। কালোর প্রেমে পাগল মীরা গিরিধারী-লালকে বুকে কোরে কাকপক্ষীর অজান্তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন দ্বারকার পথে। পথ দেখিয়ে যিনি নিতে এসেছেন সেই দ্বারকানাথই তো তাঁর বুকে রয়েছেন। অন্ধকারে যিনি আলো। বিপদে যিনি এলেন তিনি চলেছেন মীরাকে নিয়ে।

ভক্তিতে তো ভগবান বাঁধা। ভক্তিতেই তো মুক্তির সন্ধান। ভক্তিতেই পরম ঐশ্বর্য লাভ। ভক্তি ছাড়া কিছু হয়না। হবেনা। ভক্তির বীজ বুনতে বুনতে জ্ঞান বৃক্ষ—জ্ঞান থেকেই তো পূর্ণ চৈতন্য।

মীরার সারা দেহনদীতে কৃষ্ণভক্তির স্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোতেই তো আজ ভেসে চলেছে কৃষ্ণসরোবরের কিনারে। এ ভাগ্য কার হয়। কজনের হয়।

চাই কৃষ্ণকৃপা। চাই কৃষ্ণস্মরণ। চাই কৃষ্ণমনন।

এই তিন মিলেই তো মানবদেহের জমির সার।

এই সারের পরেই কৃষ্ণকর্ষণ।

তবেই তো দরশন পরশন।

হৃদয় গোলা পূর্ণ হোলে কৃষ্ণপ্রেম ফসলে আর তো চাইবার কিছু থাকবে না।

মীরা পূর্ণ। মীরা সিদ্ধা। সাধিকা মীরা আজ রাধাশক্তির পূর্ণ প্রকাশ। তার জন্ম সার্থক, কর্ম সার্থক। হৃদয় সরোবর আলো হোয়েছে তার কৃষ্ণপথে। মীরার জীবন সাধনাময়। শ্রদ্ধা ভক্তিময়। মীরা আজ কৃষ্ণপ্রেমিকা।

মীরা মেবার ত্যাগ করার পর সারা মেবারে যেন অশান্তির ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো। সারা রাজ্যে চরম হাহাকার দেখা দিল। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, প্লাবন চারিদিক থেকে যেন মেবারকে আক্রমণ কোরল।

প্রজারাও বিদ্রোহী হোল। মেবারে এক চরম দুর্দিন।

রাজবংশের সবাই গিয়ে কুলদেবতা দেবী ভীমার মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিল। ধুমধাম কোরে পূজা অর্চনা কোরল। কিন্তু দেবী ভীমা সাড়া দিলেন না। মীরা শুধু গিরিধারী লালের নয় দেবী ভীমারও ভক্ত ছিলেন। মীরার প্রতি যে অত্যাচার অবিচার হোয়েছে দিনের পর দিন সবই তো দেবী ভীমা প্রত্যক্ষ কোরেছেন। ভক্তের কথায় তাঁরও প্রাণ ব্যাকুল হোয়েছে। তাই তিনি সাড়া দিচ্ছেন না। মেবারের কুলদেবতা দেবীভীমাও বুঝি অন্তর্ধ্যান হোলেন। রানা মেবার থেকে দুজন ব্রাহ্মণ পাঠালেন মীরাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কিন্তু দ্বারকা থেকে,মীরা আর ফিরলেন না। তিনি তখন দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে আপন ভাবে ভাবাবিষ্টা। ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই শুধু একমনে গিরিধারীর ধ্যানে মগ্না। কারও সংগে বেশী কথা বলেন না—শুধু মাঝে মাঝে গানের সুরে মেতে ওঠেন। কৃষ্ণ দাসা মীরা আজ নিঃস্ব। সংসার নেই। আত্মীয় পরিজন নেই। মায়ার পুতুলি বোলতে কিছুই তাঁর নেই। তিনি সর্বত্যাগী সাধিকা।

এক গিরিধারী লালকেই তিনি সার কোরেছেন।

এমন জিনিষকে যে সার কোরতে পারে তাঁর কাছে আর সবই তো অপার।

ধ্যানরতা, কৃষ্ণপ্রেমমনা মহান সাধিকা মীরা এপারের দেনা পাওনা সব বুঝি মিটিয়ে এসে নিত্যের ঘাটে এসে বসেছেন—পারের কাণ্ডারী গিরিধারীলাল শুধু কৃপা কোরলেই হয়। মীরা কেঁদে কেঁদে ডাকছেন গিরিধারীলালকে—আর কতদিন বসে থাকবো। দেখা দেওয়ার সময় কি, তোমার এখনও হোল না। বড় শ্রান্ত ক্লান্ত আমি।

আমার যত কলংক সব তুমি নিজের কোরে নাও—প্রভু তোমার জন্যই তো আজ আমি কলংকিনী। আমার সকল কলংকের ভার তুমি নিয়ে আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও।

এমন সময় কয়েকজন রাজকর্মচারীর সাথে ননদ উদাবাঈ এসে

মীরার সামনে ব্যাকুল ভাবে বোললে : বৌদি আজ আমাদের বড় দুর্দিন। জাগ্রত লক্ষ্মী মেবার ছেড়ে দ্বারকায় বসে আছো। তুমি চল বৌদি, আজ আমাদের বড় কষ্ট। তুমি শুধু বৌদি নয় তুমি আমাদের মায়ের মত। শিশোদীয় কুলকে তুমি লক্ষ্মীছাড়া কোর না মা। সমস্ত প্রজা তারাও তো তোমার পুত্রের মত। তারা আজ বড় বিপন্ন। তাদের চোখের জল তুমি মোছাও। দেবী ভীমা তিনিও বুঝি মেবার ছাড়ছেন তোমার সাথে। কথা শোন। তোমার সন্তানদের বাঁচাও।

মেবারের সবাই আজ তোমার জন্য কাঁদছে। তুমি তাদের চোখের জল মুছিয়ে দাও।

মীরাবাঈ উদাবাঈয়ের দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে বোললেন : কেবা পুত্র, কেবা কন্যা, কেবা মাতা, কেবা পিতা, কেবা আত্মীয় পরিজন। বোন সংসারে খেলাঘরে তো সবাই এক-একটা রঙের পুতুল। সবদেহে অভিনয় কোরছে। ওরা তো অনিত্য বস্তু। একটু আঘাতেই তো ভেঙে যায়। একমাত্র জীবের জীবন কৃষ্ণচন্দ্র. জীব-রাধা—সবাই আজ কৃষ্ণচন্দ্রে আত্মসমর্পণ করো।

মীরার যেন সমাধি ভাব হোল। সমস্ত চেতনা বুঝি লুপ্ত প্রায়।

—এসো! আরও কাছে এসো, এতদিনে দাসীকে তোমার মনে পড়ল। আহা কালো রূপের এত আলো। জনম জনম এই কালোকে ভালবেসেই কালোতেই দেহমন আলো কোরতে পারি। এসো প্রভু!

মীরা দুই বাহু উপরে তুলে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন গিরিধারী লালের দিকে। কণ্ঠে তার আকুল সুরের গান, সমস্ত মন্দির যেন কাঁপছে সেই গানের সুরে---

> সাজন সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লাজে হো
> তুম বিন মোরে ঔর ন কোই। কৃপা রাবরী কীজে হো।
> দিবস ন ভুখ রৈণ নাহীঁ নিদ্রা। য়হতন পল পল ছীজে হো।
> মীরা কহে প্রভু গিরিধর নগর। মিল বিছুরণ নহি কীজে হো॥

হে প্রিয়তম! যেমন কোরে পারো আমার সংবাদ নিও। আমাকে

তো দেখছো তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই। তোমার কৃপা লাভ যেন আমার ভাগ্যে হয়। তোমার চিন্তায় আমার দিনে রাত্রে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নেই। এই দেহ মন সবই তোমার জন্য পলে পলে ক্ষয় হোচ্ছে। প্রভু মীরা এই মিনতি কোরছে এবার তোমার মাঝে আমাকে মিলিয়ে দাও আর বিচ্ছেদ রেখ না।

মীরা গিরিধারী লালের মাঝে বিলীন হোয়ে গেলেন।

তুমি সুনো দয়াল মহাঁরী অরজী
ভৌসাগর মেঁ বহী জাত হুঁ কাঢ়ো তো থাঁরী মরজী।
য়ো সংসার সগো নহিঁ কোঈ সাচা সগা রঘুবরজী।
মাতপিতা ঔর কুঁটর কবীলো সব মতলব কে গরজী।
মীরা কো প্রভু অরজী সুনলো চরণ লগাও তো থাঁরী মরজী।

হে প্রাণবল্লভ! আমার কাতর নিবেদন শোন। এই সংসার-সমুদ্রে আমি অবিরাম ভেসে চলেছি। তুমি ছাড়া আর আমাকে উদ্ধার কোরবার কেউ নেই। এমন কোন ভাল কাজ আমি এ জীবনে তো করিনি যাতে তুমি আমায় এ ভবসমুদ্র পার কোরে দেবে। এত বড় পৃথিবীতে তো আমার আপনজন বোলতে আর কেউ নেই। তুমি আমার অন্তরের নিজস্ব জিনিষ—আমার সবই তো তুমি। পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই তো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। মীরা তোমার চরণে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে তুমি তাকে চরণে আশ্রয় দাও।

রাম নাম রস পীজে মনুআঁ, রাম নাম রস পীজে।
তজ কুসঙ্গ সৎসঙ্গে বৈঠ নিত, হরি চরণা সুণ লীজে॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ কূঁ, চিত সে বহায় দীজে
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, তাহি কে রঁগ মেঁ ভীজে॥

—ওরে মন! রাম নামের অমৃতরস পান কর। সাধুসঙ্গ করো, সৎচিন্তা করো, সৎকথা বলো, হরিনামে মন মাতাও। ষড়রিপুর দাস না হোয়ে তাদের দাস করো তোমার। মনকে সুন্দর করো পবিত্র করো। মীরার প্রভু গিরিধারী লাল—তাঁরই নামের রসে ডুবে যাও।

জগ মেঁ জীবনা থোড়া, রাম কুন কহ রে জঞ্জার
মাতপিতা তো জন্ম দিয়ো হৈ, করম দিয়ো করতার,
কই রে খাইয়ো কই রে খরচিয়ো, কই রে কিয়ো উপকার
দিয়ালিয়া তেরে সঙ্গ চলেগা ঔর নহী তেরী লার।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, ভজ উতরো ভবপার॥

এ দুনিয়ায় কে কদিনের জন্য থাকবে। কার যে কখন বেলা ফুরিয়ে যাবে, তাও কেউ বোলতে পারে না। ওরে মন! রাম নাম কর, ও কাজে ভুল হয় কেন। পিতা মাতা আমাদের দুনিয়ায় এনেছে কিন্তু ভাগ্য আমাদের বিধাতার হাতে। সারা জনম কি খেলে, কি খরচ কোরলে, কি শান্তি ভোগইবা কোরলে, পরের উপকার তাই বা কি কোরলে যা এখানে কোরলে তারই পাপপুণ্য তোমার সংগে যাবে, আর তো কিছু যাবে না। মীরার প্রভু গিরিধারী, তাঁকে ভজনা কোরেই এ কঠিন দুস্তর সংসার সাগর পার হও।

ডারি গয়ো মনমোহন পাঁসী
আবা কি ডালি কোইল ইক কেলৈ, মোর মরণ অরু জগ কেরী হাঁসী।
বিরহ কী মারী মৈঁ বন ভোঁলু, প্রাণ তজু করযত খুঁ কাশী।
মীরা কে প্রভু হরি অবিনাসী, তুম মেরে ঠাকুর, মৈঁ তেরী দাসী।

প্রভু তুমি আমার গলায় একি ফাঁসী পরালে। আম্রবৃক্ষে কোকিল তান ধরেছে। তার ঐ আকুল করা সুরেই আমার মরণ হবে, সবাই আমার নিন্দে কোরবে যে মীরা কৃষ্ণকে পেলো না। আমি যে তোমার বিরহ আর সহ্য কোরতে পারছি না। এ যন্ত্রণায় আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার তো প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। তুমিই আমার প্রভু হরি আর আমি তোমার দাসী।

কোঈ কছু কহে মন লাগা।
ঐসী প্রীত লাগী মনমোহন, মুঁ সোনে মেঁ সুহাগা।
জনম জনম কা সোয়া মনুয়াঁ। সও গুরু শব্দ শুন জাগা।
মাতাপিতা সুত কুটুম কবীলা। টুট্ গয়ো জ্যু তাগা।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, ভাগ হমারা জাগা।

যে যাই বলুক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। মনমোহনকে আমি ভালবেসেছি। এ ভালোবাসা সোনার সাথে সোহাগার মিলন। জনম জনম মন আমার ঘুমিয়ে আছে আজ সত্যগুরুর পদস্পর্শে তা জেগে উঠেছে। মাতাপিতা পুত্রকন্যা বন্ধুবান্ধব সকলের সংগেই সম্বন্ধ আমার সূতো ছেঁড়ার মত ছিন্ন হোয়ে গেলো। এতদিনে মীরার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল তিনি তাঁর গিরিধারী নাগরকে পেলেন।

"পগ ঘুঘঁরু বাঁধ মীরা নাচী রে।
মৈঁ তো মেরে নারায়ণ কী, আপহি হো গঈ দাসী রে।
লোগ কহৈঁ মীরা ভঈ ববরী, ন্যাত কহৈ কুল নাসী রে।
বিষ বা প্যালো রনোজী ভেজ্যা পীবত মীরা হাসী রে।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, সহজ মিলে অবিনাসী রে॥"

মীরা নাচলেন ঘুঙুর পায় দিয়ে। সবাই বলে মীরা পাগল হোয়েছে। আত্মীয়স্বজন বলে, আমি কুল নষ্ট কোরলাম। নারায়ণের দাসী হোয়ে আমি জনম জনম পাগল হোতে পারি।

রানা বিষের বাটি পাঠালেন। অমৃত মনে কোরে মীরা তাই পান কোরলেন। সারা জগতকে যিনি রক্ষা কোরছেন সেই অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তাকে যে তিনি লাভ কোরছেন। মীরার প্রভু গিরিধারীলাল। তাঁর কি ক্ষতি হোতে পারে।

"বাদল দেখ ঝরী হো শ্যাম, মৈ বাদল দেখ ঝরী।
কালী পীলী ঘটা, উমগী বরসো এক ঘরী।
জিত জাউ তিতপানি হি পাণী, হুঈ সব ভোম হরী।
জা কে। পিব পরদেশ বতে হৈ, ভীজে বার খরী।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, কীজ্যো প্রীত খরী॥

আকাশে মেঘ দেখে কেঁদে ফেললাম। ঐ মেঘের রঙও যে আমার প্রভুর মত কালো। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো। অঝোরঝারায় বর্ষণ চলেছে। যেদিকে দেখি শুধুই জল—তার সাথে আমার চোখের জলও পড়ছে। যাদের প্রাণপ্রিয় পরদেশে থাকে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে

ভিজছে। মীরা বোলছেন তাঁর প্রভু গিরিধারী বাইরে নেই। তিনি ভিতরেই রয়েছেন। খাঁটি প্রেমের নিগড়েই তিনি তাঁকে বেঁধেছেন।

মৈঁ গিরিধর রে ঘর জাউ,
গিরধর মহরা সাচো প্রীতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।
রৈণ পড়ে তবহী উঠ জাউ ভোর হোয়ে উট আঁউ
রৈণ দিনা বাকে সঁগ ভোলূঁ জ্যে রীঝে ত্যেঁ রিঝাউ।
জো বস্ত্র পহিরাবে সোই পহিরাঁ, জো দে সোই খাউ।
মেরে উনকী প্রীতি পুরাণী, উন বিণ পল ন রহাউ।
জঁই বৈঠাবে জিতহী বৈঠুঁ, বেচে তো বিক জাঁউ।
জন মীরা গিরধর কে উপর, বার বার বল জাঁউ।

আমি গিরিধারীলালের ঘরে যাবো। গিরিধারীই তো আমার প্রাণের প্রিয় তাঁর রূপেই তো আমি পাগল হোলাম। রাত হোলেই আমি তাঁর ঘরে যাই আবার ভোর হোলেই চলে আসি। দিনরাত আমার তাঁর সাথেই চলে যায়। তাঁকে খুশী করাই আমার প্রধান কাজ। তিনি যেভাবে আমাকে আচরণ কোরতে বলেন তাই করি। তিনি যা পরতে দেন তাই পরি, যা খেতে দেন তাই খাই। তাঁকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন কাজ। তাঁর ইচ্ছাতেই মনপ্রাণ আমার ডুবছে ভাসছে, ভবের হাটে তিনি যদি হাতে কোরে আমায় বিক্রী কোরে দেন আমি আনন্দে বিক্রী হোয়ে যেতে পারি। বেচাকেনার হাটে তাঁর হাতে বিক্রী হওয়া তো মহাভাগ্যের, মহাপুণ্যের।

দেখো সইয়াঁ হরি মন কাঠ কিয়ো।
আবন কহি গয়ো অজহুঁন আয়ো করি করি বচন গয়ো।
খান পান, সুধবুধ সব বিসরো কৈসে হরি মৈঁ জিয়োঁ।
বচন তুমারে তুমহিঁ বিসারে, মন মেরো হর থিয়ো।
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর তুম বিন ফটত হিয়ো।

সখি আমার প্রাণ প্রিয় হরি তাঁর মন কেমন কঠিন কোরে ফেলেছেন। আসি আসি কোরেও তিনি আসছেন না। তাঁর মনের কথা বোঝা ভার। কথা দেন অথচ আসেন কই। তাঁর অদর্শনে

আমার আহার নিদ্রা সবই ত্যাগ কোরতে হোল। হরি ছাড়া তো আমার আর কোন গতি নেই। তোমার এত ভুল, তুমি যে আমার মন চুরি কোরে নিয়েছো তা কি তুমি জানো না। মীরা বোলছেন হে গিরিধারীলাল তোমার বিরহে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।

প্রভুজী থেঁ কহাঁ গয়ো নেহড়ী লগায়।
ছোড় গয়া বিশ্বাস সঁ-গাতী প্রেম কী বাতী বরায়॥
বিরহ সমঁদ মেঁ ছোড় গয়ো ছো, নেহ কী নাব চলায়।
মীরা কহে প্রভু কব রে মিলোগে, তুম বিন রহ্যো ন জায়।

আমাকে প্রেমের ডোরে বেঁধে কোথায় তুমি গেলে। সারা বুকে প্রেম ছড়িয়ে অবিশ্বাসীর মত কোথায় চলে গেছো। প্রেম নৌকাতে আমাকে বসিয়ে তুমি নৌকা ঠেলে দিলে বিরহের মাঝ সাগরে। মীরা বোলছেন, প্রভু আমাকে তুমি কাছে টেনে নাও। আমি তো আর সহ্য কোরতে পারি না।

পপাইয়া রে গিয় কী বানি ন বোল।
সুনি পাবেলী বিরহণী, থারো রাথৈলী আঁথ মরেড়ে।
চোঁচ কটাউ পপইয়া রে উপরি কালর লূণ।
পিয় মেরা মৈঁ পিয়া কী রে, তু পিবে কাহৈ ত কুণ।
থারা শব্দ সুহাবনা রে, জো পিব মেলা আজ।
চোঁচ মঢ়াউ থারী সোবণী মে, তু মেরে ফিরেতাজ।
প্রীতম্ কুঁ পতিয়াঁ লিখুঁ কউবা তুলে জাই।
জাই প্রীতম্ জী শূঁ য়ূঁ কহৈরে। থাঁরী বিরহণী ধান ন খাই।
মীরা দাসী ব্যাকুলা রে। পিব পিব করত চিহাই।
বেলি মিলো প্রভু অন্তরযামী, তুম বিণ রহ্যো ন জাই॥

ওরে পাপিয়া আমার প্রাণবল্লভের কথা বলিস না। এ ডাক যদি কোন বিরহিণীর কানে যায় তাহলে তোর চোখ তুলে নেবে। আমিও তোকে ছাড়বো না। তোর ঠোঁঠ কেটে নুন ছিটিয়ে দেবো। প্রিয় প্রিয় বোলে ডাকিস কাকে? সে কি তোর? সে যে আমার।

ওরে কাক! তোর ডাক তো আজ আজ মংগলময় মনে হোচ্ছে। যদি তোর ঐ ডাকে আমার প্রতিম আসেন তাহলে তোর ঠোঁট আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো। নয়নের জলে আমি আমার প্রিয়তমকে পত্র লিখছি। তুই আমার পত্র তাঁর কাছে নিয়ে যা। তাঁকে বল যে তোমার প্রিয়া জলস্পর্শ কোরছে না। দাসী তোমার প্রিয় প্রিয় বোলে ব্যাকুল ভাবে ডাকছে—তাঁকে দেখা দাও।

রে পপইয়া প্যারে কব কৌ বৈর চিতারো।
মৈঁ সূঁতী হী অপনে ভবন মেঁ, পিয় পিয় করত পুকারে।
দধ্যা উগর লুন লগায়ো, হিবড়ে করকত সারো।
উঠি বৈঠো বৃচ্ছ কী ডালী, বোল বোল কণ্ঠ যারো।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, হরি চরণাঁ চিত্ত ধারো॥

ওরে পাপিয়া তুই আমার সাথে কেন শত্রুতা কোরছিস্। চোখে কেবল্ এসো, প্রিয়তমের কথা ভাবছি আর তুই পিয়া পিয়া কোরে ডাক দিলি। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কেন দিচ্ছিস্ বার বার—কেন আমার কলিজায় কর্ণাত চালিয়ে দিলি। গাছের ডালে উঠে গলা ফাটিয়ে আবার পিয়া পিয়া বোলছিস!

মীরা বোলছেন ওরে তুই কি জানিস যে আমি গিরিধারী নাগরের চরণে মন প্রাণ অর্পণ কোরেছি।

যোগিয়া তু কব রে মিলাগে আঈ।
তেরে হী করেন জোগ লিয়ো হৈ, ঘর ঘর অলখ জগাই।
দিবস ভূখ, রৈণ নহি নিদ্রা, তুম বিন কুছ ন সুহাঈ।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, মিল কর তপত বুঝাঈ॥

ওগো যোগী! কবে তোমাকে হৃদয়ে পাবো। কবে তোমার সাথে আমার মিলন হবে। তোমারই জন্য যে যোগিনী হয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই তো তুমি কেড়ে নিলে। তুমি ছাড়া আমার কোন অস্তিত্বই নেই। মীরা বোলছেন কতদিনে আমি তোমার তোমার সাথে মিশে এ হৃদয়ের তাপ জুড়াবো।

যোগী, মত জা, মত জা, পায় পরূঁ মৈঁ তেরী হো।
প্রেমভগতি কে পৈঁড়ী হী ন্যারো হৈকুঁ গৈল ঘতা জা।
অগর চন্দন কী চিতা রচাউঁ অপনে হাত জলা জা :
জলবল ভঈ ভস্ম কি ঢেরী, অপনে অঙ্গ লগা জা।
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগরে জোত মে জোত মিলা জা।

ওগো যোগী তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করি তুমি যেও না। প্রেমভক্তির পথের সন্ধান আমাকে বোলে দিয়ে যাও। কেমন কোরে তা শিখতে হয় জানিয়ে দিয়ে যাও।

অগুরুচন্দন দিয়ে আমি চিতা সাজাই তুমি নিজের হাতে তাতে আগুন জ্বেলে দিয়ে যাও। যখন আমি পুড়ে ছাই হোয়ে যাবো তখন তুমি তা তোমার গায়ে মেখো। মীরা বোলছেন সেই চিতার জ্যোতিঃ তোমার পরম জ্যোতিঃর সাথে মিশিয়ে দিয়ে আমাকে বিলীন কোরে দাও।

মাই মৈঁ তো লিয়ো গোবিন্দ মোল।
কোই কহে ছানী কোই কহে চোরী, লিয়ো হৈ বজন্তা ঢোল।
কোই কহে কারো কোই কহে গোরো, লিয়ো হৈ মৈঁ আখি লোল।
কোই কহে হালকা, কোই কহে ভারো, লিয়ো হৈ তরাজু তোল,
তন,বা গহনা মৈঁ সব কুছ দীহ্ন দিয়ে হৈ বাজুবন্দ খোল।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর পূরব জনম বা হৈ বৌল॥

আমি তো গোবিন্দের কাছে বিক্রী হয়ে গিয়েছি। কেউ বলে তিনি আমাকে গোপনে চুরি কোরে নিয়ে গেছেন তাঁর কাছে, কেউ বলে তিনি আমাকে ঢোল বাজিয়ে বিয়ে কোরেছেন। তাঁকে কেউ বলে সুন্দর, কেউ বলে কালো। আমি তো তাঁকে দিব্য চোখ দিয়েই নয়ন ভরে দেখেছি। তিনি নাকি হালকা, আবার কেউ বলে ভারী কিন্তু আমি তাঁকে হৃদয়ের তুলাদণ্ডে প্রেমভক্তি দিয়ে ওজন কোরে নিয়েছি। তাঁর জন্য বসন ভূষণ সবই ত্যাগ কোরেছি।

মীরা বোলেছেন : আমি তাঁর পূর্বজন্মের বাগদত্তা।

কৈসে জিউরী মাই, হরি বিনে কৈসে জিউরী।
উদক দাদুর পীনবত হৈ, জলে সে হী উপজাই।
পল পল জল কুঁ মীন বিসটর তলফন মর জাই।
পিয়া বিনা পীলী ভই রে, জ্যোঁ কাঠ ঘুণ খাই॥
ওষুধ মূল ন সঞ্চেরে, রে বৈদ ফির জাঈ॥
উদাসী হোয় বন বন ফিরুঁরে, বিথা তন জাই॥
দাসী মীরা লাল গিরিধর, মিল্যা হৈ সুখদাই॥

কি কোরে আমি বাঁচি। দাদুরী জলে জন্মায়। জলই তার লীলাক্ষেত্র। মাছ এক মুহূর্তের জন্য জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। জল ছাড়লেই তার মরণ। আমি যে প্রিয়তম ছাড়া শুকিয়ে গেলাম। কাঠে যেমন ঘুণ ধরে, আমার সেই দশা হোয়েছে। বিরহ আমাকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে ফেললো। এ রোগের কোন ওষুধ নেই। কোন বৈদ্য এ রোগ সারাতে পারে না। সারা দেহ আমার যন্ত্রণায় জর জর হোয়ে গেলো। ঠিক এমনি সময় তুমি আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

মেঁ তো মহাঁরা রমৈয়ানে, দেখতো কঝঁরী
তেরো হী উমরল তেরো হী সুমিরণ তেরো হীন ধ্যান ধরুঁরী॥
জহাঁ জহাঁ পাঁব ধরাঁ ধরণী পর, তহাঁ তহাঁ নিরত করুরী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর চরণা লিপট পরাঁ রী॥

আমি রামকে দেখে নয়ন জুড়াতে চাই। হে প্রাণ-বল্লভ তোমার চিন্তাতেই তো আমি মগ্ন। মাটিতে পা দিয়ে যখন আমি পথ চলি তখন প্রতি পদক্ষেপে আমি তোমার নাম গান করি। ওহে মীরার প্রভু গিরিধারীলাল আমি তোমার চরণ জড়িয়ে থাকতে চাই।

মত বারো বাদল আয়োরী রে, হরি কে সঁদেশো।
কুছ নহিঁ লায়ো রে।
দাদুর মেরে পপীহা বোসে, কোয়ল শব্দ সুনায়ো রে।
কারী আঁধিয়ারী বিজুলি চমকে, বিরহিন অতি ডরপায়ো রে।
গাজে বাজে পবন মধুরিয়া মেহা অতি ঝড় লায়ো রে।
ফুঁকে কালী নাগ বিরহ কী জারী, মীরা মন ভায়ো রে।

মেতে মেতে মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেললো কিন্তু আমার প্রাণ বল্লভের খবর তো কেউ নিয়ে এলো না। দাদুরী ময়ূর পাপিয়া কোকিল সবাই মেঘ দেখে ডাকছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এমন সময় আমি একা বিরহী কি কোরে থাকি। বাতাসও শন্ শন্ কোরে বয়ে চলেছে। ঝুম ঝুম কোরে বৃষ্টি নামলো। বিরহের এক কাল নাগিনীর ডাকের মতই সব মনে হোচ্ছে।

মীরা বোলছেন এমন দিনে হরি আমার বড় প্রিয় মনে হোচ্ছে। তাঁর কথাই তো চিত্তে সব সময় আলোড়িত হোচ্ছে।

> চলাঁ বাহী দেখ প্রীতম্ পাবা, চলাঁ বাহী দেশ।
> কহো কসুম্বী সারী রঙাবাঁ, কহো তো ভগতা ভেস।
> কহো তো মোতিয়ন মাগ ভরাবাঁ, কহো ছিটকাবাঁ কেশ।
> মীরা কে প্রভু গিরিধর স্থনিয়ো বিরদ কে নরেশ।

চল সেইখানে যাই যেখানে আমার প্রিয়তম আছেন—সেই দেশে চল যে দেশে আমার প্রাণবল্লভ আছে। কি বেশে তোমার কাছে যাবো বোলে দাও। গৈরিক বস্ত্রে আমি যোগিনীর বেশ ধারণ কোরব— যদি বলো তাহলে সিঁথিতে লাল সিন্দুর পরি। যদি তোমার মন চায় তাহলে এলোচুল মেলে যাব। ওগো প্রিয়, মীরার আবেদন শুনে তাকে তুমি তোমার কাছে টেনে নাও।

> দরশ বিন দুখন লাগে নৈন।
> জব সে তুম বিছুরে মেরে প্রভুজী কবহু না পায়ো চৈন।
> সবদ স্থনত মেরী ছতিয়াঁ কম্পে। মীঠে লাগে তুম বৈন।
> এক টক টকী পন্থ নিহারাঁ ভই ছমাশী রৈন।
> বিরহ ব্যথা কাসুঁ কহুঁ সজনী। বহ গই করবত ঐন।
> মীরা কে প্রভু কবরে মিলাগে। দুঃখ মেটন সুখ দেন।

তোমাকে দেখার জন্য আমার চোখে জল ঝরছে। যখন তুমি আমার থেকে ভিন্ন হোয়েছো তখন থেকে আমার সুখ নেই। তোমার নাম আমার কানে এলে বুক কেঁপে ওঠে। তোমার কথা কি সুন্দর। তোমার

পথ পানে আমি সব সময় চেয়ে আছি। এক রাত্রি যেন ছয় মাসের রাত্রি বোলে মনে হয়। এ দুঃখের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো। সুখের সন্ধান তুমি না দিলে কে দেবে।

অলী রে মেরে নৈনন বান পড়ী।
চিত্ত চড়ী মেরে মাধুরী মূরত, উর বিচ আন অড়ী।
কব কি ঠাড়ী পন্থ নিহারঁ। অপনে ভবন খড়ী।
কৈসে প্রাণ পিয়া বিন রাখুঁ। জীবন মূল জড়ী।
মীরা গিরিধর হাত বিপনী। লোগ কহৈ বিগড়ী।

ওরে সখী চেয়ে চেয়ে যে আমার চোখ গেলো। আমার মনে যে ঐ মূর্তি আঁকা রয়েছে। আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তুমি এসো প্রভু, তোমাকে না পেলে এ প্রাণ আর রাখবোনা। তুমি আমার জীবনের সব।

মীরা বোলছেন। ওগো আমি যে গিরিধারীরকাছে বিক্রী হোয়ে গিয়েছি। লোকে বলে আমি কুপথে গিয়েছি—তোমার জন্য এ কলংক আমার বড় সুখের।

জাবা দেরী জাবা দে। যোগী কিসকা মীত।
সদা উদাসী মোরী সজনী নিপট অটপটী রীত।
বোলত বচন মধুর সে মীঠে। জোরতু নাহি প্রীত।
হুঁ জানু যা পার নিভেগী ছোড় চলা অধবীচ।
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নগর। প্রেম পিয়ারী মীত।

যোগী কোনদিন কি কারও বন্ধু হোতে পারে? যোগী তো সর্বদা উদাসীন। তাঁর কি কোন বচন বাচনের ঠিক আছে। মিষ্টি কথা সে বলবে কিন্তু কারও কাছে ধরা দেবে না। আমি তাঁর প্রেমে পড়ে ভেবেছিলাম যে তিনি আমার ইহকাল পরকালের সঙ্গী হবেন কিন্তু মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দিলেন।

মীরা বোলছেন, তাঁর বন্ধু শুধু প্রেমই চেনে প্রেমিকাকে চেনে না।

"প্রেম নী রে প্রেম নী রে প্রেম নী রে
মন লাগি কটারী প্রেম নী রে।

জল যমুনা মাঁ ভরবা গয়া তাঁ হতী গাগর মাথে

হেম নী রে।

কাঁচে তে তাঁত হরিজীয়ে বাঁধি, জেম খেচে তেমনী রে।

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর সাঁবলী সুরত সুভ এমনী রে।"

প্রেমের ছুরি আমার অংগে লেগেছে। যমুনায় জল ভরতে গিয়ে আমার যে কি কাল হোল। আমার গিরিধারী আমাকে সূতা দিয়ে বেঁধে ফেললো। এখন আর তো কোন উপায় আমার নেই।, যেদিকে টানছে সে দিকে তো আমাকে যেতে হোচ্ছে।

মীরা বোলছেন তাঁর প্রভুর মুখখানা এতই মনোহর যে মন প্রাণ এমনিতেই বিভোর হয়।

তুমারে কারণ সব সুখ ছেড়্যো অব মোহিঁ কুঁ্য তরসাবো।

বিরহ বিথা লাগি উর অন্দর, সো তুম আর বুঝাবো।

অব ছোড়্যো নহিঁ বনৈ প্রভুজী ইস কর তুরত বুলাবো।

মীরা দাসী জনম জনম কী, অঙ্গ শুঁ অঙ্গ লগাবো।

তোমার জন্য আমি সব সুখ বিসর্জন দিয়েছি। তবুও তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছ। তোমার অদর্শনে আমার অন্তর দিবারাত্র জ্বলছে। তুমি আমার এ তাপিত প্রাণের জ্বালা মেটাও। এখন আমাকে ভুলে থাকলে তো চলবে না। আমি তো তোমার চরণের দাসী। শুধু এ জনমের নয়। জনম-জনমের। আর আমাকে দুঃখ দিও না। আমার মনের সব আশা তুমি পূর্ণ করো প্রভু!

আমাকে তুমি দেখা দাও! তোমার পরশ দিয়ে তোমার সাথে জড়িয়ে ধরো। তোমার মাঝে আমাকে বিলীন হোতে দাও প্রভু। তোমার ঐ রাঙাচরণে আমার শেষ শয্যা পাততে দাও।

"একটি নমস্কারে প্রভু—একটি নমস্কারে

সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া

"আমার সাধন হোল সারা
আমার ভজন হোল সারা
গৌরাঙ্গের কান্তা আমি
কান্ত আমার গোরা।"

কান্না কান্না কান্না........

জনমে, মরণে কান্না। সবাই কাঁদে, কাঁদতে হয়। না কাঁদলে মলে না কিছুই। ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র, মাতৃ দুগ্ধ। সব কিছুতেই আছে কান্না। এর হাত থেকে কেউ কোনদিন রেহাই পায়নি, কেউ পাবেও না। যেখানেই যাও, ঘরে বাইরে অন্দরে, কন্দরে, অংগনে, প্রাংগণে, অন্তরে, প্রান্তরে, দেহে, মনে, স্নেহে, প্রেমে সব কিছুতেই সুরধনীর স্রোতের মত বয়ে চলেছে কান্না।

শচীদেবীও কাঁদছেন।

নিত্য তিনি গংগাস্নান কোরতে আসেন।

তাঁর জীবনের বৃন্ত থেকে আটটি কন্যা সন্তান ঝরে গেছে ফুল ঝরার মতো। শুধু গাছটি বেঁচে আছে। বেদনার মূর্ত প্রতীক হোয়ে।

স্বামী জগন্নাথ মিশ্র। ধার্মিক পণ্ডিত। ঘরে আছে তাঁর রঘুনাথ। মোট আটটি সন্তান বিয়োগের ব্যথা তিনি গৃহদেবতা রঘুনাথের [illegible] বালেই গ্রহণ কোরেছেন।

অনিত্য সংসারে সবই অনিত্য। কেউ আসবে কেউ যাবে এ তো ঈশ্বরেরই বিধান। মায়ায় আবদ্ধ জীব। তাই সে সইতে পারে না বিয়োগ ব্যথার আঘাত। ভাবে বুঝি তার আপনজন চলে গেলো।

ঘর সাজানো পুতুল দিয়ে, নানা রংয়ের পুতুল। কোনটা কালো, কোনটা সাদা, কোনটা লাল।

ভেঙে গেলো একে একে সব। ঘর ভাঙলো, মন ভাঙলো, দেহ ভাঙলো। তবুও মানুষের এমন নেশা, ভাঙা ঘরে আবার পুতুল এনে বসায়।

আবার খেলা, সেই খেলা। তারপর আবার সেই পুতুল ভাঙার কান্না। হৃদয়ের গভীরেও চলে সেই কান্নার স্রোত।

কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা
মোহ এব হি কারণম্।

সবই তো মোহ। জগন্নাথ মিশ্র নিত্য বস্তুর দিকে চোখ রাখলেন। যা করেন রঘুনাথ। কাঁদতে হয় তাঁরই জন্য কাঁদবো। এক ফোঁটা চোখের জল ব্যর্থ হোতে দেবো না। সব চোখের জলে রঘুনাথের পা ধুইয়ে দেবো। কত ব্যথা দেবেন দিন। সবই তাঁর চরণে অর্পণ কোরব।

ভক্তি, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার ত্রিবিল্বপত্রে হয় রঘুনাথের নিত্য পূজা।

শচীদেবীর চোখে জল দেখে বলেন জগন্নাথ মিশ্র, কার জন্য কাঁদো, ওরা কে! ওদের ভুলে যাও। যা চিরকালের যা চিরজনের, যা চিরসুন্দর যা চিরশাশ্বত সেই রঘুনাথের চরণে স্মরণ নাও, শরণাগতি হও তাঁর কাছে। কলিযুগে এই হোচ্ছে সকলের একমাত্র আশ্রয়, এ ছাড়া আর কোন গতি নেই।

চোখের জলে ভিজে ভিজে রঘুনাথও হোলেন সিক্ত শেষ পর্যন্ত।

রিক্ত হোয়ে যে তাঁকে ডাকবে—তিনি তার ডাকে সিক্ত হবেনই। রঘুনাথ দয়াময়। রঘুনাথ করুণাময়। শচীদেবীর কান্নায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

বৃন্তে আবার কুঁড়ি দেখা দিল। কুঁড়ি থেকে হোল ফুল। সুগন্ধী পুষ্প। শচীদেবীর গর্ভে নবম সন্তান। শুভদিনে ভূমিষ্ট হোলেন বিশ্বরূপ।

সমস্ত পৃথিবীর অতুল রূপরাশির মানস সরোবর বিশ্বরূপ। এত রূপ মানুষের হয়। নাকি কেউ পথ ভুলে এলো। তা কে জানে?

বিশ্বরূপ যত বড় হয় আর সারা দেহের লাবণ্য যেন ছড়িয়ে পড়ে দেহে ছেড়ে মাটিতে। যেন রূপ থেকে অরূপের আবির্ভাব।

শচীদেবীর চোখের জল একটু একটু কোরে শুকায়। হৃদয়ের যে অন্তঃসলিলা কান্নার ঢেউ তা যেন থেমে যায়।

এক ফুলের সৌরভে তাঁর সারা দেহমন গন্ধে ভরপুর।

এদিকে বিশ্বরূপ ধর্মকর্ম নিয়েই বিভোর। শাস্ত্রচর্চা, টোল, ঈশ্বরতত্ব এই তাঁর খেলাধূলা, এই তার সারাদিনের কর্মসূচী।

দুঃখের সংসারে আনন্দের ঢেউ লেগেছে।

শচীদেবীর মনে এক মহাতৃপ্তি। বিশ্বরূপ তাঁর ঘর আলো করা ছেলে। নবদ্বীপের পথে পথে তার নাম, তার গুণগান। ছেলের মতন ছেলে। যেমন রূপ তেমন গুণ। ভাগ্যবান জগন্নাথ মিশ্র। ভাগ্যবতী শচীদেবী। এমন ছেলের মা কি যে সে হোতে পারে।

বিশ্বরূপ যতো বড় হোতে থাকে ততো বাড়ে তার রূপ আর গুণ। নাম, কীর্তন নিয়েই ডুবে থাকে সে। হরিনামের হাটে সে এক মস্ত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। শুধু নাম, শুধু কীর্তন। শুধু লাভ, লাভের ওপরে লাভ। খরিদ্দারে ভরে গেছে হরিনামের হাট। এ হাট যেন ভাঙে না।

এ হাটে এসো তোমরা সবাই, যে যেখানে আছো। হওনা তুমি ব্রাহ্মণ, হওনা তুমি শূদ্র, হওনা তুমি চণ্ডাল, হওনা তুমি অন্ধ খঞ্জ, দীন দরিদ্র, চলে এস সবাই নির্ভয়ে। এখানে কেনাবেচা করো। লোকসান এখানে নেই। শুধু লাভ। সে লাভ ধনদৌলত নয়। সে লাভ বিষয়আশয় নয়। সে লাভ কামনা বাসনা নয়। সে লাভ ঈশ্বর কৃপা।

বিশ্বরূপ হাসে গায় আনন্দে নৃত্য করে। আর মনে মনে ভাবে সময় ফুরিয়ে যায়। এর ভিতরেই তার সবকিছু সমাধা কোরতে হ'বে। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশ্বরূপ। তাঁর শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মানুষ বিভোর হয় তন্ময় হয়।

বাপ মা ভাবেন, এমন মানুষ বশ করা ছেলে কি এলো পথ ভুলে।

পথ ভুলে আসেনি বিশ্বরূপ। মানুষের পতিত জমি চাষ কোরতে এসেছে হরিনামের লাঙল দিয়ে। ঈশ্বর প্রেমের বীজ যিনি ছড়াবেন তিনি আসছেন পেছনে। চাই আগে জমি তৈরী। তারপর তো বীজ বপন। আগে বর্ষণ কর্ষণ তবে তো বপন।

বিশ্বরূপ এসেছে শোভাযাত্রা পরিচালনা কোরতে। পেছনে আসছেন ঠাকুর। প্রেমের ঠাকুর, কাঙালের ঠাকুর, আর্তের ঠাকুর।

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কমলাক্ষ মিশ্র। কাঁদছেন তিনি। দুচোখের ধারায় ভিজে যাচ্ছে পুষ্পপাত্র। নামাবলীর অক্ষর সিক্ত হোচ্ছে নয়নের জলে। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন বিগ্রহের পানে। ও কে! বিগ্রহের ভিতরে কাকে দেখছেন তিনি। কাঁদছেন আর বোলছেন, তুমি কি তাহালে এলে! এতদিনে কি তোমার আসার সময় হোল। তুমি না এলে যে জীব কাঁদছে না। ওগো তুমি এসো, তুমি না এলে জীবের মুক্তি নেই। জীব যে এখনও মোহাচ্ছন্ন, পাপের সায়রে তারা ডুবছে আর ভাসছে। একি হোল! কোন সাধন ভজন নেই, নেই কারও ঈশ্বর প্রেম, ভাব ভক্তি কারও নেই, নেই কারও স্মরণ মনন, নেই কোন ধ্যান ধারণা। মিথ্যার বেশাতিতে ভরে গেছে সবার জীবন। ভালবাসা নেই, দয়ামায়া নেই, নেই কারও দেবদ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা। ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হোয়ে গেছে জীবের জীবন, এসো প্রভু প্রেমের আলো নিয়ে, দূর হয়ে যাক এ সর্বনাশা অন্ধকার।

হে পথপ্রদর্শক, তুমি এসো, পথ দেখাও। জীবকে প্রেমভক্তি দান করো, ঈশ্বর অন্বেষণে তুমি এবার সহায় হও।

তুমিই তো বোলেছো:

যদা যদাহি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানংধর্মস্ত তদাত্মানাং গৃহাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তোমার কথা তো মিথ্যা হবার নয়। পাপাচ্ছন্ন জীবের পাপ মুক্ত করো প্রভু!

কাঁদছেন কমলাক্ষ মিশ্র। হৃদয়ের সরোবরের সমস্ত বারিধারা যেন দুহাত দিয়ে তুলে দেবতার পায় ঢেলে দিচ্ছেন।

চোখের জলে পথ বেয়ে নেমে এলেন প্রেমের ঠাকুর। নদীয়ার ধূলিকণা হোল ধন্য, পবিত্র হোল নবদ্বীপের মাটি। তাঁর পাদস্পর্শে বিশ্বের সব কলুষ বুঝি ধুয়ে গেলো।

১৪৮৫ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে শচীদেবীর কোল আলো কোরে এলেন প্রেমের ঠাকুর। ঘরে ঘরে উলুধ্বনি, ঘরে ঘরে শংখধ্বনি।

যেন সবাই আবাহন করছে—এসো প্রভু, হৃদয় আসনে। জীবকে উদ্ধার করো। পতিতপাবন হে মধুসূদন জীবকে জাগাও। তাদের মুমুর্ষু দেহে নবজীবনের সঞ্চার করো।

জগন্নাথ মিশ্রের অংগন আজ তীর্থস্থান। এই মহাতীর্থে হোয়েছে আজ যুগবতারের প্রথম মৃত্তিকাস্পর্শ। এমন নয়ন ভোলানো, মনহরণ করা রূপ কেউ কি এর আগে দেখেছে। কেউ কি দেখেছে এমন রূপের নিধি। সর্বরূপের আধার যিনি, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেখানে এসে মিশেছে সেই রূপেই তো এঁর আবির্ভাব।

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর।

সত্যিই তো বিশ্বের ভার যিনি বহন কোরতে এসেছেন তিনি বিশ্বম্ভর ছাড়া আর কি হোতে পারেন।

কেউ বা বোললেন, ওর নাম গোরা হোক। কেউ বা বোললেন, গৌরাঙ্গই হোক ওঁর নাম।

শচীদেবী বোললেন, তোমরা যে নামে ইচ্ছে ডাকো। আমি একে পেয়েছি নিমগাছের তলায় তাই আমি এর নাম রাখলাম নিমাই।

দিন যায়। কত পাতা ঝরে যায় আবার কত নতুন পাতা আসে। নিমাই বড় হয়, এবার উপনয়ন। ন'বছরের নিমাই তার কত নাম। যে যে নামে ডাকে নিমাই তাতেই সাড়া দেয়।

দেবেই তো। যে যেভাবে তাকে ডাকতে পারো ডাকো, সাড়া পাবেই।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজামহ্যম্।

যে যেভাবে ডাকবে যেভাবে ভজনা কোরবে তাতেই সন্তুষ্ট আমি। আমি চাই ভক্তি তার বিনিময়ে দেবো প্রেম। এই প্রেমভক্তিই তো কলির রক্ষা কবচ। এ যাত্রায় আমার আসা তো সকল জীবের দেহে ঐ রক্ষা কবচ বেঁধে দিতে।

বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর। শচীমাতার যেন দুটি চোখ।

নিমাই দাদার পিছনে আছে ছায়ার মত। বিশ্বরূপও তেমনি নিমাই অন্ত প্রাণ। নিমাই ছাড়া যেন বিশ্বরূপ নেই।

সব হারিয়ে যা পেয়েছেন শচীদেবী তাতেই তিনি যেন সব ভুলে গেছেন। গংগার ঘাটে গিয়ে নিত্য যার চোখের জল পড়তো, হৃদয়ে জাগতো এক চরম বিতৃষ্ণা সে ভাব এখন কেটে গেছে।

বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর। দুই ভাই সে চোখের জল চার হাত দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে।

জগন্নাথ মিশ্র বলেন শচীদেবীকে, বিশ্বরূপ বড় হোয়েছে এবার তার বিয়ে দিতে হ'বে।

শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা হোয়ে যান, হ্যাঁ তাই করো, এমন মেয়ে আনতে হ'বে যাতে বিশ্বরূপের পাশে সর্বরূপা হয়।

বিশ্বরূপের বিয়ে। মেয়ে দেখার পর্ব চলছে।

বিশ্বরূপের কানে গেলো সব কথা। আর কি, এবার খাঁচার পাখী দোর খুলে ফেললো।

বৈরাগ্যের গেরুয়া যার অংগে, ঘরের মায়ায় যে আবদ্ধ হোতে আসেনি তাকে কে বাঁধবে ঘরে।

আর নয়, এবার অন্যপথ ;

সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় তার শেষ। এবার বিশ্বপিতার সংসারে আশ্রয় নিতে হ'বে।

বেলা গেলো সন্ধ্যা হোল
ওরে পাখী নিড়ে ফিরে আয়।

এবার নীড়ে ফেরার পালা এসেছে বিশ্বরূপের :

মা, ও মা!

কিরে বিশ্বরূপ!

এই পুঁথিটা তুমি রাখো। নিমাই বড় হোলে তুমি তাকে দিও।

কেন রে! তুইই তাকে দিস্!

না মা যদি হারিয়ে যায়, এটা 'ওকে আমি দিলাম, তুমি রেখো দাও।

শচীদেবী হাত পেতে নিলেন পুঁথিখানা। হাতটা যেন একবার কেঁপে উঠলো। শচীদেবী কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বিশ্বরূপের অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে, তার কাজ শেষ! এবার পথের সন্ধান চাই। যে পথের শেষে মিলবে জীবনের পরম সাধনার ধন।

মায়ের জন্য মন কেঁদে ওঠে, প্রাণের ভাই নিমাই তার জীবনের চেয়েও প্রিয়। কিন্তু পথ কোথায়? খাঁচার দোর খোলা, এই তো সুযোগ! মায়া যখন নিজেই তার দোর খুলে তাকে বাইরে যেতে বোলছে তখন আর কেন!

গভীর রাত। যেন অমানিশার গাঢ় অন্ধকার। খোলা চোখে কিছুই দেখা যায় না।

অন্তরের গভীরে জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে পাপড়ি খোলে, হ্যাঁ এইবার চলো!

মনে মনে বাবা মাকে প্রণাম করে। একবার পিছন ফিরে চায়। পরে লোকনাথকে সংগে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আকাশ কালো, পথ অন্ধকার। বিশ্বরূপ চলেছে এক পথ থেকে অন্য পথে। এক বিশ্ব পথিক চলেছে মহান পথের সন্ধানে। সে পথ জ্ঞানের, সে পথ তিতিক্ষার, সে পথ সাধনার, সে পথ প্রেমের, সে পথ ভক্তির

এদিকে রাত ভোর হোচ্ছে।

অন্ধকারের চাদর খুলে যাচ্ছে, পূবের আকাশ ফরসা হোয়ে আসছে ধীরে ধীরে। শেষ রাতের একটা নক্ষত্র যেন চোখ পিট্ পিট্ কোরছে। আর বোলছে শচীদেবীকে উদ্দেশ্য কোরে, তোমার বিশ্বরূপ চলে গেছে। আমি সাক্ষী!

বিশ্বরূপ তখন অনেক দূরে। রাত শেষ। এবার ভোর।

শচীদেবীর আনন্দের সাগরে আবার দুঃখের তরংগ। বিশ্বরূপ চলে গেছে সন্ন্যাস নিয়ে।

নিমাই সান্ত্বনা দেয়, মা আমি তো আছি তোমার। তুমি কেঁদো না।

শোকের ওপরে শোক। পুরানো ব্যথা আবার যেন জেগে উঠলো। জগন্নাথ মিশ্র সামলাতে পারলেন না আর। আঘাত কত সইতে পারে মানুষ। ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত এসে যদি ঘা দিতে থাকে মানুষ কি কোরে সামলাবে।

জগন্নাথ মিশ্র দেহ ত্যাগ কোরলেন। শচীদেবী বুঝি পাথর হোয়ে গেছেন।

নিমাই মার পাশে পাশে থাকে। বার বার বলে, ওমা আমি তো আছি, তুমি কেন ভাবো!

সত্যিই তো তিনি যখন আছেন আর ভাবনা কি! সর্ব দুঃখ যিনি হরণ করেন, সকল জ্বালা থেকে যিনি মুক্তি দেবেন, সবার চোখের জল যিনি মোছাতে এসেছেন, তিনি যখন বোলছেন: আর ভাবনা নেই তখন আর ভয় কি!

শচীদেবী নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সারা বুক যেন শীতল হয়। কাঙালের ঠাকুর যার বুকে আর তার শংকা নেই, নেই কোন চিন্তা। শচীমাতা যেন বোলতে চান, ওরে তোকে আমি কি জানিনে, চিনিনে। লোকে দেখছে আমি তোর মা। কিন্তু সত্যিই কি তাই রে। পরে বলেন, বাপ নিমাই থাক আমার বুক জুড়ে।

চোদ্দ বছরের ছেলে নিমাই বাড়ীতে টোল খুলেছে। ছাত্ররা আসে

দলে দলে, এমন শাস্ত্রব্যাখ্যা নবদ্বীপে আর কে কোরতে পারে! নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে নিমাই তখন প্রতিষ্ঠিত। এমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নবদ্বীপে আর জন্মগ্রহণ করেনি।

শচীমাতার আনন্দ আর ধরে না।

নিমাই বংশের মুখ উজ্জ্বল কোরেছে!

মুখে মুখে সবার এক কথা এমন রূপ আর এমন গুণ দেবতাদেরই সম্ভব, মানুষের সম্ভব নয়।

ঘর ভরে গেছে ছাত্রে। সকলেই তাঁর কাছে পড়তে চায়। সবাই চায় তাঁকে, এমন গুণ যার, তার পরশ কে না চায়।

অভাবের জীর্ণ দেওয়ালে ধীরে ধীরে প্রাচুর্যের রং ধরে, সংসারের জীর্ণ তরণী এখন নববেশ ধারণ কোরেছে। কোরবেই তো! কর্ণধার যে স্বয়ং নিমাই।

এমন সময় একদিন বনমালী আচার্য এলেন শচীমাতার কাছে।

শচীমাতা যত্ন কোরে তাঁকে বসালেন।

আচার্য বোললেন, নিমাইয়ের জন্য মেয়ে ঠিক কোরেছি। এবার তার বিয়ে দিতে হ'বে।

শচীমাতার মন যেন আনন্দে নৃত্য কোরতে থাকে। নিমাইয়ের বৌ আসবে। এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হোতে পারে।

বনমালী আচার্য একটু থেমে বলেন, মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া। বল্লভাচার্যের মেয়ে। যেমন রূপ তেমন গুণ। মানাবে ঠিক লক্ষ্মীনারায়ণ যেন।

নিমাইয়ের পাশে আমার ঐরকম মেয়ে না হোলে কি মানায়।

লক্ষ্মীপ্রিয়া তো নিমাইয়ের খেলার সাথী। ছোটবেলায় কত খেলেছে তার সাথে। গংগার ঘাটে কত জল ছোঁড়াছুঁড়ি সেই যে পূজো পূজো খেলা।

লক্ষ্মীপ্রিয়া তার সংগীসাথী নিয়ে হয়তো জলে নেমেছে। নিমাই পা দিয়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

কেউ বলে, পা দিয়ে জল ছিটাচ্ছিস তোর পাপ হবে না!

নিমাই হাসে, পাপ—আমার আবার পাপ!

সত্যিই তো জীবকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এসেছেন যিনি তার আবার পাপ।

কেউ কেউ রাগ করে বলে, এমন ছেলে কোথাও দেখিনি বাবা!

লক্ষ্মীপ্রিয়া বালির ওপর ফুল বেলপাতা সাজায় পূজো হ'বে।

নিমাই গিয়ে ভিজে কাপড়েই দাঁড়ালো। বোললে, আমার পূজো কর, ভাল বর পাবি!

একজন ঠোঁট বেকিয়ে বলে, ইস্ আমার কেষ্টঠাকুর রে।

নিমাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে।

লক্ষ্মীপ্রিয়া চেয়ে চেয়ে দেখে। রতনে রতন চেনে। সে চেনার চোখ চাই, চাই সেই মন, চাই সেই প্রাণ। এ তো অজানা নয়, অচেনা নয়, এ যে চিরচেনা।

সব মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে কবে কোন্ যুগে কোথায় যেন দেখেছি।

লক্ষ্মীপ্রিয়া তন্ময়। মন্ময় লক্ষ্মীপ্রিয়া। সেই লক্ষ্মীপ্রিয়া এলো আজ নিমাইয়ের ঘরণী হোয়ে।

ছেলেবেলার খেলা আজ তার সত্যে পরিণত হোয়েছে। ভাল ঘরও পেয়েছে, ভাল বরও পেয়েছে।

লক্ষ্মীপ্রিয়া আজও ফুল তোলে। নিমাইয়ের পায়ে তা অর্পণ করে ভক্তিভরে প্রণাম করে। বনফুলের মালা গেঁথে পরায় তাঁর গলে।

নিমাই আজও হেসে বলে, তুমি আমার পূজো কোরছ!

লক্ষ্মীপ্রিয়া চোখ দুটো উচু কোরে বলে, হ্যাঁ আজ নয়, অনেকদিন থেকেই কোরছি, তুমিই তো আমার সব ইহকাল, পরকাল, আমার স্মরণ, মনন, ধ্যান, সাধন, ভজন সবই তো তুমি। জন্মে অবধি তোমাকে চেয়েছি। এবার পেলাম তোমাকে তুমি আমাকে পূর্ণ করো। শেখাও আমাকে প্রেম ভক্তি।

নিমাই চেয়ে আছে লক্ষ্মীপ্রিয়ার দিকে। চারচোখের মিলন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া ভাবে বিভোর। কি দেখছে তা সেই জানে। এ দেখার তো শেষ নেই, দু'চোখে দেখে যেন তৃষ্ণা মেটে না। এ যেন রূপে রূপে অরূপ। এমন মনোহরা লাবণ্যময় জ্যোতিঃ কি দুচোখে দেখে শেষ করা যায়।

কোটি নেত্র নাহি দিলে, সবে দিলে দুই
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি।

এ রূপ দেখতে হোলে কোটি নেত্র চাই। তাতে কোন পলক থাকবে না, থাকবে না কোন বিরাম।

শুধু প্রাণ ভরে দেখা।

নিমাই বসে লক্ষ্মীপ্রিয়ার দিকে চেয়ে। হাত ধরে টেনে নেয় তার বুকের ভিতরে। চূর্ণকুন্তলে হাত দিয়ে বলে, প্রিয়া কি চাও তুমি!

তোমাকে পেয়েছি সব পাওয়া আমার হোয়ে গিয়েছে, আর কি চাই।

কিন্তু মানুষের যে চাওয়ার শেষ নেই!

তারা ভ্রান্ত, তাই তারা চেয়ে ব্যথা পায়।

নিমাই কথা বলে না।

বুকের ভিতর লক্ষ্মীপ্রিয়া।

নিমাই পথ দিয়ে চলে গেলে সবাই চেয়ে থাকে। পথ বলে আর একটু চরণপরশ দাও। বৃক্ষলতা বলে আর একটু দাঁড়াও প্রাণভরে দেখি।

যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া যাইতে
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে শক্তরিতে।
স্ত্রীলোক দেখিয়া বলে, হেন পুত্র যার
ধন্য তার জন্ম তার পায়ে নমস্কার।
যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি
স্ত্রী জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী।

জন্ম সার্থক লক্ষ্মীপ্রিয়ার!

ধন্য শচীদেবী! নররূপী নারায়ণকে পেটে ধরেছেন। তাঁর মত

সুখী কে ? তার মত তৃপ্তি কার। যিনি জীবের জীবন, যিনি জীবের উদ্ধার কর্তা তিনি শচীদেবীর আশ্রয়ে।

এ সুখের হাটে বেচাকেনা কোরতে পারলেন না জগন্নাথ মিশ্র। এমন লাভের জিনিষ এ হাটে আর আগে আসে নি। সবই ভাগ্য। বহুভাগ্যে এমন জিনিষ মেলে।

লক্ষ্মীপ্রিয়া মনপ্রাণ সব সঁপে দিয়েছে নিমাইয়ের পায়ে। ও রাঙা চরণে মনপ্রাণ বাঁধা যে রাখতে পারে তার সুদে আসলে মিলে যায় পুরাপুরি।

নিমাই বলে, এমন কোরে বাঁধছো কেন।

তোমাকে বেঁধে কেঁদেও আমার সুখ! কিন্তু তোমাকে বাঁধব সে সাধ্য আমার কোথায়। তুমি ধরা না দিলে আমি তো সারা জনমেও তোমাকে ধরতে পারবো না। আমাকে শূন্য কোরে দাও প্রভু। কিছুই যেন আমার অবশিষ্ট না থাকে।

গোরা অনুরাগে
এ দেহ সঁপিনু
তিল তুলসী দিয়া।

লক্ষ্মীপ্রিয়া নিমাইয়ের পদসেবা কোরতে কোরতে তাঁর পায়ের ওপরই ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নের সোনালী রাত এগিয়ে যায় চুপি চুপি। জোনাকীরা লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল রূপ দেখে রাত জাগে।

পাখীর ডাকে ভোর হয়। সুখের রাত, ভোর হোতে না হোতে দুঃখের বাঁশী বেজে ওঠে। নিমাই পূর্ববংগে যাবে। সেখানে সবাই তাঁকে ডাকছে। যেতেই হ'বে। ডাকলে কি তিনি থাকতে পারেন। যুগে যুগে যিনি ভক্তের ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি কি থাকতে পারেন প্রিয়ার কণ্ঠলগ্ন হোয়ে। আকুল স্বরে ডাকছে তাঁকে যারা তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে কি কোন উপায় আছে।

শচীমাতার চোখ জলে আবার ভাসে! ওরে তুই কি শুধু আমাকে কাঁদাতেই এসেছিস। আর কত কাঁদাবি!

মা গো তুমি এখানে কাঁদছো একা, আর সেখানে কাঁদছে আমার জন্য সবাই। তুমি শান্ত না হোলে. আমি তো তাদের কান্নার ভাগ নিতে পারবো না। অনুমতি দাও মা, আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো

মা অনুমতি দেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়াও কাঁদছে।

বনের পাখী মনে এসে বাসা বেঁধেছিল আবার সে পাখী বনে চলে যাবে। কোন প্রাণে তা সহ্য হয়। নিমাই ছাড়া লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রাণহীন নিমাই ছাড়া লক্ষ্মীপ্রিয়াই তো শূন্য।

রাধাকৃষ্ণ! এই তো ডাক, এই তো ধ্যান, এই তো জ্ঞান। দুই মিলে এক। একে একে দুই তাঁরা নয়।

তবে লক্ষ্মীপ্রিয়া কি কোরবে? এ বিরহ তাকে সইতেই হ'বে। এই তো প্রেম, এই তো ভালবাসা, এই তো সাধনা। বিরহ হোচ্ছে জীবের পরীক্ষার বড় প্রশ্ন।

সে বিরহ কৃষ্ণবিরহ।

নিমাই পিতৃভূমি পূর্ববংগে পাড়ি জমালেন। দিন যায়। পদ্মা মেঘনার দুকূল ছাপিয়ে জলের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় কত ক্ষেতখামার। পাড় ভাঙ্গে আবার সেখানে চর দেখা দেয়। কাশফুলে ভরে যায় পদ্মার কিনারা।

নদী বয়ে যায়।

লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর বিরহ যেন আর সহ্য কোরতে পারে না। মহাকাল সর্প হোয়ে তাকে দংশন করে। নীল হোয়ে যায় তার দেহ। লক্ষ্মীপ্রিয়ার খেলা শেষ হোল।

নিমাই তখন পূর্ববংগ ছেড়ে নবদ্বীপের পথে। অন্তর্যামী তিনি, তাই বুঝতে পারেন লক্ষ্মীপ্রিয়া নেই। ফিরে আসেন নবদ্বীপে।

বাড়ীর পথে পা বাড়াতেই তাঁর মাথার ওপর দিয়ে একটা কাক কা কা রব কোরতে কোরতে উড়ে যায়। পথে তিনি কয়েকবার হোচট খান। বুঝতে পারেন একটা কিছু অমংগল ঘটেছে তাঁর ঘরে।

সারা বিশ্বসংসার যার ঘর তার আবার ঘর।

নিমাই বাড়ী এসেই মাকে প্রণাম কোরে বোলে ওঠেন, মা কি একটা ঘটেছে মনে হয়।

শচীমাতা কেঁদে ওঠেন বালিকার মত :—হ্যা বাবা নিমাই, লক্ষ্মীপ্রিয়াকে হারিয়েছি জনমের মত। বারে বারে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। নিমাই স্থির শান্ত। এতটুকু চঞ্চলতা নেই। সারা বিশ্বপালক যিনি তাঁর কি এতে বিচলিত হোলে চলে?

নিমাই মাকে বোঝালেন—

প্রভু বোলে 'মাতা' দুঃখ ভাব কি কারনে
ভবিতব্য যে আছে সে ঘুচিবে কেমনে
এইমত কালগতি কেহো কারো নহে
অতএব সংসার "আনিত্য" সর্ববেদে কহে।
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর।
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়
হইল সে কার্য আর দুঃখ কেনে তায়।
স্বামীর অগ্রেতে গংগা পায় যে সুকৃতি
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী

মা তুমি কাতর হোয় না! তোমার মত এমন সহ্য শক্তি কার আছে মা? তোমার মত এত দুঃখ কে পেয়েছে মা? তোমার চোখের জল তো শুকালো না? তবুও তোমার মত মানুষ কজন মেলে এ সংসারে? তোমার দেখে তো জগৎ শিখবে! মা! মা!

একি নিমাই তুই কাঁদছিস বাবা। লক্ষ্মীপ্রিয়ার জন্য কেঁদে কি হবে!

না মা আমি তার জন্য কাঁদছি না! আমি কাঁদছি তোমার জন্য মা—

কেন বাপ! আমি তো ভালই আছি—

না মা তোমার চোখের জল শুকালে তো চলবে না তাহলে তো

আমার এবারের আসা সফল হবে না! তোমার কান্নায় যে জগৎ কাঁদবে। তুমি না কাঁদলে তো জগৎ কাঁদবে না। তুমি না কাঁদ জীবের উদ্ধার হবে না।

কি এসব তুই বোলছিস আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিমাই আর কিছু বলে না।

শচীমাতা তাকে বুকে টেনে নিয়ে গায়ে হাত বোলায়।

তিঁনি বলেন তোর সুখই আমার সুখ! তোর মুখের দিকে চেয়েই তো আমি বেঁচে আছি আর আমার কি আছে। তোর চিন্তাতেই আমি বিভোর বাবা।

রাত্রি দিন নাম কর খাইতে শুইতে
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।
শুন সব—কলি যুগে নাহি তপ যজ্ঞ
যেইজন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ॥

মনে মনে এই এক ভজনা কোরছিল আর একজন।

সে বিষ্ণুপ্রিয়া। রোজই আসে সে গংগা স্নানে। গংগাস্নানের ওর আবার কি প্রয়োজন। তবুও ওর আসা চাই। শুধু একবার নয় তিনবার। বয়স আর কতই বা হবে। দশ বা বারোর ভিতরে, এর ভিতরেই ও কি বুঝে নিয়েছে গংগাস্নানের ফল। এমন সুন্দর বনহরিণীর মত কান্তি, দীঘল বেণী। কালো কাজল চোখে কি এক মায়া অঞ্জন। এমন রূপ নিয়ে ও এ দুনিয়ায় কেন এসেছে।

মানুষের এমন রূপ কে দেখেছে এর আগে। এই বয়সে এঁটুকু মেয়ে যেন সাধনায় বসেছে। সিদ্ধিলাভ ওকে বুঝি কোরতেই হবে। রাতটুকু শেষ হোতে যেটুকু দেরী—ও যেন রাত জেগে জেগে সকাল হওয়ার স্বপ্নই দেখে। কখন রাত পোহাবে কখন সে পবিত্র সুরধনী স্রোতে দেহমন ভাসাবে এই তার একমাত্র চিন্তা। অবশেষে রাত ভোর হয় আর সেও বেরিয়ে পড়ে গংগাস্নানে।

শচীদেবী ও নিত্য আসেন গংগাস্নানে। মনে মনে শুধু ভাবেন—

কত শত অপরাধে তিনি ঈশ্বরের কাছে অপরাধিণী তা নইলে এই জীর্ণ দেহটাকে এখন ও কেন টেনে নিয়ে বেড়াবেন। আর কেন প্রভু এবার ছুটি দাও, দুঃখের পর দুঃখ পেয়েছি, আঘাতের পর আঘাতে এ দেহ ভেঙে চুরমার হোয়ে গেছে। দুনিয়ায় এসে ভেবেছিলাম সবাই আপন আমার কিন্তু কই আমাকে তো কেউ আপন কোরল না; এবার আমাকে তোমার কোলে তুলে নাও।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল!

কে এই মেয়েটি, এমন ভক্তি মেয়েটির, এত ভক্তি কোরতে ও শিখলো কোথায়?

মেয়েটি স্নান শেষ কোরে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম জানায়। কি প্রার্থনা ওর তা ঐ জানে!

ধীরে ধীরে মেয়েটা উঠে আসে ঘাটের ওপর। শচীদেবীকেও একটা প্রণাম কোরে আপন মনে পথ বেয়ে চলে যায়।

নিত্য ঘটনা এটা।

শচীদেবী রোজই ভাবেন—মেয়েটি কি তাঁর চেনা, তবে ও রোজ কেন প্রণাম করে? আরও কত শত মেয়েতো আসে গংগাস্নানে, কই কেউ তো এমন কোরে রোজ তাঁকে প্রণাম জানায় না।

তবে! মেয়েটি নিশ্চয়ই চেনে তাঁকে।

চেনে বই কি! না চিনলে এমন কোরে লুটাতে পারে সারা দেহমন। অতীতের অন্তঃস্থল থেকে কে যেন বোলে ওঠে—চিনি গো তোমাকে চিনি, তুমিই তো সেই মা যশোদা, তুমিই তো সেই জননী কৌশল্যা, এক এক বার এক এক ভাবে আসছো আর আমাকেও জন্ম নিতে হোচ্ছে। তোমার চরণকমলে আশ্রয় নিতে হোচ্ছে।

এবারও তাই আসতে হোয়েছে, সেই একই খেলা, সেই একই দাবী।

রামসীতা। শ্রীকৃষ্ণরাধিকা। আর এবার গৌরপ্রিয়া।

শচীদেবী আজ আর ছাড়েন না, রোজই পালিয়ে যায়, আজ

ধরেছেন। ধরেছেন তো একেবারে আপন বুকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এ অপরূপ নৈবেদ্যের ডালি তো সাজানো হোয়েছে তাঁরই ঘরে যাবার জন্য। এ রূপ, এ লাবণ্য তো তাঁর ঘরেই মানায়! সেখানে আছে যে আর এক অপরূপ। রূপে রূপে অরূপ না হোলে তো লীলা হবে না।

তুমি কে মা! শচীদেবী বলেন।

প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া।

আশীর্বাদ করি যেন যোগ্যপতি তোমার হয়। আহা! কি সুন্দর নাম তোমার, বিষ্ণুপ্রিয়া, নামের সংগে নামীও মিশে একাকার হোয়ে গেছে। তুমি বিষ্ণুরই ঘরণী, সর্বকালে, যুগে যুগে।

শচীদেবী চমকে উঠলেন—এ কি বোললেন তিনি! ঠিকই বোলছেন শচীদেবী।

বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে শচীদেবীর সামনে।

কালো চুলের গুচ্ছ বেয়ে জলের ধারা পড়ছে। শচীদেবী নিজের আঁচল দিয়ে তার ভিজে চুল মুছিয়ে দিলেন। কপালে রাখলেন একটা সস্নেহ চুম্বন। বোললেন, আমাদের বাড়ি একদিন যেও বেড়াতে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ে।

যেন বলে সে অধিকার আমাকে অর্জন কোরতে দাও, সেই আশীর্বাদই করো আমি যেন আমার আকাঙ্খিত চরণে আশ্রয় নিতে পারি। তুমিই তো আমাকে নিতে এসেছো। তুমি না নিলে আমি যাই কি কোরে।

শচীদেবী বোললেন তার চিবুক ধরে—মা গো তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও। কার মেয়ে তুমি!

সনাতন মিশ্র আমার বাবার নাম।

তুমি তো খুব ভাল ঘরের মেয়ে—ভাল বর হোক তোমার, এই আশীর্বাদ করি।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে এসে ভাবছে।

ভক্তিপূজার এবার আয়োজন সুরু হবে। বোধন হয়েছে গংগার

ঘাটে। শৈশব থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়া পূজা অর্চনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে রাত জাগছে। এ পূজা তো তার ব্যর্থ হবে না। প্রেমের ঠাকুর কি আর তার কথা শুনবেন না, হৃদয় দিয়ে হৃদয় পূজা, চোখের জলে দেবতার আরতি, অন্তরের সমস্ত ভক্তি উজাড় কোরে দিয়ে যে প্রেম নিবেদন তা সফল হবেই। আকুল প্রার্থনায় দেবতার সিংহাসনও টলে।

যৌবন আসে দেহের প্রতি রন্ধ্রে সুগন্ধী পুষ্প ছিটিয়ে। আজও সেই পূজা চলছে। সিংহাসনের বিগ্রহ যেন নতুন বেশ ধারণ করেছেন। সে যেন দেখছে এক তমাল কিশোর দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। মাথায় তাঁর মুকুট, হাতে বাঁশী, নূপুরের ধ্বনিতে তার কানে আসছে অতীত যুগের এক স্মৃতি ভেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন শ্রীরাধিকা হোয়ে বৃন্দাবনে রয়েছে। বিগ্রহ যেন বোলছেন—এবার লীলা নবদ্বীপে। ভালো কোরে চেয়ে দেখো আমিই তো সেই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবার নদের নিমাই, যমুনাপুলিনে শ্রীরাধা এবার সুরধনী তীরে বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি একটু ধৈর্য ধরো। আবার আমরা এক হবো। তুমিও যা আমিও তাই—একই অংশে দুই রূপ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চমক ভাঙে। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বলে, তুমি এসো আমার হৃদয় সিংহাসনে। তোমার জন্যই তো পূজার ডালি সাজিয়েছি, তোমার জন্যই আমার নিত্য গংগাস্নান। গংগা বয়ে এনেছে যমুনার জলধারা। সেই নীল জলে দেখেছি তোমার ছায়া, তাইতো ডুবেছি তোমার গহনে। তুমি ছাড়া আমি কই! তোমার ভিতরেই তুমি এস, হৃদয় আমার হোয়েছে শতদল পদ্ম। সে পদ্মাসনে এসো!

জননী মহামায়া দেবী মাঝে মাঝে ভাবেন—এত রূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার, এ কি আমার কন্যা। মনে পড়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মের কথা।

১৪১৫ সালের মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথির স্বর্ণলগ্নে যে এলো সে কে? সে কি সত্যি সত্যিই মহামায়ার কন্যা না আর কেউ।

সনাতন মিশ্র নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। ভাবেন, যিনি দিয়েছেন

তিনিই জানেন এ কন্যা কে? সেবা যত্নে বড় কোরে তোলার ভার আমাদের। বৃন্দাবন উঠে এলো নবদ্বীপের মাটিতে। গৌরাঙ্গও এসেছেন। এসেছে গৌরপ্রিয়া। এবার লীলা স্বরু।

ওদিকে গৃহদেবতার সামনে বলে চলেছে একাগ্রচিত্তে অশ্রু দিয়ে লেখা এক মধুর নাম। সে নাম কৃষ্ণ নাম।

চোখের জলের ঢেউ চলেছে অবিরাম কুলকুল কোরে। যেন বোলছে, তুমি আমাকে কৃষ্ণপ্রিয়া করো। আমাকে কৃষ্ণপ্রেম দাও। এ শুকনো হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা আনো। এ ছাড়া তো আমার চাইবার আর কিছু নেই।

তেষাং যতত যুক্তানাং
ভজতাং প্রীতি পূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং
যেন মামুপযান্তি তে।

আপন চিত্ত যারা নিঃশেষে আমাকেই অর্পণ কোরেছে। প্রেম ভরে যারা আমারই ভজনা কোরে থাকে তাদের আমি নির্মল প্রজ্ঞা দান করি।

তাই দাও প্রভু! আমারও তো তাই কাম্য। তুমি আমাকে এই আশীর্বাদ করো আমি যেন সব সময় বোলতে পারি—

কৃষ্ণ আমার জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরো সেবা করি সুখী করো
এই মোর সদারহে ধ্যান।

প্রভু আমাকে তোমার ভৃত্য করো। আমাকে তোমার ছায়া করো। তোমার বহিরঙ্গা রূপে আমার মন তো ভরে না, চাই তোমার অন্তরঙ্গা রূপ। তোমার সুখই যেন আমার সুখ হয়। তোমার তৃপ্তিই আমার পরিতৃপ্তি। তুমি জেগে থাকো আমি তোমার মাঝে ঘুমিয়ে থাকি! আমাকে লয় কোরে দাও। তোমাকে পেয়েও সুখ চেয়েও সুখ। এ সুখ থেকে বঞ্চিত কোর না।

নিমাই নামে যেন সারা নদীয়া পাগল। অমৃতক্ষরা নাম।

নিমাই ছাত্র নিয়ে ব্যস্ত। দিন রাত শুধু শাস্ত্রচর্চা।

বিষ্ণুপ্রিয়া ওদিকে মগ্না পূজা আর ধ্যানে।

এ ছাড়া তো আর কলির জীবের অন্য কাজ নেই। শুধু স্মরণ আর শরণ, সাধন ভজন তপযজ্ঞ নাইবা হোল। শুধু ডাকতে পারলেই হোল।

পশুপক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনে সে তরে
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে।

তুমি কি ভাবছো? তোমার চিন্তা কেন? তিনিই তো তোমার যোগ ও ক্ষেম বহন কোরছেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের মুখের দিকে চান আর ভাবেন, সোনার প্রতিমা আনতে হবে। ঘর শূন্য হোয়ে গেছে। বৌ না হোলে কি ঘর মানায়। শচীদেবী মনে মনে মেয়ের খোঁজ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানা তাঁর সামনে যেন ভেসে ওঠে। এইতো সেই মেয়ে। যে তপে বসেছে শৈশবে, যে গৌরাঙ্গ মগ্না ধ্যানে।

শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে
সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে

তবে আর দেরী কেন! কাশীনাথ পণ্ডিতকে পাঠালেন সনাতন মিশ্রের বাড়ী।

পণ্ডিত বোললেন, তুমি ব্যাকুল হোয়ো না ঐ মেয়েকে তোমার ঘরে আমি এনে দেবো।

শচীদেবী তবুও শংকিতা। সনাতন মিশ্র অবস্থাপন্ন যদি........

সনাতন মিশ্র পরম ধার্মিক, দেবদ্বিজে ভক্তিমান। পত্নী মহামায়া, কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, ছেলে যাদব বিধুমুখী ও মাধব এই হোল তাঁর সংসার। সমস্ত সংসারের বোঝা তিনি বিগ্রহ দেবতার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে বসে আছেন।

কেন তোমরা বোঝা বইছ। যার বোঝা তার ঘাড়েই দাও, যার চিন্তা তিনিই করুন। তুমি শুধু বিশ্বাস করো। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিশ্বাস করো আর বলো, তুমি তো আছো তবে আমি ভাবি কেন! এই ভক্তি আর বিশ্বাসের পথ বেয়েই তাহলে তিনি নেমে আসবেন।

সনাতন মিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিতের মুখে সব শুনে আনন্দে আত্মহারা হোয়ে যান। সত্যিই এমন ভাগ্য তাঁর হবে, নদীয়া বল্লভ, পণ্ডিত. শিরোমনি গৌরাচাঁদ তাঁর কন্যাকে চরণে স্থান দেবে। এ কি বিশ্বাস করা যায়।

মহামায়া দেবী বার বার যুক্ত করে ঈশ্বরকে ডাকেন—হে জগতপতি, এ যোগাযোগ তুমি পাকা করো। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন আমার গৌরপ্রিয়া হয়। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া সত্যি সত্যিই বিষ্ণুর ঘরণীই হবে।

ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে বার বার তিনি প্রণাম জানান।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘিরে বসে আছে সখী কাঞ্চনা আর অমিতা।

কাঞ্চনা হেসে বলে, আর কেন এবার চোখের জল মোছ, চোখ যদি জলের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয় তাহালে তাঁকে দেখবে কি কোরে। এবার বাহির দুয়ার বন্ধ কোরে দাও, ভিতর দুয়ার খুলে রাখো। জীবন দেবতা যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন।

অমিতা মিটিমিটি হাসে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার চিবুক ধরে বলে—সখী জীবন যৌবন সবই তো তোমার এবার যায়। সাজাও নিজেকে, অন্তরের সিংহাসন মনের মত কোরে প্রেমভক্তি দিয়ে সাজাও।

অমিতা গুন গুন কোরে গেয়ে ওঠে—

এ আমার সই কেমন হোল
প্রাণের কথা কবো কারে।
আমি জানি মন জানে মোর
আর তো কেউ জানে না রে।

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ বুজে যেন দেখছে সেই অন্তর দেবতাকে। মাথায় চূড়া, হাতে সেই পাগল করা বাঁশী, পায়ে সোনার নূপুর।

ওগো তুমি কি এলে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া চারিদিকে চায়। চোখের মণি খুঁজে বেড়ায় তাকে। কোথায় কতদূরে লুকিয়ে আছে সেই কঠিন কঠোর।

আবার কান্না! চোখের সাগরে বন্যা এসেছে। আর কত কাঁদাবে, আর কত কাঁদবো। তিন জনমে আমার কান্নাই তো সার হোল। আমাকে কাঁদিয়ে তোমার কি সুখ তা তুমিই জানো। বুঝতে পারছি এবারও আমায় কাঁদতে হ'বে।

কাঁদতে হবে না তোমাকে ?

তুমি তো শুধু বিষ্ণুপ্রিয়া নও। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, তুমি গৌরপ্রিয়া! তোমার মাঝেই তো রাধার আবির্ভাব। তোমার মাঝেই তো সেই রাধাশক্তি, তোমার মাঝেই তো জীবের মোক্ষমুক্তি! এবার শুধু কান্নার পর কান্না! তুমি কাঁদবে, নিমাই কাঁদবে, সারা জগৎ কাঁদবে।

তোমাদের কান্নার সাগরে এবার জীবের মুক্তি স্নান।

রাধার সে ধার শুনতে গোরার
এবার সারা জনম কাঁদা।
বিষ্ণুপ্রিয়ার নয় সে তাই
রাই ফির হের কথা।

বিষ্ণুপ্রিয়া সখী কাঞ্চনার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর বোলছেন কই সখী তিনি তো আসছেন না, আর যে আমি সহ্য কোরতে পারছি না। আমি তো জেনেছি তিনি কে! বাহিরে গৌররূপ ভিতরে যে শ্যামরূপ। আমরা তো মিলে গেছি মিশে গেছি তবে তিনি কই। প্রভু আমি যে সবই তোমাতে সমর্পণ কোরে দাসী হোলাম।

একালে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।

কান্না, কান্না আর কান্না! জন্ম থেকে মৃত্যু। মৃত্যু থেকে মহামৃত্যু। কান্না ছাড়া গতি কোথায় জীবের—কাঁদতে না পারলে তো দেবতা বাঁধা পড়বে না।

সারা নবদ্বীপের লোক জানলো বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের ঘর কোরতে চলেছে। আনন্দের সাগরে ভাসছে নদীয়া। এমন মিলন আর কি হোয়েছে এর আগে কি কখনও হোয়েছে? এ যে হরগৌরীর মিলন! এ মিলনের খবর সবাই জানলেও জানলো না শুধু একজন। যার বিয়ে সেই জানলো না।

এ কথা শুনলেন সনাতন মিশ্র, শুনলেন মহামায়া দেবী।

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোল। শুনলো বিষ্ণুপ্রিয়া, মালা গাঁথতে গাঁথতে হাত থেকে ফুল পড়ে গেলো।

এত সুখ কি কপালে সয়? আবার সেই চোখের জল।

রাধার নয়নে ধারা
কৃষ্ণ বিরহে মরি মরি

আত্মহারা বিষ্ণুপ্রিয়া! প্রাণবল্লভ তবে আসবেন না। তার এ ভাঙাকুঞ্জে তাঁর পায়ের ধূলো পড়বে না। এ ভাবে জীবন্মৃত হোয়ে সে থাকবে আর কতকাল।

পিরীতি বসেতে ঢালি তনুমন
দিয়েছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন আন নাহি চায়।

কাঁদছেন সনাতন মিশ্র। সমস্ত দেহমন তার যেতস পত্রের মত কাঁপছে! বুকের পাঁজরা ভেঙে যাচ্ছে। মহামায়া দেবী নির্বাক হোয়ে গেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে কাঞ্চনা আর অমিতা।

সবার অড়ালে নিমাই বসে বসে হাসছেন।

আমাকে পেতে হোলে অত সহজে পাওয়া যাবে না। আমাকে জানতে হোলে চিনতে হোলে আগে আমাতে আশ্রয় নিতে হ'বে। যুগে যুগে আমার আসা আর যাওয়া শুধু তোমাদের জন্যই, বার বার ডাকছি আর বার বার সেই একই মায়ায় তোমরা আবদ্ধ হোচ্ছ। জীবনভোর তোমাদের এই দুর্গতি—তাই আমাকে বার বার দেহধারণ

কোরতে হোচ্ছে আর কাঁদতে হোচ্ছে। আমি কাঁদি শুধু তোমাদের জন্য আর তোমরা কাঁদছো পুত্র কন্যার জন্য, সংসারের সুখ তোমরা বুঝেও বুঝছো না। পরিণতি সেই মহাকালের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আমি যে ডাকছি, কই আমার ডাক তো তোমাদের কানে যাচ্ছে না।

বিলাপ কোরছেন সনাতন মিশ্র—

নানা দ্রব্য কৈনু আমি নানা অলংকার
কাহারে বা দোষ দিব করম আমার।
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি
অকারণে আদর ছাড়িলাম গৌরহরি।

সনাতনের কান্না যেন আর থামে না—

ফুৎকার করিয়া কান্দে বোলে হরি হরি
তোমারে না পাইলে বিশ্বম্ভর আমি মরি।

কাঁদো প্রাণ ভরে কাঁদো! কাঁদতে কাঁদতেই তাঁকে পাবে। কাঁদতে না পারলে কি তিনি আসেন? কেঁদে কেঁদেই তাঁকে জয় কোরতে হ'বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া একাগ্রমনে গৃহদেবতার সামনে বসে বসে গোপনে তার কাঙালের ঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদন কোরছেন। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও! আমি তোমাকে ছাড়বো না। যে বাঁধনে একবার বাধা পড়ে গেছি সে বাঁধন ছিন্ন করে এমন শক্তি কোথায়। আমি তোমার গৌরদাসী, জীবনে জীবনে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে আমি যে তোমার দেহে বিলীন হোয়ে গিয়েছি। তোমাকে ছাড়া তো আমার গতি নেই।

এমন সময় বিধুমুখী এসে বোললে, ওরে প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া উঠে আয়! নিমাই পাঠিয়েছে খবর, বোলেছে তাঁর মা যা কোরবেন তাতেই তার মত। আনন্দের সংবাদ চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে।

ছুটে আসে কাঞ্চনা অমিতা।

বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ এই দুইজন সেচ্ছায় বিয়ের সমস্ত খরচ বহন কোরবেন।

নিমাইয়ের অভিষেক সুরু হোয়েছে। কাঞ্চনা অমিতা আরও যত নারীরা নিমাইকে স্নান করাচ্ছে। বার বার তারা সবাই এই অপরূপের দিকে চেয়ে আছে। কি দেখছে তারা! এ রূপ কি দেখে সাধ মেটে। যতই দেখা যায় ততই দেখার তৃষ্ণা বেড়ে যায়। তুমি আমাদের ডুবিয়ে রাখো, ভুলিয়ে রাখো। আর কিছু চাইনে।

তোমার রূপে মন মজেছে
নয়ন ভরে তোমায় দেখে।
তবুও দেখার সাধ মেটেনা
পলক ভোলে আমার আঁখি।

আকাশের চাঁদ নক্ষত্র সব যেন পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছে। বনের পাখী নীড়ে বসে কিচির মিচির কোরছে। জোনাকীরা দলবেঁধে রাস্তার ধারে পাতার ওপর বসে আছে। এ রাত প্রেমময়। এ রাত মধুময়। এ লগ্ন বৃথা গেলে চলবে না। হরগৌরীর মিলন দেখতে হবে।

সনাতন মিশ্রের দুয়ারে এসে নিমাই দাঁড়ালো।

ছুটে এলেন সনাতন। চমকে গেলেন মহামায়া দেবী। সনাতন মিশ্রর বাকশক্তি রহিত। এ কি দেখছেন! এ কে নিমাই না আর কেউ? মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ কোরলেন। ভালো কোরে চেয়ে দেখলেন তিনি। অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হোয়েছে, এই দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ তো তাঁর আরাধ্য, যিনি সারা জীবন ধরে ডাকছেন, যার জন্য কাঁদছেন, যার জন্য তাঁর সাধন ভজন। সে বুঝি তাঁরই আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে একেবারে তাঁর হৃদয় দুয়ারে এসে উপস্থিত।

সনাতনের চোখে জল এলো। নীচু হোয়ে প্রণাম কোরতে যাবেন এমন সময় গৌরাঙ্গ তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। তিনি তো সব বুঝতে পেরেছেন। সনাতন মিশ্র নিমাইকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেজেছে গৌরপ্রিয়া! লগ্ন এসেছে মহামিলনের। সারা মুখে তার আনন্দের আলপনা। দু'চোখে নেমেছে আনন্দের অশ্রু। আজন্ম সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ হবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ। তপস্যায়

সন্তুষ্ট হোয়েছেন তপোনাথ তাই আজ নিজে হাতে পরিয়ে দেবেন বরমাল্য।

আমার সাধন হল সারা
আমার ভজন হল সারা।
গৌরাঙ্গের কান্তা আমি
কান্ত আমার গোরা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মন ভালো লাগে না। নিমাই সারাদিন ছাত্রদের নিয়ে টোলে থাকেন। শুধু দুটো খেতে আসেন আবার চলে যান। বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলার সময় পায় না। শচীদেবীর সংসারে আসার পর তার কাজেরও অন্ত নেই! পূজোর ফুল তোলা, দেবমন্দির নিকানো, নিমাইয়ের জন্য জল, খড়ম সব ঠিক কোরে রাখা। কোন ত্রুটি নেই, কোন ভুল নেই।

শচীদেবী তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখেন।

মাঝে মাঝে নিমাই পড়াতে পড়াতে চলে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বলেন, ভালো লাগে না, তোমাকে তাই দেখতে আসি।

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ তুলে তাকায় আর বলে—তোমার আসতে বড় দেরী হয়। আমি যে পথ চেয়ে বসে থাকি।

আমার তাতেই আনন্দ!

আমি কাঁদলে তাতেও তোমার আনন্দ!

হ্যাঁ প্রিয়া তাতেও আমার আনন্দ, তোমার কান্না দেখে তো জগৎ কাঁদবে, জীব কাঁদবে। তুমি না কাঁদলে যে জীব কাঁদবে না প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। পরে বলে—তোমার ও দুটি চরণ সেবা থেকে যেন আমি বঞ্চিতা না হই। আমার দেহও তুমি প্রাণও তুমি। তোমাকে ভালবাসবো এই আমার সাধ। তোমার কাছে এইটুকু আমার ভিক্ষা। তুমি আমাকে তোমার জন্য ভাবতে শেখাও, আমাকে তোমার জন্য স্মরণ মনন করবার শক্তি দাও

তোমাকে যাতে না ভুলি এই জ্ঞান আমাকে দাও, তোমাকে যাতে নিবিড় কোরে আরও কাছে পাই এই ভক্তি আমাকে ভিক্ষা দাও।

নিমাই হাসেন আর বলেন—তাই হ'বে !

সর্বজীব দয়া প্রতি দর্শন আমার
কৃষ্ণের দৃঢ়ভক্তি হউক তোমার সবার।

টোলের দিকে পা বাড়ান নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাঁর যাওয়ার পথে।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শচীদেবী বেশ সুখের সংসারই পেতেছিলেন কিন্তু দুঃখের মেঘ দেখা দিল।

নিমাই যাবেন গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিতে। মন তাঁর গয়ায় যাবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে। একদিন শচীদেবীকে বোললেন—মা তুমি আমাকে অনুমতি দাও আমি গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দান কোরে আসি।

শচীমাতা বোলে উঠলেন, এ কি বাবা এসব তুই কি বোলছিস আমার ঘর শূন্য কোরে চলে যাবি।

মা, অনিত্য এ সংসার, এই আছে এই নেই, যদি আর সময় না মেলে, তাছাড়া আমি সন্তান হোয়ে এ কাজটা যদি না কোরতে পারি তাহালে কি বাবা আমায় ক্ষমা কোরবেন।

শচীদেবী বিপদে পড়লেন। এ কাজে বাধা তিনি দিতে পারলেন না। তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। আর বোললেন—

গয়া যদি যাবে বাপ শুনরে নিমাই
মোর নামে এক পিণ্ড দিসরে তথাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে যেন বাজ পড়ে। আবার বিরহ। আবার দুঃখ। এই তো সংসার, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো। এই নিয়মেই তো চলছে জগৎ।

নিমাই বোললেন, তুমি আমাকে বাধা দিও না প্রিয়া, তোমাকে

ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে কি কষ্টকর তা তুমি জানো। কিন্তু পিতার আত্মার মুক্তি এ তো সব সন্তানের কাম্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া জবাব দিলেন আনত মুখে, মায়ের অনুমতি যখন পেয়েছো তখন আর বাধা কোথায়। মার ওপর আর কে আছে।

শচীদেবী নিমাইকে একা কি কোরে ছেড়ে দেবেন। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরকে সাথে দিলেন নিমাইয়ের। কথা রইল তিনিই নিমাইকে সাথে কোরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন।

নিমাই যাত্রা কোরলেন গয়াধামে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখের জল রাখতে পারেন না।

সখী কাঞ্চনা বলে—তোর এ কি ভাব! তুই তাঁর সহধর্মিণী, তোর না তিনি ইষ্টদেবতা। চোখের জল ফেলে তাঁর কোন অকল্যাণ ডেকে আনিসনে সই! বিষ্ণুপ্রিয়া শান্ত হন।

পথের ক্লান্তিতে নিমাই গয়াধামে এসে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হোয়ে পড়লেন। চন্দ্রশেখর আর আর সংগীরা চিন্তিত হোয়ে পড়লেন।

নিমাই বোললেন, এত চিন্তার কি আছে। এখানে যেসব ভক্ত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁদের পদরজ এনে দাও, আমি তাতেই ভালো হোয়ে যাবো।

এ কি কোরে সম্ভব! ভক্ত ব্রাহ্মণের পদরজ তারা নিমাইকে কি কোরে এনে দেবেন!

নিমাই তবুও বোললেন —ওঁরা ভগবানের আশ্রিত, ওঁরা যে তাঁর দাস। সব কিছুই যারা ভগবানের চরণে দিয়ে বসে আছেন তাদের পদরজ না হোলে আমার জ্বর ছাড়বে না।

উপায় না দেখে সবাই গিয়ে তাই নিয়ে এসে নিমাইকে খাইয়ে দিলে নিমাই ধীরে ধীরে সুস্থ হোয়ে ওঠেন।

নিমাই সবাইকে ডেকে বলেন, দেখলে তো পদরজের গুণ।

চণ্ডাল, চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে

গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিলেন নিমাই।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ঐ চরণ চিহ্নের দিকে। প্রাণ ভরে দর্শন কোরছেন নিমাই বিষ্ণুর চরণচিহ্ন। এই তো সেই চরণ যে চরণের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ কাঁদছে। নিমাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছেন। অসাধারণ ভাবাবেশ, তন্ময় নিমাই, অবাক বিস্ময় তার চোখে। আর বুঝি দাঁড়াতে পারেন না নিমাই। সারা দেহ তাঁর কাঁপছে। পরমভক্ত ঈশ্বরপুরী সব লক্ষ্য কোরছেন।

নিমাই তো সাধারণ মানুষ নয়। তাঁর সারা দেহে সাত্বিক ভাব। ভক্ত না হোলে ভক্ত চেনে কে।

এগিয়ে এলেন ঈশ্বরপুরী। জড়িয়ে ধরলেন নিমাইকে।

নিমাইয়ের চোখে জলের ধারা। কাতরভাবে বোললেন, প্রভু আমাকে কৃষ্ণ প্রেমে দীক্ষিত কোরে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি দিন। আমায় বোলে দিন কেমন কোরে আমি তাঁর সন্ধান পাবো।

দীক্ষা দিলেন ঈশ্বরপুরী নিমাইকে, এ মন্ত্র দশাক্ষরী মহামন্ত্র।

পাগলের মত হোলেন নিমাই। কৃষ্ণ ভাবনাই হোল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। নিমাই সবাইকে বোললেন, তোমরা ফিরে যাও। আমি যাবো কৃষ্ণসন্দর্শনে।

চন্দ্রশেখর বোঝালেন, এ কি নিমাই এ তোমার কেমন ধারা ভাবাবেশ। তোমাকে ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে আমি কোন মুখে দাঁড়াবো তাঁর সামনে। তুমি জ্ঞানবান পণ্ডিত মাকে ব্যথা দিয়ে কোন ধর্ম হয় না! মাকে কাঁদিয়ে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। আর তাছাড়া তুমি আমার সাথে না গেলে তিনি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ কোরবেন।

নিমাই মেনে নেন চন্দ্রশেখরের কথা। নবদ্বীপের পথে পা বাড়ান নিমাই।

গয়াধাম থেকে ফেরার পর নিমাই যেন আর এক নিমাই হোয়ে দেখা দেন। দিনরাত শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে কাঁদছেন। কখনও জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ বোলে নৃত্য কোরছেন।

শচীদেবী বোলে ওঠেন—বাবা তোমার মনে কিসের দুঃখ, তোমার কান্না দেখে তো আমি আর স্থির থাকতে পারিনে। বড় অভাগিনী আমি তোমাকে পেয়ে সবই ভুলেছিলাম। শোক তাপদগ্ধ এ দেহ তোমার মুখের দিকে চেয়ে সব ভুল হোয়ে যেতো। তুমি কাঁদলে কিসের আমার সংসার।

নিমাই আদ্রচোখে বলেন মাকে—মা গয়া থেকে এসে আমার আর কিছুই যে ভালো লাগছে না। আমি পেয়েও হারালাম মা। কৃষ্ণ আমার প্রাণ, কৃষ্ণ আমার জীবন, পিতা মাতা গুরু সবই তিনি। সেই কৃষ্ণ আমাকে দেখা দিলেন গয়াধামে। আহা কি রূপ, নব জলধর শ্যামের হাতে বাঁশী। কোথায় যে লুকালো মা আর দেখতে পেলাম না! তুমি আমায় এই আশীর্বাদ করো আমার যেন কৃষ্ণদরশন হয়, কৃষ্ণপরশন হয়।

শচীমাতা তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বোললেন, বাপ নিমাই; কৃষ্ণ তো সর্বত্রই আছেন। ঘরে বসেই তাঁর দেখা তুমি পাবে।

শচীদেবী অত্যন্ত ভীতা হোলেন।

স্বামী নেই, বিশ্বরূপ গেলো বনবাসে। একমাত্র জীবন এখন নিমাই, সে যদি সংসারের প্রতি উদাসীন হয় তাহালে তাঁর জীবনধারণের আর কোন প্রয়োজন নেই।

নিমাই শুধু চিন্তার সাগরে ডুবছেন আর ভাসছেন।

সংসার বন্ধন বড় বন্ধন, এ জগতে কৃষ্ণপ্রেমই বড় প্রেম। কৃষ্ণ প্রেমের বন্যায় পিতামাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম সব ভেসে যায়। সব ছেড়ে কৃষ্ণ না ভজলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। জগত সংসার আত্মীয় প্রিয়জন। ধর্ম-কর্ম যাগ-যজ্ঞ সব কিছু ত্যাগ কোরেই তো কৃষ্ণভজন। এ সংসারে কে আমি, কে তুমি। মায়াপাশে আবদ্ধ জীব। সব ভুলে গেলে, তুমি না কৃষ্ণের দাস, এখন হোলে সংসারের দাস। জন্মলগ্নে কেঁদেছিলে কেন মনে আছে। বোলেছিলে কেঁদে, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে, তোমাকে ভুলবো এই দুঃখেই তো আমার এ কান্না।

নিমাইয়ের এ কি হোল! কৃষ্ণময় হোয়ে গেলো নিমাই। সমস্ত সত্তায় তাঁর কৃষ্ণ, ধ্যানে কৃষ্ণ, জ্ঞানে কৃষ্ণ, প্রাণে কৃষ্ণ, ঐ যে নীল আকাশ ওখানেও তিনি, ঐ যে পাখীর গান ওতেও তো কৃষ্ণের কণ্ঠ।

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে।

এলেন সনাতন মিশ্র। এসে দেখলেন আর এক নিমাইকে, এ নিমাই কৃষ্ণময় নিমাই। এ নিমাই পতিতপাবন ক্ষমাসুন্দর নিমাই। কৃষ্ণ নামে যাঁর মূর্চ্ছা, কৃষ্ণ নামে যার চেতনা, সে নিমাই আর আগেকার নিমাই হাজার যোজন তফাৎ।

নিমাই ভাবে গদগদ হোয়ে টোলে যান। ছাত্ররাও তাঁর এ আবেশ দেখে চিন্তিত হয়।

নিমাই সবায়ের দিকে চেয়ে বোলে ওঠেন—আজ থেকে আমি তোমাদের পাঠ বন্ধ কোরলাম। এ কাজ আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তোমরা শুধু এই পাঠই বলো, ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। পুঁথিপত্র বন্ধ করো, এক কৃষ্ণ নামই তোমাদের পাঠ হোক। ভালো কোরে চেয়ে দেখো অক্ষরে অক্ষরে স্বয়ং কৃষ্ণের উপস্থিতি। এতদিন যা তোমাদের শিখিয়েছি সে শিক্ষা তোমাদের জ্ঞান আহরণে হয়তো সাহায্য কোরবে কিন্তু কৃষ্ণ সন্দেশ দেবে না। কৃষ্ণ নামই হোচ্ছে সব শাস্ত্রের সার, যত ব্যাখ্যা টিকা টিপ্পনী সবই তো কৃষ্ণময়। তোমরা এই বাল্যবয়সেই কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা করো, দীক্ষা নাও কৃষ্ণনামে, প্রেমভিক্ষা চাও কৃষ্ণনামে। ভক্ত প্রহ্লাদ ধ্রুব যদি তাঁর দর্শন পেয়ে থাকে তোমরাও পাবে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে ঘুম নেই। নিমাইয়ের ভাবান্তর দেখে তাঁর বুক কাঁপছে। সুখের স্বপ্নে সে বিভোর ছিল, এমন ভাগ্যবতী কে আছে। কিন্তু! সে সুখের ঘর বুঝি ভেঙে যায়। সুখ বুঝি কারও নেই এ দুনিয়ায়, ভিক্ষা কোরে সুখ তো মেলে না। সুখ মেলে, সুখের জন্য যার কাছে আর্জি জানাচ্ছি তাঁকে পেলে।

তাঁকে পাওয়া যাবে কি কোরে ? খুঁজতে হবে মনের গহনে—বন ছেড়ে মনে এসে যে ঘর বেঁধেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমাতা নিজ হাতে তার চুল বেঁধে দেন। সাজিয়ে দেন নিজের মনের মত কোরে।

এমন সময় নিমাই আসেন। সেই একই ভাববিহ্বল মূর্তি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন—আমার কথা শোন !

নিমাই বলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে চেয়ে। অন্য কোন কিছু শোনার আমার সাধ নেই, কৃষ্ণনাম শোনাও।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে জল ! আমি সামান্যা বালিকা আমি কৃষ্ণপ্রেম আর কৃষ্ণবিরহ তত্ত্ব তোমাকে কি কোরে শোনাব, আমি শুধু তোমাকে জানি, তুমি আমার কৃষ্ণ আর আমি অন্য কৃষ্ণকে চিনিনা !

নিমাই বহুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া আমি জানি তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, এবং তুমি জানো তার সন্ধান ! বলো আমি কি কোরে তাঁকে পাবো।

'ওগো আমি তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু জানি না। তোমার কৃপাই আমার কৃষ্ণকৃপা, তোমার প্রেম আমার কৃষ্ণপ্রেম, তোমার সেবাই আমার কৃষ্ণসেবা, তুমি চাও কৃষ্ণ দরশন আর আমি চাই তোমার দরশন। তুমি পাগল হোয়েছো কৃষ্ণপ্রেম সাগরে ডোবার জন্য আর আমি পাগলিনী হয়েছি তোমার প্রেম সাগরে ডুবে যেতে। তোমার কৃষ্ণপ্রেম আর আমার পতিপ্রেম। এতো একই, এতো অভিন্ন।

নিমাই বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তার চরণ ধরে মিনতি করেন, প্রভু ! আমি জানি তুমি কে ! কেন তোমার আবির্ভাব, পদ্মপাতার জলের মত তুমি এই সংসারে আছো। তুমি না চেনালে কে তোমাকে জানতে পারে। আমি কে তাও তুমি জানো আর তুমি কে তাও আমি জানি। তুমি আমি অভিন্ন নয়, লোককে শিক্ষা দেবার জন্য এবার তোমার আবির্ভাব। বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিতেই তোমার জন্মগ্রহণ।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন—কৃষ্ণপ্রেমের সারতত্ত্ব তুমিই বুঝেছো প্রিয়া। শক্তি মানে অভেদতত্ত্ব! কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সবই একাধারে। বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার কৃপা ছাড়া তো আমার কৃষ্ণ দরশন হবে না। তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে যাই। পতিসেবা তুমি নাই বা কোরলে, পতির মাতার সেবা কোরবার ভার তোমার ওপর থাকলো।

বিষ্ণুপ্রিয়া তার বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে ধীরে ধীরে বোললেন—তুমি আমাকে লুকিও না, তোমার মনের কি সাধ আমাকে বলো। আমি আর সহ্য কোরতে পারছি না!

সহ্য তোমাকে কোরতেই হবে প্রিয়ে। কলির জীবের দুর্দশা দেখে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হোয়েছে। শোকে তাপে জর্জরিত জীব রোগে মৃতপ্রায়, তাদের চোখের জলে বসুমতা কাতর। তাদের রোগের মহৌষধ আমি প্রচার করব ঘরে ঘরে। সে মহৌষধ কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি। আমি নদীয়ার দ্বারে দ্বারে যাবো এই প্রেম ভিক্ষা কোরতে, এই অমৃতক্ষরা নামই কলির জীবের সর্বপাপ দূর কোরবে, শোকে তাপে শান্তি দেবে। এ নামই হ'বে জীবের একমাত্র মহামন্ত্র। আমার মনের কথা জানবার জন্য তোমার ব্যাকুলতা আমি বুঝতে পেরেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া উন্মনা। ব্যথায় তার সমস্ত দেহপ্রাণ জর্জরিত। বুকের ভিতর এক মহা আড়োলন। কপালের তিলক চন্দন সব ভেসে যায় নয়নের জলে।

নিমাই মুখটা নীচু কোরে বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া! তুমি যখন জেনেছো, কে তুমি, কে আমি তখন আর লুকাবো না। আমি সন্ন্যাসী হবো! মাথা মুড়িয়ে এক গেরুয়া সম্বল কোরে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরবো কৃষ্ণপ্রেমের ভিখারী হোয়ে। কেউ বাদ যাবে না, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পাপীতাপী বৈশ্য শূদ্র, দুর্জন সবাইকে আমি কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কোরব। আমি জগতকে জানাবো যে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদনই হোচ্ছে জীবের পাপক্ষয়ের একমাত্র সোপান। বলো প্রিয়ে. এ কাজে তমি আমার

সহায় হ'বে। বলো জীবের ভক্তিধন লাভের জন্য তুমি আমাকে হাত ধরে এগিয়ে দেবে।

কাঁপছে বিষ্ণুপ্রিয়া, কাঁদছে বিষ্ণুপ্রিয়া, মনের গহনে সাগরের জলোচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কিনারে কিনারে তরংগাঘাত।

সন্ন্যাস নেবেন প্রাণবল্লভ নিমাই! জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোরবেন বঞ্চিতা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝি মুর্চ্ছিতা হোয়ে পড়েন।

নিমাই বালকের মত কেঁদে ওঠেন। চোখের জল যেন আর বাঁধা মানতে চায় না। বিষ্ণুপ্রিয়ার কম্পিত দেহ দুহাত দিয়ে ধরে তুলে বলেন, মায়াময় এ সংসার—মায়াজালে সর্বজীব আবদ্ধ। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, উদাসী সংসারী, অন্ধ, খঞ্জ সবাই মোহজালে বদ্ধ। মায়াময় ভগবান, মায়িকরূপে সর্বজীবে লীলা কোরছেন। কে চেনে কে জানে তাঁর লীলা। বিচিত্র লীলা। পুতুলরূপী স্ত্রী পুত্র কন্যা সাজিয়ে দিয়েছেন এ সংসারে। সেই মায়ার পুতুল নিয়েই চলছে জীবের খেলা। যা ভেঙে যাবে, যা থাকবে না, তাই জীব আঁকড়ে ধরে আছে। সেই চিন্তাতেই তো দিনরাত শেষ হোচ্ছে। পারের কড়ি কি যোগাড় কোরল? এদিকে বেলা তো শেষ হোয়ে এলো, যৌবনের বেলা, জীবনের বেলা। সেই ভবনদীর মাঝির কি কেউ খোঁজ কোরছে? কেউ কোরছে না। আমি জীবকে সেই চিরনিত্য বস্তুর সন্ধান দেবো।

বেলা শেষ। নবদ্বীপের পথে পথে অন্ধকার নামে।

কৃষ্ণ কালো, আঁধার কালো, সেই কালোর মাঝে নিমাই যেন মিশে গেলেন। কোথায় বুঝি বাঁশী বাজে। পথে পথে যেন নূপুরের ধ্বনি ভেসে চলে। কৃপাকঠোর তবে কি এই পথে হেঁটে গেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘর থেকে বের হন। সাঁঝের প্রদীপ জ্বালতে হবে। কোথায় একটা পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো। ও কি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বোলছে, ডাক ডাক ওরে সবাই ডাক। হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়ে ডাক।

নবদ্বীপের লীলা বুঝি এবার শেষ। নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা—

পথ চলেন টলতে টলতে। যেন কোন জ্ঞান নেই। যাকে দেখেন তাকে বলেন, কই কৃষ্ণকে তো আমি পেলাম না। ওগো তোমরা আমার কৃষ্ণকে কেউ দেখেছো!

বৃক্ষলতাকে জড়িয়ে ধরে বেহুশ হোয়ে ক্রন্দন করেন। ওরে দিনরাত এখানে একভাবে দাঁড়িয়ে আছিস, তোরাও কি কেউ দেখিস নি তাঁকে?

শচীমাতা বেদনাবিহ্বলা, বিষ্ণুপ্রিয়া যেন শরবিদ্ধা হরিণী।

নিমাইয়ের দেহে যেন প্রাণস্পন্দন নেই।

সবাই কীর্তন সুরু কোরে দেয়:

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসুদন।

কাটোয়ার কেশব ভারতী এলেন এমনি সময়ে নিমাইয়ের বাড়ীতে, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের এই মধুরভাব দেখছেন আর ভাবছেন কে ইনি! না, না এতো ভক্ত নয়, এ যে ভক্তের ভগবান!

নিমাই কীর্তন শুনে চোখ খোলেন।

চারিদিকে তাকিয়ে বলেন, কই আমার কৃষ্ণ কই? তাঁকে তোমরা কেউ এনে দিতে পারলে না।

কেশব ভারতীকে দেখে যত্ন কোরে বসালেন তাঁকে। বোললেন, আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি কৃষ্ণের দেখা পাই। কেশব ভারতী একটু হেসে চলে গেলেন। মনে হোল তাঁর অন্তর পূর্ণ হোয়েছে।

নিত্যানন্দ এগিয়ে এলেন নিমাইয়ের পাশে।

নিমাই বোললেন—ভাই নিতাই বড় আশা ছিল তোমাদের নিয়ে আনন্দ কোরব। কিন্তু কেউ তা চায় না। আমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না নিতাই। আমি এই তুচ্ছ সংসারের সুখ ত্যাগ না কোরলে কলির জীবের সুখ হবে না।

তবে তুমি কি সন্ন্যাস নেবে?

হ্যাঁ, ভাই শ্রীকৃষ্ণের তাই ইচ্ছা! কৃষ্ণপ্রেমের আগুনে আমার এ দেহ জ্বলে গেছে, আমি আর নেই আমাতে। বড় সাধ আমার সবার

কান্না দেখবো : সংসারী আমি কিন্তু সংসার আমাকে চায় না। এ সংসারে আমার দ্বারা আর কোন উপকার হবে না। মা আমার শান্তি পান না, বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে সুখ নেই। সবাই আমার বাহিরঙ্গই দেখলো। অন্তরের সন্ধান তো কেউ নিল না। আমি কেঁদে কেঁদে কৃষ্ণকে ডেকে বেড়াবো। আমার চোখের জল দেখে মা কাঁদবে। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদবে, সংগে সংগে তোমাদের চোখও হবে অশ্রুসিক্ত। আমাদের সবার চোখে জল দেখেই তো জীব কাঁদবে। নিজে না কাঁদলে পরকে কাঁদানো যায় না। সবাইকে কৃষ্ণের জন্য কাঁদতে হ'বে! এত চোখের জলে তিনি কি আর নিশ্চল থাকতে পারবেন। তাঁকেও আসতে হ'বে এই চোখের জলের পথ বেয়ে। কলিতে নাম আর সংকীর্তন এই হোল কৃষ্ণধন মিলাবার দুই মন্ত্র। তোমরা সবাই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হও।

নিত্যানন্দর বাকরুদ্ধ হোয়ে গেছে।

সবাই যেন মাটির পুতুলের মত নিমাইর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

নিমাই যে সংসার ত্যাগ কোরবে, সে সংবাদ শচীদেবীর কানে যেতে দেরী হোল না। শচীদেবী যেন আছড়ে পড়লেন। তাঁর নয়নের মণি গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাস হ'বে। এ সংবাদ কোন মা সহ্য কোরতে পারে?

নিমাইকে ডেকে পাঠালেন শচীমাতা।

মা ডেকেছো কেন?

শচীদেবী কি বোলবেন, দেহের সমস্ত তন্ত্রীতে যে সুর বাঁধা সে সুর হারিয়ে গেছে। কোন কথাই তাঁর মনে আসছে না। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে বোললেন, এসব কি শুনছি বাবা!

হ্যাঁ মা ঠিকই শুনেছো! আমাকে তুমি ভুলে যাও, মা কত লোকের তো নিষ্কর্মা ছেলে হয় আমিও মা তোমার তেমনি ধারা এক ছেলে। তোমার সেবা কোরব সে ভাগ্য আমার আর হোল না। তোমার ঋণ শোধ কোরব তেমন সঙ্গতিও আমার নেই।

মা তোমার নিমাই হারিয়ে গেছে, ঘরে থাকার আর আমার উপায় নেই, আমার মন যে আর ঘরে থাকতে চায় না। দিনরাত কৃষ্ণ আমায় ডাকছে, তাঁর বাঁশীর ডাক আমার কানে আসছে। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও মা, কৃষ্ণবিরহে মন আমার বড় উচাটন হোয়েছে। আমার ধ্যান জ্ঞান সব কৃষ্ণে মিশে গেছে। কৃষ্ণকে আমার চাই মা। এ জীবনে আব কি হ'বে, এ দেহের আর কি দাম আছে। যে দেহ মন কৃষ্ণসেবায় লাগবে না সে দেহ আমি ত্যাগ কোরব যদি তাঁকে না খুঁজে পাই।

শচীমাতা আর কাঁদতে পারছেন না! কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে বসে পড়লেন নিমাইয়ের সামনে।

নিমাই মায়ের হাত ধরে তুলে মায়ের বুকে মুখ রেখে বোললেন, তুমি কাঁদছো, আমিও কাঁদছি, এ জনমে শুধু কেঁদেই আমাকে যেতে হ'বে। জীব না কাঁদলে আমি কৃষ্ণকে পাবো না মা! আমার যাতে মংগল হয় তা কি তুমি চাও না। জীবের মংগলের জন্য আমার এ যজ্ঞ, তুমি আমাকে সাহায্য করো! মা হোয়ে সন্তানের কল্যাণ কামনা সব মা-ই কোরে থাকে। তবে আমার যাতে কল্যাণ হয় তা তুমি কেন চাইবে না। দাও মা আমাকে অনুমতি দাও। দোরের বাইরে যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তোমার অনুমতি পেলেই আমি ভিতরে ডেকে আনতে পারি।

কাঁদছেন নিমাই। কাঁদছেন শচীমাতা। ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়াও কাঁদছে। ভক্তরাও কাঁদছে।

কৃষ্ণ এবার আসবেন। এত আকুলতার মাঝে, এত ব্যাকুলতার মাঝে তিনি কি না এসে থাকতে পারেন? তিনি আসছেন ঐ চোখের জলের পথ বেয়ে। ঐ তো নূপুরের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

তুমি এসো প্রভু! তোমার আসার আশায় যে দিন শেষ হোল।

নিমাইয়ের আজ এ কি হোল! মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। সারা চোখে মুখে এক অপরূপ প্রসন্নতা।

আকাশে উঠেছে অষ্টমীর চাঁদ, নক্ষত্র হাসছে মিষ্টি হাসি। কোথায় একটা পাখী মিষ্টিস্বরে যেন ডাকছে তার সংগীকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া তার শোবার ঘরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অষ্টমীর জোছনাভরা রাতে তাঁর চোখে মুখে নেমেছে যেম কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা।

বাতায়নের পথ দিয়ে রাতের জোছনা এসে লুটিয়ে পড়েছে বিছানার ওপর। নিমাই কাছে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকের ভিতর টেনে নিলেন। কপালে একে দিলেন একটা সুমিষ্ট চুম্বন। হঠাৎ বোললেন, তোমাকে আজ আমি সাজাবো নিজের হাতে!

বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক হোয়ে যান। বলেন, এ সাধ তোমার কেন হোল, আমাকে সাজাবে এমন ভাগ্য কি আমার হ'বে।

না প্রিয়ে বড় সাধ হোয়েছে আমার!

বেশ!

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার কপালে দিলেন চন্দন টিপ, কবরী বেঁধে তাতে গুঁজে দিলেন বনফুল, রাঙা ঠোঁটে দিলেন কুমকুমের প্রলেপ। সিঁথিতে দিলেন সিন্দুর, গলায় দিলেন বনফুলের মালা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বোললেন, হোলত এবার তোমাকেও আমি সাজাই মনের মত কোরে! এ যে আমার আজন্মের সাধ, তোমকে সাজাবো, তোমার সেবা কোরব, তোমার ভিতর আমি লীন হোয়ে যাবো, আর কি আমার চাই কিন্তু....

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন নিমাই!

বিছানার ওপর বসে আছেন নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া ফুল ছিটিয়ে দিলেন তাঁর পায়। নিজের গলার মালা দিলেন তাঁর গলায়।

নিমাই তাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে! চুম্বনে চুম্বনে সারা মুখ ভরিয়ে দিলেন। এত আদর বিষ্ণুপ্রিয়া তো তাঁর কাছে এর আগে কোনদিন পাননি!

বিষ্ণুপ্রিয়া শংকিতা হোলেন! কে জানে এই সোহাগ ভরা রাতই হয়তো তার জীবনে দেখা দেবে কালরাত হোয়ে।

কাঁদছে বিষ্ণুপ্রিয়া তার চোখের জলে নিমাইয়ের বুক ভেসে যাচ্ছে।

তুমি কাঁদছো কেন প্রিয়া ?

ওগো আমি যদি তোমার বন্ধন হোয়ে থাকি তাহালে তুমি আমাকে ত্যাগ করো। সংসার ত্যাগ তোমাকে কোরতে হবে না।

হ্যাঁ প্রিয়া কৃষ্ণ ছাড়া আমার তো গতি নেই।

চোখের জলে বুক ভাসছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। বলেন, যতবার আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোরেছি তোমাকেই দেখেছি। আমি কৃষ্ণ চাই না, তোমাকে চাই—এই সাধনা নিয়েই জন্মেছি, এই সাধনা নিয়েই মরবো।

প্রিয়া অত উতলা হোয়না! তুমিও আমার মত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো, তোমার সব ব্যথা তিনি উপশম কোরবেন। কৃষ্ণ ভজনই তোমার সার হোক। তোমার ডাকে তিনি সাড়া নিশ্চয়ই দেবেন। স্বচক্ষে সেইরূপ দর্শন কোরে হৃদয়ের আশা পূরণ করো।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়

কত রাত তা কে জানে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে নিমাই বোললেন, জীবের কল্যাণে আমাকে সন্ন্যাস নিতেই হ'বে। মা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া চমকে উঠেন! বিছানার ওপর বসে আবার বলেন, ওগো তুমি কি বোলছ!

হ্যাঁ প্রিয়া, মায়ের কৃপা না হোলে তো আমার আশা পূর্ণ হবে না।

নিমাইয়ের দু'পায়ের ওপর মাথা রেখে বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে লাগলেন অঝোর ধারায়।

নিমাই ভাবলেন আর পথ কই। নিজরূপে দেখা না দিলে আর উপায় নেই! নিমাই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ ধারণ কোরে বোললেন, বিষ্ণুপ্রিয়া চেয়ে দেখো! কতবার বোলেছি বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি আমার পূর্ণশক্তি, হ্লাদিনীর সারভূতা পরাভক্তি স্বরূপিণী তুমি।

না, না, আমি চাইনে তোমাকে। আমার স্বামী সেই নবদ্বীপ চন্দ্র কই! কোথায় আমার সেই ভক্তজন বল্লভ গোরাচাঁদ! বিষ্ণুপ্রিয়া বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

নিমাই তার বুকে বুক মিলিয়ে শুয়ে পড়ে বোললেন, তোমার কান্নায় আমার সব আশা পূর্ণ হ'বে। তুমি কাঁদলে সব জীব কাঁদবে। তোমার চোখের জলে হবে আমার কৃষ্ণ অভিসার।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর কথা বলে না। চোখের জলে ভিজে ভিজে রাত এগিয়ে যায়।

রাত তখন কত কে জানে! নিমাই ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। সমস্ত বেশ ছেড়ে তিনি আদল দেহে মায়ের ঘরের সামনে এসে ভক্তিভরে প্রণাম কোরলেন তাঁর উদ্দেশে। পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে বোলে ওঠেন—চলি প্রিয়া!

কোলের বালিশটা তার বুকের ভিতর চেপে দিয়ে ধীরে ধীরে আলো অন্ধকারের পথে কাটোয়ার পথে পা বাড়ালেন।

'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বোলতে বোলতে নিমাই ঝাঁপ দিয়ে গংগা পার হোয়ে ওপারে গিয়ে উঠলেন। রাত্রি তখন প্রায় শেষ। বিষ্ণুপ্রিয়ার ডাকে ঘুম ভেঙে যায় শচীদেবীর।

শচীদেবী ধড়মড় কোরে উঠে বলেন, কি হোল বৌমা!

মা, মা, সর্বনাশ বুঝি হোয়েছে, উনি তো ঘরে নেই!

চীদেবী মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন নিমাই, নিমাই!

শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগলো নাই, নাই, নাই। তবে! শচীদেবী বাঁচবেন কি কোরে।

ওগো তোমরা আমার নিমাইকে দেখেছো! এই দারুণ ঠাণ্ডা রাতে কোথায় সে গেলো। তোমাদের সকলের চরণে আমি নিবেদন কোরে বোলছি, তোমরা আমার নিমাইকে এনে দাও।

এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত এলেন।

মা কি হোয়েছে!

শচীমাতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কোরতে থাকেন, আমার নিমাই চলে গেছে। ঘর আমার আঁধার হোয়ে গেলো! গংগাতীরে সবাই খুঁজে এলো, কোথাও সে নেই। চেয়ে দেখো, বৌমা আমার আঙ্গিনায় গড়াগড়ি যায়। ও যে বেঁচে আছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না।

এলেন শ্রীবাসপত্নী মালিনী, এলো ঈশান, কাঞ্চনা অমিতা। সবাই আসে, শুধু যার সন্ধান দরকার সেই আসে না।

নিত্যানন্দ আসতেই শচীমাতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বোললেন, বাপ নিতাই, কোথায় রেখে এলি আমার নিমাইকে।

নিত্যানন্দ বোললেন, তুমি চিন্তা কোরনা, যেখানেই থাক আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনবো।

কাঞ্চনা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বোঝায়, সখী তুমি কি সব ভুলে গেলে। তোমাকে উনি বোলে গেছেন মাকে দেখতে। কিন্তু এ তুমি কি কোরছ, যদি একটা কিছু হয় তাহালে উনি কি ভাববেন।

ঠিক বোলেছো তুমি, আর আমি কাঁদবো না! পতি আজ্ঞা পালন করাই আমার এখন প্রধান কর্তব্য।

দু'সপ্তাহ কেটে যায়। শচীমাতা অনশনেই একরকম দিন কাটাচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও তাই, যে ঘরে নিমাই নেই সে ঘরে আর কি আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা তারও তো আর প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণক্ষুধাই বড় ক্ষুধা। কৃষ্ণতৃষ্ণাই বড় তৃষ্ণা। কৃষ্ণ ছাড়া সব শূন্য!

ওদিকে নিমাই এসেছেন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে। মুণ্ডিত মস্তক, পরণে কৌপীন ডোর, মুখে শুধু কৃষ্ণ নাম।

নিত্যানন্দকে দেখে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বোললেন, একটা কথা আছে।

বলো!

শুনলে ব্যথা পাবে কিন্তু না বোললেও হবে না। শোন শান্তিপুরে মাকে নিয়ে এসো আর যারা আসতে চায় তারাও আসুক। শুধু এক বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া। এ আমার কঠোর আদেশ।

নিত্যানন্দ চমকে যান। এ কি কঠিন আদেশ!

নিত্যানন্দ সংবাদ বয়ে নিয়ে এলেন শচীমাতার কাছে।

শচীমাতা শুনে আনন্দে অধীর, তাঁর নিমাই এসেছে শান্তিপুরে। মায়ের কথা তাঁর মনে আছে।

ডাকলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, কাঞ্চনা আর অমিতাকে। ওরে তোরা চল নিমাই এসেছে শান্তিপুরে।

. নিত্যানন্দ ভাবছেন কি কোরে বোলবেন যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যাবার আদেশ তাঁর নেই।

শচীমাতা আনন্দে আত্মহারা হোয়ে বোললেন, বৌমা তৈরী হোয়ে নাও।

নিত্যানন্দ হাতজোড় কোরে বোললেন, বৌমাকে রেখে তুমি একাই চলো মা। নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ কোরেছেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী মুখ দর্শন নিষেধ।

শচীমাতা মুখ নীচু কোরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবছেন, পুত্রকে দেখতে মা যাবে পুত্রের কাছে, কোন্ শাস্ত্রে আছে যে পুত্রের নির্দেশ মা শুনবে। পরে বোললেন, বৌমাকে না নিয়ে আমি যাবো না।

নিত্যানন্দ মহাসংকটে পড়লেন। একদিকে প্রভুর আদেশ আর একদিকে মায়ের আদেশ। কোন্ পথে যাবেন তিনি। ভাবছেন নিত্যানন্দ, মা আমার মায়ায় আবদ্ধ তাই তিনি ঐ কথা বোলছেন। নিতাইকে তা যদি প্রভু জানাতেন তাহালে এইভাব মায়ের দূর হোত। নিত্যানন্দ মায়ের চরণে প্রণিপাত কোরে বোললেন, মা তুমি কি কিছুই জান না? কিন্তু আমি জানি মা তুমি সব জানো। নিমাই তোমার গৃহীও নয় সংসারীও নয়। তিনি যে মা সর্বাতীত ভগবান। মায়াতে আবদ্ধ হোয়ে তিনি কৃষ্ণকে বিস্মরণ হোয়েছিলেন। জীবের সংগে কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই জীববন্ধু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার গর্ভে নিমাই রূপে এসেছেন। মাগো, একবার স্থির হোয়ে ভিতরে চেয়ে দেখো কেন তোমার নিমাইয়ের জননী রূপে আবির্ভাব। তুমি কে, নিমাই বা তোমার কে আর পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া সেই বা তোমার কে?

তুমি তো নিমাইয়ের আজ্ঞা পালন কোরছ না! এ আদেশ জীবপালক সেই জগতপিতার।

শচীমাতা প্রকৃতিস্থা হোলেন। নিমাইয়ের সুখই তাঁর সুখ, তাঁর ধর্ম রক্ষা করাই মায়ের কর্তব্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনদুঃখে অত্যন্ত কাতর হোয়েছেন। এমনই ভাগ্যহীনা সে যে তাঁর প্রাণবল্লভকে সেই দেখতে পাবে না। জগতের জীবকে উদ্ধার কোরতে এসে প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকেও তিনি ছাড়লেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া চিরদুঃখিনী! এ দুঃখ রাখবার আর তাঁর জায়গা নেই।

শান্তিপুর থেকে ফিরে এলেন শচীমাতা।

এ কোন্ শচীমাতা? নিমাইহারা, বেদনাবিক্ষুব্ধা, শরবিদ্ধা হরিণী সে শচীমাতা কোথায় গেলেন? ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরলেন তিনি। চোখে নেই জল, হৃদয়ে নেই কম্পন, অন্তরে নেই ঝড়। সব শান্ত। জীবনতটিনী ধীর স্থির।

তিনি ডাকলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, বৌমা, নিমাই সন্ন্যাসী হোয়েছে, মাথা মুড়িয়ে হাতে কমণ্ডলু ধারণ কোরেছে। গৈরিক বস্ত্র তার অঙ্গে মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। নাচতে নাচতে সে নীলাচলে গেলো। আর সে ঘরে ফিরবে না, মা হোয়ে আমি সবই দেখলাম। এসো এখন দুজন কাঁদি—আমাদের কান্না দেখে জীবের হৃদয় শোধন হোয়ে তারা উদ্ধার হোক। দুঃখী তাপী পাপীর জন্য নদীয়ায় তাঁর এই লীলা। আমরা তাঁর লীলা সহায়িকা। এ সংসারের নাটমঞ্চে আমরা নট তিনি সূত্রধর।

নীলাচল থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসছেন নদীয়ায়। সন্ন্যাসীর জননী ও জন্মভূমি দর্শন জীবনে একবার কর্তব্য, সেই কর্তব্য পালনের জন্য তিনি আসছেন। সুসংবাদ ছড়িয়ে গেলো সারা নদীয়ায়, হারানিধি আসছে আবার নদীয়ায়।

শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ সংবাদ দিয়ে বোললেন, বৌমা আমার নিমাই আসছে!

বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ নীচু কোরে জবাব দেন, আমার মনে হয় আমি যদি এ বাড়ীতে না থাকতাম তাহালে তিনি নিশ্চয়ই আসতেন।

কাঞ্চনা এমন সময় এসে একটু রাগের স্বরে বোললে, এবার এলে তাঁকে আমি কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দেবো! ধর্মরক্ষার জন্য নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে! সতী স্ত্রী ছেড়ে কোন ধর্ম পালন হয়? ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র কি সীতাকে একেবারে ত্যাগ কোরেছিলেন? দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কি চিরদিনের মত বর্জন কোরেছিলেন? তবে উনি কেন এ কাজ কোরেছেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া উতলা হোয়ে বোললেন, সখি কাঞ্চনা কোন রূঢ় কথা তাঁকে বোল না, সে ব্যথা আমারই বুকে বাজবে! তিনি দয়াময়, হৃদয়ে তাঁর প্রেমের স্রোত। এ তিন ভুবনে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই তাঁকে তুমি কোন কড়া কথা বোল না। আমার মনে ব্যথা নেই। তিনি মায়ামুক্ত পরমপুরুষ, তাঁর লীলা কি আমরা বুঝি। তিনি যেভাবে নাচাবেন সেইভাবে নাচতে হ'বে!

কাঞ্চনা বোললে, সখী আমি না বুঝে ঐ কথা বোলেছি, তুমি আমায় মার্জনা করো। তাঁকে বিচার করি আমার সাধ্য কি।

গংগাতীরে লোকারণ্য· প্রেমের ঠাকুর, কাঙালের ঠাকুর কৃপা কোরে আসছেন ভক্তজন সম্মুখে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলতে বোলতে তিনি পথ দিয়ে আসছেন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে।

শচীমাতা দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নিমাইয়ের প্রতীক্ষায়। নিমাই আসতেই শচীমাতা ব্যাকুলভাবে নিমাইয়ের পদপ্রান্তে আছড়ে পড়লেন।

নিমাই চোখ বুজে ভাবছেন। কি বিঘ্ন যে এখানে ঘটবে তা কে জানে। ভুল হোয়েছে আমার এখানে আসা।

এমন সময় কাঞ্চনা ও অমিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকে নিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

দেহ ঢাকা হোলে কি হবে, মনের চোখে বিষ্ণুপ্রিয়া সবই দেখছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম কোরলেন।

চৈতন্যদেব বোললেন, শ্রীকৃষ্ণে মতি হোক!

বিষ্ণুপ্রিয়া তেমনিভাবে কাপড়ের আড়ালে থেকে বোললেন, ওগো কৃপানিধি করুণার অবতার! এ দাসী তোমার কাছে বহু করুণা লাভ কোরেছে। আজ তোমার কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হোয়ে এসেছি। তুমি কাঙালের ঠাকুর, এ কাঙালিনীকে তুমি এমন একটা কিছু নিদর্শন দাও যাতে আমি তাই নিয়েই তোমার সেবা কোরতে পারি। এ ব্যথাতে জীবনের শেষ তো প্রভু অতি তাড়াতাড়ি হবে না। আমি বাঁচবো কি নিয়ে। আমি যে নিঃস্ব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কাতরভাবে বোললেন, আমি সন্ন্যাসী, আমার তো কোন কিছু নেই দেবার, মানুষের দ্বারে দ্বারে আমি কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা কোরে বেড়াই। একটা বন্ধন আছে আমার পায়ে, এই পাদুকা দুখানা যদি তোমার মন বলে তাহালে তুমি এইটে নিতে পারো।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদুকা দুখানা বিষ্ণুপ্রিয়া মাথায় নিলেন।

পরে মাতার দিকে চেয়ে চৈতন্যদেব বোললেন, মাগো তুমি ঘরে যাও কৃষ্ণভজনে দিন কাটাও, একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর এ ত্রিজগতে কিছুই আপনার নেই। যা আছে তোমার চারিদিকে তা সবই মায়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া পথে আসতে আসতে অত্যন্ত কাতর হোয়ে কাঞ্চনাকে বোললে, সখী! এ আমি কি কোরলাম, পাদুকা না থাকলে তাঁর কোমল অংগে যে আঘাত লাগবে এ কথা তো আমি আগে বুঝিনি। যদি তার পায় কাঁটা ফোটে, যদি শক্ত মাটিতে আঘাত লেগে তাঁর কোমল অংগে রক্ত ঝরে তাহালে কে তা মুছিয়ে দেবে! এ আমি কি কোরলাম সখী! বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে থাকেন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে পাদুকা দিয়েছিলেন পাদুকা সামনে রেখে রাজ্য শাসন কোরতে আর কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর পাদুকা দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য। এ পাদুকা কাষ্ঠপাদুকা।

কিন্তু কৃষ্ণের পরশ আছে ওতে। ঐ পাদুকা মাথায় রাখা মানে কৃষ্ণকে মাথায় রাখা। কৃষ্ণময় যে সে কৃষ্ণ ছাড়া আর কি।

রাত কত কে জানে। ভোর হয় হয়। আকাশের এক কোণে মৃগশিরা না রোহিণী নক্ষত্র তখনও উঁকি মারছে। এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া হঠাৎ বিছানায় বসে কাঞ্চনাকে ডাক দেয়।

কাঞ্চনা ছুটে আসে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বলে, কি হোল সখী!

আজ একটু আগে স্বপ্ন দেখেছি যেন প্রভু বোললেন, আমি নদীয়াতে এই গৃহে প্রকাশ হবো! নিমগাছের তলায় আমার জন্ম হোয়েছে সেই নিমগাছ দিয়ে আমার একটা মূর্তি তৈরি কোরে স্বরূপ জ্ঞানেতে আমার পূজা করো। আমি সেই মূর্তিতেই প্রকাশ হবো। এ কাজের ভার ভক্ত বংশীবদনকে দিয়ে দাও। সে যেন একপক্ষ কালের মধ্যেই মূর্তি তৈরী কোরে দেয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দে কাঞ্চনাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, সবই প্রভুর কৃপা, রাতপোহালে তুমি সব ব্যবস্থা করো।

তা কোরব, তবে আমি ভাবছি সখী অন্য কথা।

কি কথা কাঞ্চনা!

তিনি স্বয়ং অবতার, তাঁকে দেখবার জন্য আবার মূর্তি পূজা কেন! তিনি সর্বত্রই বিরাজমান।

লীলাময়ের লীলা বুঝি, এমন সাধ্য আমাদের কই।

একপক্ষ কালের ভিতর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দারুমূর্তি তৈরি হোয়ে গেলো। আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত হ'বে ঐ দারুমূর্তি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি দেখে কেঁদে আকুল, কই আমার প্রাণবল্লভ, দাও আমাকে আমি যে কতদিন দেখিনি।

কাঞ্চনা বলে, প্রভু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তুমি কাঁদছো! যাও ধীরে ধীরে, প্রাণবল্লভ তোমার ভাবে নিদ্রামগ্ন। ঐ আঙ্গিনায় গিয়ে তাঁকে প্রাণভরে দর্শন করো।

একটু থেমে বলে কাঞ্চনা, যাও তুমি প্রভুর পাশে দাঁড়াও, আমরা

তোমাদের যুগলরূপ দেখে ধন্য হই। আজ গৌরপূর্ণিমা প্রভু এইদিনে অবতীর্ণ হোয়েছিলেন, আজ ভক্তিরর আরতি হবে।

সন্ধ্যায় আরতি সুরু হোল। যাদব নেচে নেচে আরতি কোরছে। আঙ্গিনায় মানুষের ভীড়। নদীয়াবাসী আজ তাদের হারানিধিকে পেয়েছে ফিরে।

বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে নীরব চরণে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন। চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে। একদৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন ঐ দারুমূর্তির দিকে। আহা কি রূপ! এই তো সেই এ যে কতকালের চেনা; এরূপ কি ভোলবার।

দারুমূর্তি যেন হাসছে আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকছে। কই এসো এইতো আমি।

চোখের জল মুছে চেয়ে দেখো। বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। আরতি শেষ হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন জ্ঞান নেই, কোন কিছুই আর শুনতে পাচ্ছেন না। প্রাণবল্লভ তাঁকে কৃপা কোরেছেন, ঐ রাঙা চরণে তিনি আসন পেতেছেন! আর কি বিষ্ণুপ্রিয়া থাকতে পারেন। টলতে টলতে বিষ্ণুপ্রিয়া ঐ মূর্তির সামনে পড়ে যায়।

একটা দমকা হাওয়া এসে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। একটি মুহূর্ত, একটি চক্ষের পলক।

মন্দিরের দোর খুলে সবাই দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও নেই। কৃষ্ণময় প্রাণ কৃষ্ণেই লীন হোয়ে গেলো।

চিরবিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার দগ্ধপ্রাণ পেলো শান্তির আশ্রয়। জীবনের তৃষ্ণার হোল অবসান। মহাসাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলেই মিলিয়ে গেলো। রেখে গেলো জীবের জন্য জীবন ভোর কৃষ্ণকান্না। এ কান্নার বিরাম নেই।

কান্না, কান্না, কান্না। জন্ম থেকে মৃত্যু শুধু কান্না আর কান্না।

এ কান্না আছে বোলেই আজও জীব কেউ কেউ কৃষ্ণাকৃপা লাভ কোরছে। কাঁদলে যদি তোমাকে পাওয়া যায় তাহালে আমরা তো সবাই তোমার জন্য কাঁদছি। এসো প্রভু তুমি আমাদের হৃদয়ের আঙিনায়।

জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর
পেতে হবে তব পরিচয়।

যুগসাধিকা—

শ্রীশ্রীসারদামণি

"লোকের মুখে শুনি সত্য বল শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে"

সবার মা সারদা।

শুধু কি একজন দুজনের মা। এ বিশ্বের সবারই মা। যত জীব, যত ক্লীব, অন্ধ আতুর, ধনী নির্ধনী, পশুপক্ষী সবার কাছেই শুধু মা।

জীবপালিনী, জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী।

যে ডাকে সেই পায়। যে পায় সে বেঁচে যায়। যে ডাকে না, ডাকতে পারে না সেও পায় মায়ের করুণা। মা যে করুণাময়ী। তাঁর অপরিমেয় করুণা সূর্য কিরণের মত পৃথিবীর সর্বত্রই সমানভাবে উপচে পড়ে।

সংসারে যেটুকু সার সেটুকু মা সারদা। আশার জিনিষ নিয়ে যে মানুষ দিনরাত নাড়াচাড়া কোরছে তাতে পাকা রঙ লাগাতেই তো মায়ের আবির্ভাব—দুঃখ কষ্ট শোকতাপের জ্বালায় যে মানুষের দেহমন যন্ত্রণা ভোগ করছে তাতে শান্তির প্রলেপ দিতেই তো মা এসেছেন

সারদামণি জীবের মাথার মণি। সারদা বরাভয় দায়িনী। সারদ মহাশক্তি, সারদা ভক্তি, সারদা মুক্তি, সারা বিশ্বের ছায়া যেন ঐ সারদার ভিতরে।

এই ছায়ার নীচে এসে যে আশ্রয় নেবে তার আর কোন ভয় নেই কোন ভাবনা নেই। মাতৃ আশ্রয় যে সব চেয়ে বড় আশ্রয়—মুখ লুকাবার এত বড় জায়গা আর কি পৃথিবীতে আছে?

সারদা তো শুধু মা নয়। সারদা জগন্মাতা, সারদা অন্নপূর্ণা, সারদ মহামায়া। মা মা বোলে না কাঁদলে মা কি কোলে নেয়?

মা খেতে দাও, মা পরতে দাও, মা ধন ঐশ্বর্য দাও, মা বিষ

সম্পত্তি দাও। কিন্তু এত দাও দাও করলে কি আর মায়ের কোল পাওয়া যায়।

যে কাঁদে মা তো তারই ফাঁদে পড়ে। যে কাঁদে মা তো তাকেই বাঁধে। চোখের জলে মায়ের পা যে ধোয়াতে পারে, তারই মাথায় মায়ের কৃপা পড়ে।

ও মা আমায় একটু কোলে নেবে ? তোমার কোলে ওঠার আমার ভারী সাধ।

ছোট্ট একটা মেয়ে, গায়ের রং শ্যামবর্ণ। মাথা ভর্তি কালো চুল। মুখখানায় অপরূপ লাবণ্য। শ্যামবর্ণ রূপে যেন বিশ্বের সমস্ত রূপ এসে বাসা বেঁধেছে।

এমন রূপবতী মেয়েটা কার ?

জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী সেখান থেকে এক মাইল দূরে শিওড়ে গাঁয় মেলা দেখতে এসেছিল গ্রামের আর পাঁচ জনের সঙ্গে। বেলা যায় যায়। শ্যামাসুন্দরী সংগী ছাড়া হোয়ে ভাঙা মন্দিরের পাশে বিরাট বেলগাছটার নীচে দাঁড়িয়েছিল।

শ্যামাসুন্দরী চেয়ে চেয়ে দেখছে মেয়েটার দিকে। এ মেয়েটা কোথায় থাকে, কাদের ঘরের মেয়ে কেই বা জানে।

শ্যামাসুন্দরী হাত বাড়িয়ে বোললে—আমার কোলে ওঠার তোমার এত সাধ।

হ্যাঁ বড্ড সাধ, তোমার ঘরে আমি যাব।

তা বেশ তো চলো না।

আজ না আর একদিন সন্ধ্যা হওয়ার আর দেরী নেই।

মেয়েটি চলে গেলো।

তার পায়ের শব্দ আর শোনা গেলো না। শ্যামাসুন্দরী আর তাকে দেখতে পেলো না।

কিছুক্ষণ পর সংগীরা এসে দেখলো শ্যামাসুন্দরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঐ বেলতলায়।

শ্যামাসুন্দরীর যখন জ্ঞান হোল তখন আর তার কিছু মনে নেই, শিওড় থেকে সবাই ফিরে এলো জয়রামবাটি। সবাই এলো মেলার জিনিষ কিনে নিয়ে। কুলো, বাঁশী, কাঠের পুতুল।

আর শ্যামাসুন্দরী!

শূন্য হাতে ফিরেছে বটে কিন্তু মন ভরে এনেছে পূর্ণ করে।

আঠারোশ তিপান্ন সালের বাইশে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই .গু রামচন্দ্র মুখুজ্যের ঘর আলো করে শ্যামাসুন্দরী এক অপরূপ কন্যাসন্তান প্রসব করল।

লক্ষ্মী বুঝি ঘরে এলো। শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনিতে বাড়ী মেতে উঠলো। মেয়ে হয়েছে তাতে কি আসে যায়, মেয়েও মা বোলে ডাকবে, ছেলেও মা বোলে ডাকবে। সেই একই মায়া! সেই একই শান্তি!

কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার কয়েকদিন আগে রামচন্দ্র দুপুরে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলেন একটা কালো মেয়ে মল পায় দিয়ে ঝুম ঝুম করতে করতে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলছে—তোমার ঘরে এলাম আমি!

রামচন্দ্র ঘুমের ঘোরেই জবাব দিলেন—কেন এসেছো এখানে?

তোমার আদর পাবো বোলে।

ঘুম ভেঙে গেলো রামচন্দ্রের।

সত্য হোল দিবাস্বপ্ন।

সারদামণি জন্ম নিল বৃহস্পতিবার। কত নাম মেয়ের; কেউ বোললে ঠাকুরমণি, কেউ বোললে ক্ষেমঙ্করী, কেউ বোললে লক্ষ্মীমণি....

কিন্তু সব নাম ডুবে গেলো।

ভেসে উঠলো সারদামণি।

সংসারের সারবস্তুই তো স্নেহময়ী মা। সমস্ত জগৎটাই তো কোল। এমন নির্ভরযোগ্য স্থান। এমন ভয়শূন্য পরিবেশ মায়ের কোল ছাড়া আর কি আছে।

সারদাকে পেয়ে রামচন্দ্র মহাখুসী। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তার ঘরে

এসেছেন। যেমন রূপ তেমনি গুণ। অতটুকু মেয়ে হাত পা নাচিয়ে খেলা করে। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। কান্নাকাটিও তেমন করে না। যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী তার মুখে তো হাসি থাকবেই। ঘর আলো করতে যিনি এসেছেন তার মুখে অন্ধকার কি মানায়। সারদা এদিক ওদিক চায় আর হাত পা নেড়ে খেলা করে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরতে চায়। পায় না, তবুও মেয়ের কান্না নেই। ও কি কিছু ফেলে এসেছে? কে জানে কোন জন্মে ও কি হারিয়ে এসেছে। রামচন্দ্র বলে সবাইকে—দেখো সারদা একাই একশো হোয়ে আমার ঘর আলো করে রেখেছে—বড় পয়মন্ত মেয়ে আমার। ওর মুখের দিকে তাকালে সব যেন আমার ভুল হয়ে যায়—কি মায়া ও যে জানে তা তো বুঝতে পারি নে।

মায়ার আধারই তো মহামায়া। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ভুলিয়ে রেখেছেন, ভরিয়ে রেখেছেন, তিনি তো যে সে নন। বাজীকরের মেয়ে।

সারদার পর রামচন্দ্রের ঘরে এলো দ্বিতীয় কন্যা কাদম্বিনী। পর পর দুটি মেয়ে।

কেউ বোললে—লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

কেউবা বোললে একটা ছেলে হোলেই এবার ভালো হোত। রামচন্দ্র মনে মনে হাসেন। সংসারে মেয়েই বা কে, আর ছেলেই বা কে, যার ভাগ্য নিয়ে সেই আসে আর যায়। ধরেই বা কে রাখে আর বেঁধেই বা কে রাখে। খেলতে আসে সবাই খেলা শেষে যায় যার ঘর। এই যে ঘর। ঐ যে ঘর ও তো ভাড়াটে ঘর। ওতে কারও কোন দখল আছে? তবুও এই মানুষকে সংসার করতে হয়। খেলার সাথী পুত্রকন্যা স্ত্রীরূপী রঙ বেরঙের পুতুল।

রামচন্দ্র মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে একটা পুত্র কামনা করেছিলেন। কিন্তু যিনি দেবার মালিক তিনি যা দেবেন তাই তো নিতে হবে!

ভগবান রামচন্দ্রের মনের ব্যথা বুঝি বুঝতে পারলেন।

পর পর পাঁচটি ছেলে হল রামচন্দ্রের. প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসন্ন আর অভয় চরণ।

একই গাছে কত ফুল।

মেঘ করে, ঝড় ওঠে, বৃষ্টি পড়ে।

রামচন্দ্র বসে বসে ভাবে এই বুঝি ঝড়ের বেগে কোন ফুলটা ঝরে যায়, ঐ বুঝি গাছ ভেঙে পড়ে।

দারিদ্র আসে ঝড় হয়ে, অভাব অনটন আসে বন্যা হয়ে, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা আসে দুর্ঘটনার বাণী নিয়ে।

রামচন্দ্র চঞ্চল হয়ে পড়ে। কি করে চলবে সংসার! কি করে ছেলে মেয়ে বাঁচবে! সারদা শুধু হাসে। মিষ্টি মুখের স্নিগ্ধ হাসি।

তুলোর চাষ সুরু করল রামচন্দ্র। শ্যামাসুন্দরী আর সারদা তুলো কুড়িয়ে ধামা ভরে। সারা মুখ সাদা হয়ে যায় সারদার তুলোতে। কোন বিরক্তির ভাব নেই, কোন অবসাদ নেই। লক্ষ্মী পেতেছে সংসার। তাকে ত খাটতে হবেই। রোদের তেজে সারদার মুখ লাল হয়ে যায়। তবুও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মনে তূলো তোলে আর ধামা ভরে। শ্যামাসুন্দরী ওপাশের ক্ষেতে আর এ পাশে সারদা।

মেয়ের সংগে মা যেন পেরে ওঠে না।

সারদার সাথে কিছুদূরে কালো একটা মেয়ে তূলো তুলছে আর হাসছে।

কে গো তুমি? কেন গো?

তোমায় তো চিনিনে, তুমি কোথায় থাক?

মেয়েটির পরনে একটা লাল পেড়ে শাড়ী। কালো রঙে সূর্যের আভা পড়ে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

মেয়েটা বললে আমায় তুমি চেনো না, কিন্তু আমি তোমায় চিনি। সারদা কেমন করে চিনবে?

ওমা তুমি যে আমার বোন হও সম্পর্কে, একা একা পারছো না তাই তো এলাম তোমার কষ্ট দেখে।

তুমি বেশ ভাল তো।

হ্যাঁ ভাল না হলে আর তোমার সাথে সম্পর্ক পাতাই।

সারদা আর কিছু বলে না। আপন মনে তূলো কুড়িয়ে ধামা ভরে।

ওপাশের ক্ষেত থেকে শ্যামাসুন্দরীর গলা শোনা যায়—কার সঙ্গে কথা বোলছিস রে!

একটা কালো মেয়ে, দেখবে এসো।

যাই!

শ্যামাসুন্দরী এসে বলে, কই রে সে মেয়েটা?

সারদা চারিদিকে চায় কিন্তু আর দেখতে পায় না। এক নিমিষে যেন হাওয়া হোয়ে মিলিয়ে গেলো।

হ্যারে কই সে!

মা এই তো এখনি এখানে ছিল। তাইতো কোথায় গেলো।

কি দেখতে কি দেখেছিস তার নেই ঠিক।

না মা আমি ঠিকই দেখেছি।

শ্যামাসুন্দরী আর কোনো কথা বলে না।

সারদাও যেন বোকা বনে যায়। সত্যিই তো মেয়েটা এতক্ষণ কত কথা বোলল আর এক দমকায় গেলো কোথায়।

শিশু মন। ভুলে গেলো সারদা মেয়েটার কথা। মাটিতে পড়া তূলো গুলো আপন মনে আবার তুলতে থাকে।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি।

আর এক দিনের কথা—রামচন্দ্রের বাড়ীর অদূরে এক জলাতে গেছে সারদা, গরুর জন্য ঘাস আনতে। বেলা তখন বেশ। রোদ্দুর যেন খাঁ খাঁ কোরছে। জলার ধারে আর কেউ নেই।

সারদা ধীরে ধীরে জলে নামে আর ঘাস তুলে তুলে ওপরে আনে। একবার জল আর একবার ডাঙা কোরতে কোরতে সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। ছোট শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে রোদে পোড়া মুখখানা একবার মুছে নেয়।

খানিকক্ষণ পর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে সেই তূলোর ক্ষেতে দেখা লালকাপড় পরা কালো মেয়েটা কিছুদূরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘাস তুলছে। সারদা অবাক হোয়ে যায়।

কোন পথে সে জলে নামলো—

কি গো চিনতে পারছো! বোললে, মেয়েটি।

সারদা এক গোছা ঘাস হাতে কোরে বোলে ওঠে তুমি কখন এলে?

মেয়েটা হাসতে হাসতে বলে—বারে আমি তো তোমার সাথেই জলে নেমেছি, ডাঙার দিকে চেয়ে দেখোতো কত ঘাস তুলেছি—এই রোদের মধ্যে ঘাস তুলছো একা তাই বড় কষ্ট হোল—থাকতে পারলাম না চলে এলাম।

তোমাদের বুঝি গরু আছে? তা কতগুলো গরু আছে গো?

কালো মেয়েটা এবার হাসতে থাকে—

হাসছো কেন গো—

হাসবো না তোমার গরু তো আমারও।

এ ঘাস সব আমার—

হ্যাগো তোমার—

আমার জন্য তুমি এত কষ্ট করো কেন!

আমি সবার জন্যই এমন কষ্ট করি—আমার কথা যে ভাবে, আমাকে যে ডাকে আমি যে তার কাছেই যাই।

সারদা শুধু অবাক হোয়ে যায়। কি যে ভাবে তা কে জানে—

হঠাৎ বোলে ওঠে—আমি তো তোমাকে ডাকিনি!

বারে না ডাকলে আমি জানলাম কি কোরে—

ডাকলেই তুমি আসবে?

হ্যাগো আসবো!

সারদা চুপ কোরে থাকে।

মেয়েটা তার অন্ধকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ সারদার চোখে জল আসে—

তুমি কাঁদছো কেন গো—

আমার বাবার বড় কষ্ট—

মিছে কথা, তোমার মত মেয়ে যার ঘরে তার আবার কষ্ট কি। তোমার বাবার মত ভাগ্যবান আর কজন আছে গো!

সারদার মাথায় ঘাসের বোঝাটা তুলে দেয় মেয়েট

এসো না আমাদের বাড়ী—

সময় হোলে যাব।

সারদা তাকিয়ে দেখে মেয়েটা আর নেই।

এদিক ওদিক কত খুঁজে আর দেখতে না পেয়ে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে সোজা বাড়ী চলে এলো।

সারদা আস্তে আস্তে ভুলে যায় মেয়েটার কথা।

কীর্তনের আসর বসেছে শিয়ড়ের হৃদয় মুখুজ্যের বাড়ী। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাগনে। গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েছেলে সব ভেঙে পড়েছে। শ্যামাসুন্দরীও গেছেন সারদাকে কোলে কোরে। সারদার বয়স তখন দুবছর পার হয়েছে সবে মাত্র।

আসর বেশ জমে উঠেছে। সারদা বাজনার সাথে সাথে হাততালি দিচ্ছে। কীর্তনীয়া গান ধরেছে—

কিশোরী ঐ বুঝি রাই চলে যায় মথুরায়

চারিদিক গানের মূর্চ্ছনায় নিঝুম। মথুরায় চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ছেড়ে। সেই বিয়োগ ব্যথা সমস্ত আসর যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারদা মার কোলে বসে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন কার দিকে! মেয়ের চোখে ঘুম নেই, কি দেখছে চেয়ে চেয়ে ঐ জানে। পাশ থেকে কে একজন বোলে উঠলো, ও মা মেয়ে অমন হাঁ কোরে চেয়ে কি দেখছে।

ওর বর দেখছে!

পরে একজন সারদার চিবুক ধরে বোললে, বিয়ে কোরবি, দেখতো তোর কোন বরটা পছন্দ।

সারদা হাসতে হাসতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে আসরে বসা একজনকে।

যাঁকে সারদা বর বোলে দেখলো তিনি কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুয্যের ছেলে গদাধর। পরবর্তী কালের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

মা চন্দ্রমণিকে একদিন গদাধর বোললেন, আমার বিয়ের পাত্রী দেখার জন্য তোমরা এমন হয়রান হোয়ে ঘুরছো কেন গো। পাত্রী তো জয়রাম বাটিতে কুটোবাধা আছে।

কুটোবাধা আছে।

গদাধর হাসতে হাসতে বোললেন, হ্যাঁগো গাছের প্রথম ফলটা যেমন দেবতার ভোগে লাগবে বোলে সবাই আগে ভাগে একটা কুটো বেঁধে রাখে আমার পাত্রীও তেমনি কুটো বাধা আছে। যাওনা জয়রামবাটি। দেখো আমার কথা ঠিক কি না।

কার মেয়েরে ?

কেন গো রাম মুখুজ্যের মেয়ে।

গদাধরের হাবভাব দেখে মা চন্দ্রমণির ভালো লাগে না। কেমন যেন উদাসীন ভাব। কোন কিছুর ওপর তাঁর কোন তৃষ্ণা নেই। কোন সময়ে ভাবছে, কোন সময় আপন মনে হাসছে আবার কোন সময় কাঁদছে। বসে আছে তো বসেই আছে। কোন সাড়া নেই শব্দ নেই, দুনিয়ায় কি হোচ্ছে না হোচ্ছে তাও তাঁর খেয়াল নেই। যেন এক মহাজ্ঞান তপস্বী।

সাধনামগ্ন, ধ্যানমগ্ন এক মহান সাধক।

কামারপুকুরের কেউ কেউ বলে পাগল গদাধর।

গদাধর হাসেন আর মনে মনে ভাবেন, সারা দুনিয়াটাই তো হোচ্ছে পাগলাগারদ তাই তো সেও পাগল।

চন্দ্রমণির কানে আসে ঐসব কথা। সত্যি সত্যি তার গদাধর তো পাগল নয়, তবুও মনের কোন গোপন কোনে মোচড় লাগে।

হাজার হোলেও মা তো। চন্দ্রমণি ব্যস্ত হোয়ে পড়ে। গদাধরের

বিয়ে দিতে হ'বে. বিয়ে দিলে যদি ওর সংসারে মন বসে। একটা ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে এনে ওকে বাঁধতে হবে কঠিন বাঁধনে।

এক ছেলে চলে গেলো জয়রামবাটি সম্বন্ধ ঠিক কোরতে।

রামচন্দ্র অবাক হোয়ে যায় সব কথা শুনে।

তাই তো মেয়ের বয়স এই তো সবে পাঁচ বোধহয় পেরুলো।

মনটা যেন তার কেঁদে ওঠে। অমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটাকে এখুনি পরের ঘরে পাঠাবো।

গদাধরের দাদা বোললে, আগে তো আট বছরেই গৌরীদান হোত। আপনি মেয়েটা আমাদের দিন।

রামচন্দ্র ভাববার জন্য সময় নিলেন।

স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর একমন বোলছে ভালই হবে আর একমন বোলছে সবাই বলে আধপাগলা।

জয়রামবাটির মানুষে নানান জনে নানাকথা বোলতে লাগলো।

মুখুজ্যের মাথা খারাপ হোয়েছে নইলে অমন পাগল ছেলেটার সংগে অমন সোনার প্রতিমার বিয়ের সাব্যস্ত করে।

কেউ বা বোললে, মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলেই ফেললো গো।

কথা ছোটে বাতাসের আগে। মা চন্দ্রমণির কানে কথাটা গিয়ে উঠলো। চন্দ্রমণি ভাবলেন, ছেলেটার সত্যি সত্যিই যদি মাথা খারাপ হোয়ে যায় তাহালে তো আর সংসারে মন বসবে না।

গদাধর তখন আপন ভাবভক্তিতে অজ্ঞান! দিনরাত সাধন ভজন কোরছেন। যা তাঁর চালচলন তাতে তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কখনও কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, কখনও হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন!

চন্দ্রমণি ব্যস্ত হোয়ে পড়লেন। আবার বড় ছেলেকে পাঠালেন জয়রামবাটিতে।

নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন একেবারে আশীর্ব্বাদ কোরে দিন স্থির কোরে পাকাপাকি কোরে আসতে।

দিনক্ষণ সবে ঠিক হোয়ে গেলো।

শক্তি আর শিবের বিয়ের লগ্ন স্থির হল।

জয়রামবাটিতে সারদা আর রামকৃষ্ণ।

পার্বতীও একদিন শ্মশানচারী আত্মভোলা পাগল মহেশ্বরের গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন। একালের সারদাও বরমাল্য দেবেন পাগল গদাধরকে। সারদা তো পার্বতীই; নইলে দেশে এত পাত্র থাকতে পাগলকে বরণ কোরে নেবে কেন।

আগের মানুষ দেখেছে হরগৌরীর মিলন। আর এবার মানুষ দেখবে সারদা রামকৃষ্ণের মিলন। সব একই। বার বার ভিন্ন রূপের লীলা। ত্রেতায় রামসীতা। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরাধিকা। গোলকে লক্ষ্মী-নারায়ণ। কলিতে সারদা রামকৃষ্ণ।

শুভলগ্নে গদাধর বিয়ে কোরে নিয়ে গেলো সারদামণিকে কামারপুকুরে। বৌ দেখে সবাই খুশী হোল। পাগলের বরাত ভালো নইলে এমন জগদ্ধাত্রীর মত বৌ পায়।

মা চন্দ্রমণির হৃদয় কানায় কানায় আনন্দে উদ্বেল। এবার তবে পাগল ছেলের পাগলামি সারবে। কঠিন বাঁধন দিয়েছি।

অন্তরীক্ষে কে যেন হাসে।

যিনি নিজে বন্ধনাতীত। যিনি নিজেই রজ্জু তাকে বাঁধবে কে! পাগল গদাধরকে এখন কে চিনবে, কে জানবে।

বৌভাতের দিন কামারপুকুরের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ী থেকে বৌ সাজানোর গয়না আনা হোল ধার কোরে। কথা রইল বৌ-ভাত মিটে গেলে গয়না ফেরৎ দেওয়া হ'বে।

মিটে গেলো বৌ-ভাত। এবার গয়না ফেরৎ দিতে হ'বে। চন্দ্রমণি চিন্তায় পড়ে গেলেন কেমন কোরে বৌয়ের গা থেকে গয়না খুলে নেবেন।

সরলা বালিকা সারদামণি জানে এ গয়না যখন তার গায় উঠেছে তখন এ গয়না তারই। যখন জানবে এ সব গয়না তার একটাও নয় তখন তার মনের অবস্থা কি হ'বে।

চন্দ্রমণি ভাবনায় পড়ে গেলেন, কি হ'বে, নোতুন বৌ প্রথমেই বিপর্য্যয়। চন্দ্রমণি ইতস্তঃত ঘুরে বেড়ান। চোখের সামনে দিয়ে সারদা গহনা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কি অপরূপ সুন্দর লাগছে তাঁকে দেখতে। যেন আকাশের ভরাপূর্ণিমার চাঁদ মাটিতে এসে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এমন রূপ কি কোরে মানুষের সম্ভব।

চন্দ্রমণি যতই দেখেন ততই তার বুক ফেটে যায়. তিনি জানেন— এ দুনিয়ার সবাই জানে, বলেও থাকে। স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় অলংকার তার স্বামী। তিনিই তার একমাত্র ভূষণ।

স্বামীর সাথে যদি গাছতলায় কাটানো যায় সেই তো হোয়ে ওঠে স্বর্গ। নাইবা রইল সুরম্য প্রাসাদ, নাইবা রইল রত্ন অলংকার, নাইবা রইল অতুল বৈভব। স্বামী যার সাথে আছে তার আর কি চাই।

তার রূপের ছটায় তো অলংকারের দু'তি, তার ভালবাসায় তো বাধা আছে জগতের সব ঐশ্বর্য, তার প্রেমই তো ক্ষুধার নিবৃত্তি, তার স্পর্শই তো বর্তমান অতীত ভূত ভবিষ্যৎ। তার কৃপাই তো ঈশ্বর কৃপা, তার সেবাই তো ঈশ্বর সেবা তার কথাই তো বেদ উপনিষদ, তার আশীর্বাদই তো মোক্ষমুক্তি।

তবে! চন্দ্রমণি এত ভাবছেন কেন—

গদাধর বুঝতে পারলেন মায়ের ব্যথা!

মাকে ডেকে কাছে বসালেন·· বোললেন—মা তোমার অত চিন্তা কেন, তুমি কিছু ভেবো না—

ওসব গয়না আমি তোমায় খুলে দেবো।

হ্যারে কি কোরে দিবি, যদি কাঁদে—

গদাধর মায়ের দিকে তাকালেন—মা ওর গয়না সব আমি গড়িয়ে দেবো, এত গয়না গড়িয়ে দেবো তা শেষকালে আর একটাও চাইবেনা বরং যেগুলো থাকবে সব খুলে দেবে।

—একেবারে ছেলেমানুষ কিনা তাই বড় ভয় হয়, চন্দ্রমণি বোললেন।

পাগল গদাধর হাসতে থাকেন।

—হাসছিস যে বড়—

—হ্যাঁ মা ও যে বুড়োর বাবা, ওকে তুমি ছেলেমানুষ বোললে, ও যে কি সে এক আমি জানি, ওকে অত ছোটটি ভেবোনি—ও কোন গয়না তো পরতে আসেনি।

ঠাকুর গদাধর অন্যমনা হোয়ে গেলেন। জগজ্জননী মহামায়া যিনি তাঁর আবার অলংকার! তিনি তো স্বয়ং সর্বঅলংকারা।

মা যিনি সর্বকালে সর্বযুগে তিনি অতুল ঐশ্বর্য-অধিকারিণী সারা জগৎ তো তাঁর কাছে সন্তানময়।

জগতের জননী যিনি তাঁর আবার কি চাই!

সারদা তো নিজে ঘর বাঁধতে আসেনি—তিনি এসেছেন ঘরের মানুষকে নিত্য-নোতুন ঐশ্বর্য দিতে। সে ঐশ্বর্য শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি।

রাতে ঘুমের ঘোরে ঠাকুর গদাধর ধীরে ধীরে সারদার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে নিলেন, একবারও তাঁর হাত কাঁপলোনা, মন বিচলিত হোল না।

সারদা বুঝতেই পারলো না।

সকালে গদাধর বোললেন সারদাকে—ও গয়না তোমার নয়! যাদের জিনিষ তাদের দিয়ে দিয়েছি। তোমাকে আমি অনেক গয়না গড়িয়ে দেবো।

ঐটুকু মেয়ে সারদা একটা কথাও বোললে না। মুখেরও কোন ভাবান্তর ঘটলো না।

গদাধর সারদার দিকে চেয়ে আছে, মাঝে মাঝে হাসেন।

জয়রাম-বাটি থেকে এক কাকা এলেন সারদাকে দেখতে।

বৌভাতে এসে কত গয়না দেখেছিলেন সারদার গায়, সে সব গয়না গেলো কোথায়? তিনি যেন এক সহসা সব বুঝতে পারলেন। সারদাকে কোলে কোরে নিয়ে অনেক কিছু কটুকথা বোলে চলে গেলেন।

চন্দ্রমণির চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

গধাধরের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কে এলো আর কে গেলো।

তিনি তার ভাব নিয়েই পাগল হোয়ে আছেন। মহামায়া যা কোরবেন তাই হবে।

চন্দ্রমণি কেঁদে বলেন—হ্যারে গদাই বৌ যে চলে গেলো।

গদাধর হাসে—যাবে কোথায় মা—যাবার কি আর উপায় আছে, আবার চলে আসবে।

গদাধর একদিন গেলেন শ্বশুরবাড়ী। সারদা খুশী হোলেন, অনেক ভাবে তাঁর আদর যত্ন কোরলেন।

শিব এসেছে পার্বতীর কাছে। পার্বতীর কি চুপ করে বসে থাকলে চলে। শুধু এ ঘর ওঘর কোরে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পাড়ার লোক জামাই দেখতে এসে কেউ বলে—এতো একেবারে পাগল জামাই, ওর কি কোন হুঁস আছে।

দেবাদিদেব মহাদেবও পার্বতীকে বিয়ে কোরতে গেলে সবাই এমনি বোলেছিল। দুনিয়ার যিনি সব চেয়ে বড় পাগল তাঁর কি হুঁস থাকে।

যিনি পাগল না হোয়েও সবাইকে পাগল বানিয়ে দেন, যিনি নিজে বেহুঁশ হোয়ে সবায়ের হুঁশ আনিয়ে দেন, তিনি যদি পাগল না হবেন তাহালে আর কে পাগল হবে।

সারদাকে নিয়ে এলেন গদাধর কামারপুকুরে। সারদা তখন সাত বছরের। ভক্তরা আসে ঠাকুরের কাছে, কেউবা বলে আজ মায়ের পূজো কোরব, কেউ বা বলে পা বার করো পায়ে ফুল দেবো।

সারদা বলে ওঠেন—আমাকে কেন গো, আমার জ্যান্ত দেবতাকে পূজো করো। কেউ বা টুপ কোরে তাঁর পায় দুটো ফুল ফেলে বলে—তুমি মা গো, তুমি তো বগলা, তোমাকে চিনি কি কোরে।

মা সারদা মিটিমিটি হাসেন, ওদিকে ঠাকুরও হাসেন। চিনতে কি এতই সহজে পারা যাবে, চেনার মত মন তৈরী কোরতে হবে, জানার

মত হৃদয় চাই তবে তো জানতে পারা যাবে। অত শত কথায় কাজ কি তার চেয়ে মনপ্রাণ এক কোরে ফেলোনা কেন ভক্তিতে, শ্রদ্ধাতে মাথা নুইয়ে দাও না, দেহের প্রতি শিরায় শিরায় ভক্তির বন্যা বইয়ে দাও। যাকে চিনতে চাও, জানতে চাও তিনি আপনি প্রকাশ হবেন।

মাতৃপূজা কি শুধু ফুল বেলপাতা ছাড়া আর কিছুতে হয় না? মনের সাজিতে ভক্তির ফুল তোল, হৃদয়ের পাত্রাধারে প্রেমের চন্দন সাজাও, অন্তরকে করো আনন্দের ঘট। এইতো পূজোর উপকরণ, এইতো ভক্তের কাছে দেবতার কাম্য। দেবতার দর্শন ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারলেই হোল।

চোদ্দ বছর বয়সে মা সারদামণি এলেন দক্ষিণেশ্বরে। গদাধর তখন কালী কালী কোরেই পাগল! দিনরাত মা মা কোরে কাঁদছেন!

কার জন্য তাঁর এ ক্রন্দন? মাকে পাবার জন্য না জীবকে শিব করার জন্য। যে জানার সেই জানে।

ঠাকুর বোললেন, তুমি এলে কি সংসারের খেলার সাথী হোয়ে, তোমার দলের খেলুড়ী কোরে নেবার জন্য। ঠাকুর স্তব্ধ হোয়ে বসে আছেন। সারা মুখে একটা বিষাদের ছায়া। বোললেন, বলো তুমি কি চাও, তুমি যদি আমাকে আকর্ষণ করো আমার সাধ্য নেই আমি এখানে বসে থাকি। তুমি মহাশক্তি, তোমার কাছে আমার পরাজয় হবেই, বলো তোমার ঐ দুর্বার স্রোতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো কি না।

মা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আছে শিখা। সে শিখা বহ্নিশিখা নয়, সে শিখা প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখা। চোখে দেখা যায় কিন্তু তাও লাগে না।

মা বোললেন, তোমার সাধন পথে আমি হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি—এক সাথে যেতে চাই না। তুমি আগে যাবে আমি যাবো পিছন পিছন!

মা সারদামণি ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন। সারা চোখে মুখে তার অপরূপ জ্যোতিঃ।

ঠাকুর ভাবাবেগে ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে জয় মা জয় মা বোলে! মন্দিরে গিয়ে বোললেন, মা তুই ওকে শান্ত কোরে রাখিস, ও যেন কোন সময় নিজেকে হারিয়ে না ফেলে, তাহালে আর আমার রক্ষে নেই। ডুবে যাবো মা অতল তলে আর উঠতে পারবো না।

১৮৭২ সালের ৫ই জুন অমাবস্যা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ৺ ষোড়শী পূজোর আয়োজন কোরলেন। তিনি নিজ হাতে ফুল তুললেন. চন্দন ঘোষলেন, ঠাকুর ঘরে উঁচু একটু জলচৌকির ওপর মা সারদামণিকে কাপড় পরিয়ে পায়ে আলতা দিয়ে বসিয়ে দিলেন। কপালে সিন্দুরের একটা বড় টিপ দিলেন নিজের হাতে।

মা যেন যন্ত্রচালিতের মত সব কাজ কোরে চলেছেন। সব ভুলে গেছেন তিনি কে আর ঠাকুর রামকৃষ্ণই বা কে।

কেউ দেখতে পাচ্ছে না দোর বন্ধ। ভারতবর্ষের এক মহান সাধক ভগবানরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননী আদ্যাশক্তির পূজো কোরছেন বিশ্বের কল্যাণের জন্য, কামনা কোরছেন তাঁর কাছে আকুল আর্তভাবে। মা ভবতারিণী, মা মহামায়া, মা বিশালক্ষ্মী তুইও যা এও তাই, তোরা সবই এক। এর ভিতরে আসন নে মা, জগতের কল্যাণ কর, আমার এ পূজায় কোন উপকরণ নেই। চোখের জলেই প্রণাম জানাই, তুই সকলের মংগল কর।

মা সারদামণি যেন সমাধিস্থ। তিনি যেন ভবতারিণীর রূপ ধরেই বসে আছেন পাথর প্রতিমার মত.

পূজো শেষ হোল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উজাড় কোরে দিয়ে প্রণাম কোরলেন মা সারদামণিকে।

বোললেন, এবার যাও তোমার নহবতখানায়।

মা কিছু না বোলে চলে গেলেন।

২৭শে অগ্রহায়ণ ১২৮০ সাল। ঠাকুরের মেজো ভাই দেহত্যাগ কোরলেন। দু'চারদিন পর মা সারদামণির বাবা রামচন্দ্রও স্বর্গধামে চলে গেলেন। শ্যামাসুন্দরী অকুল দরিয়ায় যেন ভাসলেন। সংসার বুঝি এইবার ভেসে যায়।

শ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে ভুগছেন। কঠিন আমাশা। সমস্ত শরীর ফুলে যায়। দিনের পর দিন ভুগে ভুগে মায়ের দেহ ক্ষীণ হোয়ে যায়। কত ওষুধ, কত টোটকা কোন কিছুতেই হয় না।

ঠাকুর বোললেন, ভাগনে হৃদয়কে—ওরে ও কি ভুগে ভুগে শেষ হোয়ে যাবে। নিজে অত শক্তি ধরেও নিস্তার নেই। মানুষের সমাজে এসে এখন মানুষের মত রোগ শোক দুঃখ তাপ সবই সহ্য কোরতে হ'বে। মানুষের চামড়ার এমনই গুণ যে গায়ে একবার জড়ালে আর তার ছাড়ান নেই।

মা ফিরে এলেন জয়রামবাটিতে। শ্যামাসুন্দরী কি কোরবেন সারদাকে নিয়ে। একে সংসার চলে না তারপর রোগ শোক। গ্রামের একপাশে জংগলের ভিতরে অখ্যাত অজ্ঞাত দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তি আছে। চারপাশ জংগলে ভরে গেছে, কালে ভদ্রে দু'চারজন মানুষ আসে পূজো দিতে, আগে লোকে মানত কোরত কোন ফল হয় না দেখে আর কেউ মানত করে না।

মা হত্যে দিলেন ঐ সিংহবাহিনীর মন্দিরে।

মায়ের শরীরে এতটুকু বল নেই যে মা নিজে হেঁটে যান। শ্যামাসুন্দরী তাঁকে ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন মন্দিরে। দুচোখ দিয়ে জল পড়ে পড়ে মার চোখ দুটো যেন বুজে গেছে।

শ্যামাসুন্দরী মেয়েকে মন্দিরে রেখে একপাশে শুয়ে থাকলেন। মা একা একা ঐ মন্দিরে সিংহবাহিনীর মূর্তির সামনে বসে আছেন।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার রাত যেন আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে! রাতে জোনাকীরা গাছের পাতায় ঝুলছে। এই অন্ধকারে জংগলের পথ ধরে বোধহয় একটা শিয়াল চলে গেলো শুকনো ঝরাপাতার ওপর দিয়ে।

শ্যামাসুন্দরী কি ঘুমিয়ে পড়ছেন! কে জানে—

রাত নিঝুম। মাঝরাতে কি নিশিরাতে শ্রীমাও বুঝি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়েছেন। এমন সময় একটা দশ এগারো বছরের মেয়ে ধীরে ধীরে এসে শ্রীমায়ের গায় হাত বোলাতেই শ্রীমা 'মা মা' বোলে ডেকে উঠলেন।

ভয় কি এই তো আমি, তোর সব সেরে গেছে।

শ্রীমা চেয়ে আছেন মেয়েটির দিকে—অন্ধকারে চোখে ভালো দেখাও যায় না। একটা কোমল হাতের পরশ যেন মায়ের সারা গায়ে।

শ্রীমা বোললেন—আমার সারা দেহ জুড়িয়ে গেলো। আর কোন জবাব এলো না। রাত পোহালো।

শ্রীমা সিংহবাহিনীর মন্দির থেকে বেরিয়ে মা শ্যামসুন্দরীকে তুলে সোজা হেঁটেই বাড়ী চলে এলেন।

ঘুমন্ত সিংহবাহিনী জাগ্রত হোয়ে গেলো।

১২৭৮ সালের চৈত্র মাস। মা তখন জয়রামবাটিতে। গ্রামের লোকে নানান জনে ঠাকুর সম্বন্ধে কত কথা বলে, বেছে বেছে রামচন্দ্র একটা পাগলের সাথে বিয়ে দিল! কেন এ দেশে কি আর ছেলে ছিল না। যেমন মেয়েটার কপাল!

শ্যামাসুন্দরীও লোকের মুখের কথা শুনে ভাবতেন। মেয়েটা সংসার কি তা জানতে পারলো না। একটা ছেলেমেয়েও হোল না যে 'মা' ডাক শুনবে। মেয়েমানুষ হোয়ে যে মা হোতে পারলো না, তার মত দুঃখী আর কে আছে।

শ্রীমারও পতি নিন্দা শুনতে শুনতে মন বিক্ষিপ্ত হোয়ে যায়। সতী ও স্বামীর নিন্দা শুনতে পারেন নি, হোলেই বা শ্মশানচারী আত্মভোলা তাঁর স্বামী। পতি নিন্দা শুনতে কোন স্ত্রীর ভালো লাগে না।

শ্রীমা ঠাকুরের সান্নিধ্যে যাবার জন্য ব্যস্ত হোয়ে পড়লেন।

লোকের কথায় কি আসে যায়। তাঁর স্বামীর মত স্বামী কজন পেয়েছে। শেষে দক্ষিণেশ্বরে গংগাস্নানের যাত্রীর সংগে মা রওনা হোলেন।

জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর ষাট মাইল। এত পথ হেঁটে আসা কি কম কষ্টের কথা।

কিন্তু এ যে তীর্থপথ। যেখানে স্বামী সেখানেই তীর্থ, যেখানে স্বামী সেখানেই তো স্বর্গ। সে পথে যেতে গেলে কিসের কষ্ট। এমন কোরে এত পথ হাঁটা কি তাঁর অভ্যাস আছে। তিন দিন চলার পর মা জ্বরে পড়লেন।

শুভযাত্রায় এমন বিঘ্ন কেন হোল কে জানে—গভীর রাতে অচৈতন্য হোয়ে গেলেন মা জ্বরের ঘোরে।

কিন্তু বিছানার শিয়রে ও কে? কালোবরণ চোখ, কালোবরণ মুখ একটা মেয়ে যেন তার গায় হাত বোলাচ্ছে।

শ্রীমা চমকে উঠে বোললেন- তুমি কে গো।

আমি তোমার বোন দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। তোমার কষ্ট দেখে আর থাকতে পারলাম না। দোরে শিকল দিয়ে চলে এসেছি।

শ্রীমার চোখে জল দেখা দিল।

বোললেন, বড় আশা ছিল ঠাকুরকে দেখবো, কিন্তু তা আর হোল কই।

তুমি একটু সুস্থ হোয়ে যেও—ঠাকুর যাবেন কোথায়! তাঁকে তো সেখানে বেঁধে রেখেছি তাঁর কি কোথাও যাবার উপায় আছে।

আমি চলি গো!

সে কি এই রাতে একা একা!

হ্যাঁ গো! ভোর হবার আগে না গেলে আবার হয়তো ও একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলবে। ও তো যে সে নয়, সব দেখতে পায়। ওর চোখকে ফাঁকী দিই সে ক্ষমতা আমার কই!

দক্ষিণেশ্বরের মেয়ে আবার দক্ষিণেশ্বরেই ফিরে গেলো।

অন্ধকারে যার ভয় করে না, একা একা যে চলে, সে দক্ষিণেশ্বরের মেয়ে ছাড়া আর কে হ'বে।

এদিকে শিকল পড়া শব্দে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘুম ভেঙে যায়। ঠাকুর

বোলে ওঠেন, কে যায় গো! বাতী জ্বালেন, এদিক ওদিক দেখেন, কই কোথাও তো কেউ নেই। ঠাকুর হাসেন—বাজীকরের মেয়ে বটে!

মা এসে পৌঁছালেন দক্ষিণেশ্বরে। তখনও শরীর ঠিক হয়নি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বোললেন, হঠাৎ এলে যে, আমার জন্য মন চঞ্চল হোল কেন গো।

শ্রীমা বোললেন হাঁপাতে হাঁপাতে—আসবো না নানান জনে নানান কথা বলে আর সহ্য কোরতে না পেরেই তো এলাম চলে।

আমার ভারী নিন্দে করে তাই না, আমি পাগল, তা বেশ কোরেছো। শ্রীমার দিকে চেয়ে বোললেন—ইস্ তোমার শরীরটা যে বড্ড খারাপ হোয়ে গেছে!

আমি তাহালে নহবতে যাই!

না, না সেখানে গেলে তোমার যত্ন হবে না। আর কি মথুরবাবু আছে যে তোমার যত্ন কোরবে। তুমি এখানেই থাকো।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের ঘরেই আলাদা বিছানা কোরে দিলেন শ্রীমাকে।

শ্রীমা দেখলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে—সতীও একদিন এমনি কোরে শিবের কথা ভেবেছিলেন। শ্রীমা দেখলেন এমন পুরুষাকার পৃথিবীতে কজন আছে। এমন নির্মল অনাবিল আনন্দেব পূর্ণপাত্র নিয়ে যিনি বসে আছেন তাঁর কাছে কি কোন কলংক ঘেঁষতে পারে! যিনি আপন জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ময়, যিনি আপন দ্যুতিতে দ্যুতিময়, যিনি আপন মহিমায় ভাস্বর তাঁর কথা মানুষে কি জানবে মানুষে কি বুঝবে।

মা বোলতেন—সহ্য গুণ বড় গুণ! যে জানে সহ্য কোরতে সে কিছুই গ্রাহ্য করে না।

সারাদিন নহবতে থেকে মা রাতে শুতে আসেন ঠাকুরের ঘরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর মন্দিরেই বেশীর ভাগ সময় থাকেন, আপন মনে আপন ভাবেই তিনি চলেন। তিনি যেন সর্বঐশ্বর্যময়।

কোন কিছুরই তার অভাব নেই। যার হৃদয়ে ভাব আছে তার আবার অভাব কোথায়।

ঠাকুর বোললেন শ্রীমাকে—শরীর এখন কেমন বুঝছো!

মা বলেন—ভবরোগের এক নম্বর বৈদ্যই তো আমাকে দেখছেন আমি কি ভাল না থেকে পারি, রোগেরও তো প্রাণে ভয় আছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ চোখটা বন্ধ কোরলেন—না ডাকলে এ দুনিয়ায় কেউ সাড়া দেয়না। যে ডাকবে ঈশ্বরকে সেই সাড়া পাবে। তুমি ডাকো তাঁকে প্রাণভরে ডাকো, তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন, দেখা দেবেন।

শ্রীমা জবাব দিলেন—জ্যান্ত ঈশ্বর নিয়ে যে ঘর করে তার আবার কোন ঈশ্বরের দরকার—এই তো আমার সব। তুমি কোরছ সাধনা তার ফল তো আমিও কিছু পাবো। সে লাভ কি আমার কম লাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মন্দিরের দিকে চেয়ে বোললেন—তোমার বড় দুঃখ তাই নয়।

—কেনে গো—

তোমার মা বলেন পাড়ার লোকেও বলে শুনেছি যে এমন কপাল মেয়েটার সংসারও কোরতে পারলোনা একটা ছেলেও হোলনা।

একটু থেমে বোললেন ঠাকুর—আমি কিন্তু মন্দিরের ঐ বেটির কাছে শুনেছি। পেটে তুমি না ধরলেও তোমার এত ছেলে হবে যে মা ডাক শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হোয়ে যাবে।

শ্রীমা কোন কথা বলেন না।

শুধু একদৃষ্টে ঐ বিরাট মহীরুহের দিকে চেয়ে থাকেন—এত বড় গাছ যে বেড় দিয়েও ধরা যায় না। চেয়ে চেয়েও চোখ ব্যথা হোয়ে যায়। নাগাল পাওয়া কি এতই সোজা। ভাবের মই চায়। ভক্তির দড়ি চাই। তবে তো পাওয়া যাবে।

ঠাকুর বোললেন—সংসারের বাঁধনে আমি যেন বাধা না পড়ি, আমার যে বড় ভয় করে! তোমাকে হারাই এমন শক্তি আমার

নেই তুমি যে সর্বজয়ী। তোমাকে জয় করতে পারে এতটা শক্তিমান তো আমি নই! তোমার কৃপা না হোলে আমি তো ভেসে যাবো, তলিয়ে যাবো।

শ্রীমা আনত চোখে বোললেন—তোমার সাধন পথে বিঘ্ন হোতে আমি আসিনি সাহায্যই যাতে চিরকাল কোরে যেতে পারি সেই আশীর্বাদই তো তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাই।

একটু থেমে পরে বোললেন—আজো আমাকে তোমার কি মনে হয়, আমার সম্বন্ধে তুমি কি ভাবো?

সারদামণি এগিয়ে এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পায়ের মাথা রেখে প্রণাম কোরলেন। দুইপায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বোললেন—আমাকে তুমি চেনোনা?

রামকৃষ্ণ হাসলেন—তোমাকে আবার চিনি না!

ঠাকুর অন্যমনা হোয়ে গেলেন, বোললেন—তোমাকে চিনিনা! ঐ যে মন্দিরে যিনি আছেন, জয়রামবাটির যিনি সারদা, এখন যিনি আমার পায়ে হাত বোলাচ্ছেন তুমি তো সেই। সবাই জানে তুমি সারদা, জয়রামবাটির রামচন্দ্রর মেয়ে কামারপুকুরের পাগল গদাধরের স্ত্রী কিন্তু আমি জানি তুমিও যা ঐ মন্দিরের ভবতারিণীও সেই! যে আবার সারদা সেই আমার সাক্ষাৎ আনন্দময়ী।

শ্রীমা চোখে তন্দ্রা এলো।

ঠাকুর যেন শক্তি হারালেন।

অনেকক্ষণ পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি দেখলেন শ্রীমা তন্দ্রাঘোরে একেবারে ঠাকুরের কাছাকাছি চলে গেছেন।

চেয়ে চেয়ে দেখলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। কি অপরূপ রূপ সারদার—এই তো সেই। যিনি হিমালয় দুহিতা উমা, যিনি সৃষ্টি রক্ষার্থে দেবাদিদেব মহাদেবের ওপর দণ্ডায়মান, যিনি করালবদনী, বরাভয়দায়িনী, তিনিই তো এই।

পরক্ষণেই তিনি যেন ফিরে আসেন আবার এই মায়ার পৃথিবীতে।

মানুষ এই দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় শকুনীর মত, এই দেহের জন্য মানুষ উন্মাদ। মানুষের লোলজিহ্বা এই দেহের জন্য সব কিছু ভুলে যায়। ধর্মকর্ম, সাধন ভজন, জীবসেবা সব কিছু মানুষের বিস্মরণ হয় শুধু এই দেহের জন্য!

মানুষ আর পশু। পশু আর মানুষ। দুইই সমান, দুজনের দাঁত আছে, আছে বিষের জ্বালা। আছে লোভাতুরকামনা। আছে আত্মনাশের সর্বনাশী নেশা।

রামকৃষ্ণ মনটাকে নিয়ে এলেন সামনে। আপন মনে বোললেন—এই তো লগ্ন উপস্থিত! জীবনের চরম লগ্ন। লাভ, যত খুশী চাও নাও। ঈশ্বর তো দূরের জিনিষ, তাঁকে পেতে হোলে সাধন দরকার। ধৈর্য তিতিক্ষার প্রয়োজন আর কাছের জিনিষ তো পড়েই আছে, এর জন্য তো কোন সাধন-ভজনের প্রয়োজন নেই। তোমার জন্যই তো এর সৃষ্টি, তোমার তৃপ্তির জন্যই তো এর জীবন। নাও গ্রহণ করো, সময় যে চলে যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুহাত প্রসারিত কোরে দিলেন শ্রীমায়ের দিকে—হাত ফিরে এলো। রামকৃষ্ণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন এক জীবন্ত বিগ্রহকে! যিনি তাঁর স্নেহদৃপ্ত বাহু বাড়িয়ে রয়েছেন কোলে তুলে নেবার জন্য। চোখের জলে বুক ভাসছে ঠাকুরের—মা তুই সবই পারিস, কথা রেখেছিস। কতবার বোলেছি মা মা তুই ওর ভিতর থেকে কামভাব দূর কোরে দে—ওর আকর্ষণ যেন আমি ঠেকাতে পারি। ও যদি একবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে তাহালে আমি কি আর থাকবো। ভাল কোরে মা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে ছিল। সহধর্মিণী, সহমল্লিণী, সহকর্মিণী কাকে বলে তুই জগৎকে দেখিয়ে দে, বুঝিয়ে দে যে সহধর্মিণী শুধু স্ত্রী নয়, তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা কোরতে হয়। সংসারে সুখ শান্তি আনতে গেলে তাকে সাধনাও কোরতে হয়। জননী জায়া কন্যা এই তিন রূপেই তো তাঁর আবির্ভাব। এই তিনরূপ একত্রেই তো আত্তাশক্তি মহামায়ার ত্রিবেণীসংগম।

ঠাকুরের ভাব সমাধি হয়!

শ্রীমা তন্দ্রামগ্না। জীবের দুয়ারে জীবন্ত বিগ্রহের শরীর প্রতীক্ষা।

শ্রীমা সবাইকে বলেন—তোদের জ্বালা আমি আর সহ্য কোরতে পারিনে। সংসারে সুখ সুখ কোরেই তোরা মরলি। সংসারে যে কত সুখ তা তোরা বুঝেও বুঝলি না! স্বামীর কাছে কি সুখ তোরা পেলি। পুত্র কন্যার কাছেই বা কি সুখ পেলি? স্বামী তোদের ছিঁড়ে খেলো, পুত্রকন্যা তোদের ফেলে পালালো। জনমভোর কেঁদেই গেলি! হ্যাঁরে কার জন্য কাঁদিস? ওরা তোদের কে? নিতে যারা এসেছিল নিয়ে তারা চলে গেলো। তোদের ছিবড়ে কোরে দিয়ে টান মেরে ফেলে দিল।

একজন বোললে—মা আমাদের কি গতি হবে!

—কি আবার গতি হবে! বার বার এই দুনিয়ায় আসতে হ'বে সকলের খাদ্য হোয়ে—ওরে পথের মোড় ঘোরা। বার বার তো মরছিস একবার বাঁচবার চেষ্টা কর।

শ্রীমার সারা দেহে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা! বোললেন—আমাকে একটু বাতাস কর বড্ড জ্বালা। সবাই বলে বড় কষ্ট, ছেলে মরে গেলো। মেয়ে পুড়ে মরলো—শিয়াল কুকুরের মত শুধু জন্মই দিতে শিখেছে, এতটুকু আত্মসংযম নেই—দিনরাত ওরা নিজের দেহে শুধু নিজেরাই ছুরি চালাছে! ওদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই। মানুষের এই দুঃখ আর চোখে দেখা যায় না। সব পশু। মানুষ কোরবে পাপ, আর দেবতা কোরবে সেই পাপের ভোগ। কিন্তু পাপ ছাড়েনা বাপকে—পাপ আর পারা এ দুটো জিনিষ কেউ কোনদিন হজম কোরতে পারে না। সবাই সব বোঝে, জানে, উপলব্ধি করে। তবুও ঘুরে ফিরে সেই ফাঁদেই আবার পা দেয়, আটক যখন পড়ে তখন ভগবান রক্ষা করো বলে কেঁদে পড়ে।

সাধনপথের একেবারে শেষেই যেন পৌঁছে গেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, এমন সময়ে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক তোতাপুরি এলেন দক্ষিণেশ্বরে, তোতাপুরী বোললেন—যে পথে তুমি পৌঁছেছো সে পথ অনেক দূর

পথ। জগতে যা চিরসত্য তা চিরশাশ্বত যা নিত্য সে পথ তোমার তো এখন সম্পূর্ণ করতলগত। আমি তোমাকে আরও দূর পথ এগিয়ে নিয়ে যাবো। তোমাকে আমি বেদান্ত দর্শন শিক্ষা দেবো।

দুনিয়ার সমস্ত শাস্ত্র যাঁর কণ্ঠে, মহামায়ার নিত্য আশীর্বাদ যাঁর রক্ষাকবচ, ধ্যানধারণা, সাধন-ভজন যাঁর সারা দেহমনে, তাঁকে তোতাপুরী দেবে বেদান্তের শিক্ষা। এ যেন বাঘের কাছে গরু রাখালী দেওয়া। সাকারের যিনি উপাসক তিনি নিরকার ব্রহ্মর উপাসক কি কোরে হবেন, কিন্তু তোতাপুরী ছাড়বেন না।

—তোমায় আমি নির্বিকল্প সমাধি দেবো! ব্রহ্মকে তোমার হাতের মাঝে এনে দেবো। তোমাকে দীক্ষা নিতে হ'বে। তোমাকে একটু কঠিন হোতে হ'বে। উপবীত গংগার বিসর্জন দিতে হ'বে। সাকারের মূর্তি মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হ'বে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এক কঠিন পরীক্ষার পড়লেন।

না, না, তা কি কোরে হয়—যে মা তাঁর পরম ইস্ট, যিনি তাঁর নিত্য শয়নে স্বপনে যিনি তাঁর পিছনে ছায়ার মত ঘুরছেন তাঁকে মুছে ফেলা কি অতই সহজ।

মা নির্দ্দেশ দিলেন তোতাপুরীর আদেশ মান্য কোরতে। গদাধর ধ্যানে বসলেন। মনে মনে কাঁদলেন কত।

পারবোনা আমি, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, সব কিছু ত্যাগ কোরতে পারি কিন্তু মাকে ত্যাগ করি কি কোরে? নাই বা হোল নির্বিকল্প সমাধি, নাই বা হোল বেদান্তকে জানা, নাই বা হোল ব্রহ্মকে জানা, মা যার আছে তার সব আছে। বেদ বেদান্ত সবই তো তাঁর কাছে বাঁধা। যিনি বেদের স্রষ্টা, বেদান্তের ভাষ্যকার, যিনি ব্রহ্মের গুরু তিনি যার সহায় তার আর কোন সাধনার প্রয়োজন নেই।

তোতাপুরী ধমকাচ্ছেন—গদাধর তোমাকে পারতেই হ'বে! মনকে সংযত করো, মহামায়ার মায়ায় তুমি আচ্ছন্ন।

রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হোয়েছেন।

তোতাপুরী 'গদাধর' 'গদাধর' বোলে ডাকছেন।

কোন সাড়া মেলে না।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ কোরলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিনে।

তোতাপুরী দীর্ঘ চল্লিশ বছর সাধনা কোরে তবে নির্বিকল্প সমাধি লাভ কোরেছিলেন!

বেদ-বেদান্ত ব্রহ্ম সব মিলেমিশে একাকার হোয়ে গেলো ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভিতরে।

মা কি ছেলেকে কখনও কারও হাতে ছেড়ে দেয়?

তোতাপুরীর বিদায়ের দিন এসে পড়ে।

দীর্ঘ এগারো মাস তিনি দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন। এবার যাত্রা করতে হবে। গুরুগিরী কোরতে এসেছিলেন, কিন্তু ফিরছেন শিষ্য হোয়ে। এমন গুরু আর এমন শিষ্য পৃথিবীতে কটা মেলে?

তোতাপুরী যাবার সময় বোললেন—গদাধর তুমি আমার গুরু ও শিষ্য। তোমাকে শিক্ষা দিতে এসে নিজেই শিক্ষালাভ কোরে গেলাম। আমার অহংকার চূর্ণ হোয়েছে। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। মন্দিরের ভিতর যিনি আছেন তাঁকে দেখতে চাইনি, জানতে চায়নি কিন্তু তোমার কৃপায় মাতৃদর্শন আমার হোয়েছে। গদাধর তোমার মত শিষ্য পেয়ে তোতাপুরী আজ সব কিছু পেয়েছে। তোমার কৃপায় আমার অমরত্ব লাভ হোল।

একটু থেমে তোতাপুরী বোললেন কাঁদতে কাঁদতে—তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন চায় না, ভেবেছিলাম তোমার চরণতলে বসে শিখবো মাতৃপূজা, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা তা নয় তাই আমাকে চলে যেতে হবে।

গদাধর ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন।

—তুমি কে গদাধর?

ঠাকুরের মুখে কোন কথা নেই।

শুধু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। এত জল কোথা থেকে আসছে? হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বসে কোন এক ভগীরথ বুঝি গংগাকে

আবাহন কোরে এনে ঠাকুরের চোখ দিয়ে তা অর্পণ কোরছেন বিশ্বের কল্যাণে।

তোতাপুরী বোললেন—আমি তোমায় চিনেছি গদাধর। তুমিই তো-কালী করালবদনী, বরাভয়দায়িনী মহামায়া। তুমিই তো ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্র, তুমিই তো যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ। গদাধর তুমি আজ শুধু গদাধর নও, তুমি রামকৃষ্ণ—সাকারও তুমি নিরাকারও তুমি। আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ আ-ভূমি আনত হোয়ে প্রণাম জানালেন তোতাপুরীকে।

শ্রীমা তখন জয়রামবাটিতে, রামকৃষ্ণ শ্রীমাকে ডেকে পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন আর কি ঘরে থাকা যায়।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ আটমাইল, শ্রীমা চলেছেন ঠাকুর সন্দর্শনে। রাতটা আরামবাগে কাটিয়ে ওঁরা পরদিন তেলোভেলোর মাঠ পার হোয়ে তারকেশ্বর পৌঁছাবেন তারপর দক্ষিণেশ্বরের পথ ধরবেন।

শ্রীমার সাথে কয়েকজন সংগী মহাআনন্দে পথ চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা সব সন্ধ্যার আগেই এসে আরামবাগ পৌঁছালেন।

কেউ বোললে—এখানে সময় নষ্ট কোরে কি লাভ, তার চেয়ে একটু জোরে পা চালালেই সন্ধ্যার আগেই অনায়াসে ঐ সর্বনাশা ডাকাতে কালীর তেলোভেলোর মাঠ পার হোয়ে যাওয়া যাবে।

সবাই হাঁটছে কিন্তু শ্রীমা কারও সংগে হেঁটে পারছেন না। সংগীরা ভয়ানক বিরক্ত হোয়ে পড়লো! শেষকালে একজনের জন্য কি সবাই ঐ তেলোভেলোর মাঠে ডাকাতের হাতে প্রাণ দেবে নাকি!

মা বোললেন—তোমরা সব জোরে পা চালিয়ে চলে যাও। আমি কাল সকালে তারকেশ্বরে তোমাদের খুঁজে নেবো। আমার জন্য কেউ ভেবো না গো। আমি ঠিক পৌঁছে যাবো।

সত্যিই তো যিনি যুগে যুগে কালে কালে একাই পথ চলছেন।

যিনি বিশ্বের সবাইকে অন্ধকারে পথ দেখাচ্ছেন তাঁর আবার ভাবনা কিসের। তিনি নিজেই তো আলো, নিজেই অন্ধকার, নিজেই জ্যোতির্ম্ময়ী।

সবাই এগিয়ে গেলেন।

মা চলেছেন একা একা ক্লান্ত পদবিক্ষেপে! সন্ধ্যা নামে। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত ধূ ধূ করা মাঠ। ভয়ঙ্করী ডাকাতে কালীর মাঠ। শুনলে প্রাণ কাঁপে! কত নিষ্পাপ জীবন যে এখানে শেষ হোয়েছে তার হিসাব নেই! শ্রীমা চলেছেন—পথ ফুরায় না, তবুও তো যেতে হ'বে। ঠাকুর যে ডেকেছেন। অন্ধকার ঠেলে ঠেলে চলেছেন মা। বহুদূরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়।

এত রাতে কে যায়!

অন্ধকারের বুক চিরে সে হুংকার যেন মাঠময় ঘুরে বেড়ায়।

কে আবার যায়। তোমার মেয়ে গো, সারদা।

বাগদী ডাকাত এগিয়ে এসে দেখলো যেন শ্যামা মায়ের রূপ। থমকে দাঁড়ালো সে। মুখে কোন কথা নেই। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো বাগদী ডাকাত—আমার মেয়ে গো, এ আবার কেমন কথা।

শ্রীমা বোললেন, হ্যাঁ বাবা আমি তোমার মেয়ে সারদা!

এত রাতে কোথায় চলেছো গো, তোমার কি ভয় ডর নেই।

শ্রীমা হাসলেন—আমি জানতাম গো, যে আমার বাবাই তো আসবে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

বাগদী ডাকাত বিস্ময়ে অভিভূত হোয়ে পড়ে। মেয়ে যখন বলেছে তখন হবেও বা! এ জন্মের না হোক অন্য কোন জন্মের হবে বোধহয়। তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি আমি, এ কি ভয়ানক যায়গা তুমি কি জানো?

সব জানি গো! বাবা থাকতে যদি মেয়ের কোন বিপদ হয় তাহালে কি দুনিয়া থাকবে গো। আসতাম না গো, নেহাৎ তোমার জামাই যে দক্ষিণেশ্বর থেকে ডেকে পাঠিয়েছে।

সাপের মাথায় যেন ওষুধ পড়েছে।

বাগদী ডাকাত কেঁচোর মত হোয়ে গেছে।

অন্ধকারে কার সাথে কথা বলো গো! নারী কণ্ঠের একটা শব্দ শোনা যায়।

ডাকাত গিন্নী সামনে এসে বল্লে, ও মা এ কে গো, এ যে দুগ্‌গা প্রতিমে।

না মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা!

তোর মত মেয়ে পাবো এ আমার সাত জন্মের ভাগ্যি। সারদাকে ডাকাত গিন্না দেখছে একদৃষ্টে—নিশ্চয়ই কোন দেবতা তাকে ভুলাতে এসেছে। ঐ যে কালীকে ডাকাতরা পূজো করে, ওর নাকের মতই তো এর নাক, চোখ দুটোও যেন সেই চোখ। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাচ্ছো গো?

কেন গো তোমার জামাইয়ের কাছে সেই দক্ষিণেশ্বরে, আমায় তোমরা তারকেশ্বর পৌঁছে দাও সেখানে আমার সংগীরা আছে।

তাই হবে মা! মার কাছে যখন এসেছিস তখন তোকে সহজে ছাড়ছি নে—মেয়ে মেয়ে কোরে কত কাঁদলাম, কালী তো আমার কথা শুনলো না।

এই তো শুনলো, এইবার মেয়েতো পেলে।

ডাকাত বৌ একবার ধমক দিলে ডাকাত সদারকে। তোমার কি আক্কেল গো! মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গেছে, আহা! বাছা আমার কি কষ্টই না পেয়েছে—চলো ওকে দুটো কিছু খেতে দিই।

দুজন সাকরেদ ইতিমধ্যে এসে সর্দারকে নালিশ জানালো, জানো সর্দার এ মেয়েটা যা তা মেয়ে নয় ভারী ধড়িবাজ, সারামাঠ আমরা ওর পিছন পিছন ছুটেছি কিছুতেই কি ধরতে পারি। অন্ধকারেও ওর যেন চোখ জ্বলে, কোথা দিয়ে যে পালায় কিছুই বুঝতে পারিনে।

সর্দার বোললে হাসতে হাসতে, তারপর!

জানো সর্দার, খুব বাঁচা বেঁচে গেছে মেয়েটা আর একটু হোলে এই সড়কীর ঘায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হোয়ে যেতো।

বলিস কি রে! আমি তো ভাবছি তোরা দুজন আজ প্রাণে বেঁচে গেছিস!

একটু থেমে পরে হেসে বোললে, ওর হাতের খাঁড়ায় আজ যে তোরা দুজনই একই সংগে বলি হোয়ে যাসনি এই রক্ষে।

সে কি সর্দার, ওর হাতে আবার খাঁড়া আছে নাকি?

আছে বইকি, দুষ্টের দমন করার জন্যই তো ও খাঁড়া হাতে নিয়েছে। ওকি যেসে ধড়িবাজ মেয়ে। ভেলকী দিয়েই তো ও জগৎ নাচাচ্ছে। ওকি আর যেসে মেয়েরে যে ওকে ধরতে পারবি। ওকে ধরতে হোলে যা অস্ত্র দরকার তা কোথায় পাবি। সড়কী আর বল্লমে ওকে গাঁথা যায় না, ওকে গাঁথতে হোলে ভক্তির সড়কী চাই, শ্রদ্ধার বল্লম চাই রে। বুঝলি রে—ও যে মা, শুধু আমার তোর মা না রে, ও যে সারা বিশ্বের মা! ফেলে দে সড়কী বল্লম দূর কোরে। একটু পায়ের ধূলো চোখে মুখে লাগা। এ পাপ জনম উদ্ধার হোয়ে যাবি রে।

শ্রীমা যেন ধ্যানস্থ!

দুই হাত প্রসারিত কোরে তিনি যেন সন্তানদের আশীর্বাদ কোরছেন।

এপারের খেলা বুঝি ধীরে ধীরে শেষ হোয়ে আসছে। ঠাকুরের গলার ঘা কমাতো দূরের কথা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ঠাকুর বলেন—মানুষের কত যে ব্যাধি, কত যে ভোগ সব এসে যেন বাসা বেঁধেছে এই দেহে!

শ্রীমা দিনরাত সেবা কোরছেন। আর মাঝে মাঝে বলেন—জীবের পাপ সব ধারণ কোরেছেন ঠাকুর তাই এ ব্যাধি!

ঠাকুর বলেন—তোমার মনে বড় দুঃখ তাই নয় গো!

মা হাসেন, কে বলে আমার মনে দুঃখ আমার মত রাজরাজেশ্বরী আর কজন আছে।

সব বুঝি গো! মেয়েমানুষ হোয়ে মা হোতে পারলে না এ দুঃখ

তোমার এ জীবনে যাবে না। দেখলে তো সংসার কি? তোমারও তো কত ভাইবোন, কি সুখ তাতো সবই দেখলে। যারা নেই তাদের জন্য কাঁদছো আবার যারা আছে তাদের জন্যও কাঁদছো। সুখটা কি আছে।

শ্রীমা বলেন—অত কথা বলছ কেন, শরীর তোম'র ভাল নয়।

তা হোক! সময় যদি আর না পাই!

মা গম্ভীর হোয়ে বলেন আমার মা তো প্রায়ই বলতেন, এমন পাগল জামাইয়ের হাতে মেয়েটাকে দিলুম, মেয়েটা ঘরও কোরতে পারলো না। আমি মাকে জবাব দিতাম—পার্বতীও তো এমন পাগলের হাতে পড়েছিল তাতে কি তার সুখ ছিল না—জন্ম জন্ম যেন এমন পাগল স্বামীই আমার হয়।

ঠাকুর যেন ধ্যানস্থ হন। বলেন, যুগে যুগেই তো তোমার একই অবস্থা হোয়েছে, ভুলে গেলে সব। আর কোন কথা বলেন না।

কত জন আসে দুঃখের পসরা মাথায় নিয়ে মার কাছে। মার কাছে এসে যেন বোঝা নামিয়ে দিয়ে শান্তি পায়। কেউ বলে—মা বড় দুঃখ, কত ডাকছি ভগবানকে, কই তিনি তো সাড়া দেন না।

মা বলেন—দুঃখ পেলে এত ভেঙে পড়ো কেন। সুখ দুঃখ তো তাঁরই দান। দুঃখ না পেলে মানুষ কি সুখ পায়। সহ্য গুণ বড় গুণ। এ গুণ যার আছে তার আবার দুঃখ কি। তাছাড়া বোলতে পারো কে দুঃখ পায়নি? দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণর জন্য দুঃখ পেয়েছে শ্রীরাধিকা। ত্রেতাযুগে সীতা তো জনম দুঃখিনী। কলিতে বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদেছে। পৌরাণিক যুগে কেঁদেছে বেহুলা, কেঁদেছে সাবিত্রী। সবাই দুঃখ পেয়েছে। সবাইকে কাঁদতে হোয়েছে। চোখের জলেই তো সকলের অগ্নিপরীক্ষা।

আর ঠাকুর? তিনিও তো কাঁদাচ্ছেন শ্রীমাকে! কেউ কোনদিন বাদ যায়নি, বাদ যাবেও না।

ঠাকুরের শেষ দিন বুঝি ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে। নরেনকে

বলেন—নরেন আমার যা ছিল সবই তো তোকে দিলাম। আমি কিন্তু শূন্য হোলাম। জগতের মানুষের যেন কল্যাণ হয়।

শ্রীমা অন্তরালে চোখের জল ফেলেন।

ঠাকুরের চিকিৎসা কোরছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি সব সময় ঠাকুরের কাছে রয়েছেন।

ঠাকুর বলেন—ডাক্তার এবার আমায় ছাড়ো আর কেন!

মহেন্দ্র সরকার জবাব দেন—আপনি ভালো হোয়ে উঠবেন।

ঠাকুর হাসেন—ডাক্তারদের আশ্বাস দেওয়া একটা অভ্যাস! এ সংসারের সবচেয়ে বড় ডাক্তার যিনি তিনি যে আমার শিয়রে এসে বসে আছেন! তাঁরই তো ইচ্ছে নয় যে আমি থাকি।

শ্রীমা ঠাকুরের গলায় হাত বোলাচ্ছেন।

শুনছো গো! কত ছেলেমেয়ে তোমার, তাদের সব অপরাধ ক্ষমা কোরে তুমি তাদের কোলে তুলে নিও! ভুলো না যেন যে, তুমি তাদের সকলের মা।

আমি কি পারবো?

পারবে বই কি। আমার চেয়েও বেশী কাজ তোমাকে কোরতে হ'বে। নরেন রইল, ওর শক্তি অনেক। ভাবনা কি!

নরেন বসে আছে ঠাকুরের পাশে। কি যেন ভাবছে সে!

ঠাকুর বোললেন—তোর এখনও অবিশ্বাস, কতবার কত ভাবে তোকে দেখালাম! ওরে যে রাম সেই কৃষ্ণ আবার সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর হঠাৎ সমাধিস্থ হোলেন।

সেদিন ১২৯৩ সালের ১লা ভাদ্র সোমবার।

ঠাকুরের এ মহাসমাধি আর ভাঙলো না।

ভগবান রামকৃষ্ণ মানবদেহের লীলা সংবরণ কোরলেন।

কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হল। চিতাভস্ম নিয়ে আসা হোল বাগান বাড়িতে।

সংস্কার কুলাচার অনুযায়ী মা সাদা কাপড় পরলেন। শ্রীমার

গায়ে যা গয়না ছিল তা সবই খোলা ছিল। এবার হাতের শাঁখা ও কংকন খুলে ফেলতে হ'বে, সিঁথির সিঁন্দুরও মুছে ফেলতে হবে। হাতের বালা খুলতে যাবেন এমন সময় ঠাকুর এসে হাত চেপে ধরলেন শ্রীমার, বোললেন—এ কি কোরছ! আমি কি সত্যি সত্যিই মরেছি যে, তুমি এসব খুলে ফেলছো। আমি কি কোথায়ও গেছি। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘর। মানুষের জীবনমরণও তো তাই। এ ঘর থেকে ও ঘর, মাঝখানে শুধু একটা দেওয়াল। মানুষ তো বেশীদূর যায় না। শুধু এপার থেকে ওপার—মাঝখানে একটু মাত্র ব্যবধান। দেখার মত চোখ থাকলে সবই দেখা যায়। শোনার মত কান থাকলে সবই শোনা যায়।

শ্রীমা দেখলেন তেমনি ধারা সুন্দর স্বাস্থ্য ঠাকুরের। শ্রীমা কি কখনও বিধবা হোতে পারেন? জগৎস্বামী যাঁর স্বামী তিনি তো চিরসধবা।

বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের নিত্যপূজার ব্যবস্থা হোল। শ্রীমার মনে শান্তি নেই। কত ভক্ত আসে। মাকে একথা ওকথা বোলে বিরক্ত করে। মা যেন নির্বিকার।

তীর্থদর্শনে গেলে মায়ের মন ভালো হ'বে ভেবে বলরাম বাবু মাকে বৃন্দাবনে নিয়ে গেলেন।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীমার শোক যেন দ্বিগুণ হোয়ে ওঠে।

ঠাকুর একদিন দেখা দিলেন। বোললেন—তোমরা কাঁদছো কেন? আমি তো তোমাদের ছেড়ে যাইনি। তোমরা কিছু ভেবোনা। আমি তোমাদের মাঝেই আছি।

মা বলেন সবাইকে—ঠাকুরকে ডাকতে গেলে মন্তর দরকার নেই। শুধু মনে কোরলেই তিনি দেখা দেবেন। জপতপই বা কি দরকার। মনপ্রাণ একহোয়ে গেলেই তিনি সামনে এসে দাঁড়াবেন। শুধু পুঁথিপত্র মুখস্থ কোরে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না।

মা আজকাল শুধু কাঁদছেন। মার চোখ সর্বক্ষণ জলে ভরে থাকে। সেই চোখের জলে ঠাকুরের নিত্যপূজা হয়।

রামকৃষ্ণ দেখা দিলেন যোগেন মাকে, বোললেন—কতবার আর বোলব তোমাদের যে আমি বেশীদূর যাইনি! তোমাদের মাঝে সর্বত্রই তো আমি রয়েছি। তবে তোমরা কাঁদো কেন?

শ্রীমা মাঝে মাঝে আশ্বস্ত হন আবার মাঝে মাঝে ভেঙে পড়েন।

কামারপুকুরে এলেন মা। হাজার হোলেও স্বামীর ভিটে, একেবারে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু থাকা বুঝি আর বেশীদিন হয় না। গ্রামের লোকের কি দৃষ্টি আছে মাকে দেখবার না হৃদয় আছে মাকে বোঝবার।

কেউ কেউ বোললে—এ আবার কোন্‌দেশী বিধবা! পরনে শাড়ী, হাতে চুড়ী, পাগলের বৌ তো পাগলীই হয়।

মা মনে মনে ঠিক করেন, এখানে থেকে আর কি হ'বে! ঠাকুরের নিন্দে যেখানে সেখানে তিনি কি কোরে থাকতে পারেন তাছাড়া যে দেশে গংগা নেই সে দেশের মানুষের এ ধরণের মতি গতি তো হবেই।

মায়ের মন চঞ্চল হয় গংগাস্নানের জন্য।

একদিন দেখেন ঠাকুর এসে তাঁর উঠানে দাঁড়িয়েছেন আর তাঁর পা দিয়ে অবিরত ধারায় গংগার জলধারা বয়ে চলেছে।

মা তাড়াতাড়ি কতকগুলো জবাফুল এনে ছিটিয়ে দিলেন সেই গংগায়। কামারপুকুরে মায়ের বড় কষ্ট। সবাই বলে—এত কষ্ট তোমার কপালে ছিল। মা বাধা দিয়ে বলেন—না, না, ও কথা তোমরা বোলনা! তাঁর নাম কোরলে কোন কষ্ট থাকে না। তাঁকে মনে মনে ডাকলে কোন দুঃখ থাকে না। তিনি যে মানুষের কষ্ট দেখলে থাকতে পারেন না। আমিও তাই তাঁর নাম নিয়ে মহাসুখে আছি। এখানকার এই শাক-অন্নই যে আমার মহাপ্রসাদ! শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যু হোল। জয়রামবাটির সংসারের নড়বড়ে পায়াগুলো একসাথে ভেঙে পড়লো। ভাইয়েরা যে যার মত হবার চেষ্টা কোরল, বৌরা ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল।

শ্রীমা এলেন এদের সংসারে। যদি এদের মিল কোরে দিতে পারেন। শ্রীমা একেবারে নিঃস্ব হননি। চারিদিকে এখন ভক্তসন্তানের

দল। কেউ টাকা পাঠাচ্ছে কেউবা সিধে পাঠাচ্ছে। মার আবার ভাবনা কবে হয়! মা তো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণা।

দিদির কাছ থেকে টাকাটা পয়সাটা পাওয়ার লোভে ভাইরা কেউ কেউ বলে—দিদি তুই আছিস, তুই দেখছিস, তাই আমরাও আছি। এ বিপদে তুই যদি না থাকতিস তাহলে হয়তো কবে ভেসে যেতাম। তোর মত বোন পাওয়া ভাগ্যের দরকার। জন্ম জন্ম যেন তোকে আমরা বোন হিসেবেই পাই। পরজন্ম বোলে যদি কিছু থাকে আর মানুষ হোয়ে যদি আসিস তাহলে বোন হোয়েই যেন আমাদের ঘরে আসিস।

মা বিরক্ত হোয়ে বলেন—আর এসে কাজ নেই, খুব শিক্ষা হোয়েছে। বাবা আর মা দুইজনই ছিলেন দেবতুল্য তাই ভাগ্যগুণে তাঁদের মেয়ে হোয়ে এসেছিলাম। আর নয় খুব সখ মিটেছে। মনে ভাবেন এরা কি একটাও মানুষ? না মানুষ হবার চেষ্টা কোরল; শুধু খাওয়াপরা আর সুখ ভোগ। ঐশ্বর্যের কাঙাল এরা। এদের পরমার্থ হল—অর্থ আর অর্থ। এদের কাছে ঈশ্বর কোথায়? সব টাকা পয়সার ভিতর দিয়ে চচ্চড়ি হোয়ে গেছে। একবার কি এরা ভাবে ঈশ্বরের কথা? জ্ঞান ভক্তি প্রেম এসব পথের সন্ধান কি এরা একবারও করেছে? শুধু জগতের মূল স্বার্থের জন্য এরা জন্মেছে। আর এই স্বার্থের আগুনেই এরা পঙ্গপালের মতো পুড়ে মরবে।

মায়ের শরীরের অবস্থা দেখে ভক্তরা চিন্তিত হোয়ে পড়লো মাকে একরকম জোর কোরেই কোলকাতা নিয়ে এলো। কোলকাতায় এসে বলরাম বাবুর বাড়ীতে উঠলেন শ্রীমা। মা এখানে আশার পর ঘন ঘন সমাধি হোতে থাকে। একদিন বাড়ীর ছাদেই সমাধিস্থ হোয়ে পড়লেন। সমাধি ভাঙার পর বোললেন—বেশ ছিলাম এতক্ষণ ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর রয়েছেন আমার পাশে এর চেয়ে আনন্দ আমার কি আছে! এই দেহের ভিতর যেতে আর আমার ইচ্ছে হয় না।

একজন বোললে—মা আপনি ও কথা বোললে আমরা বাঁচি কি কোরে!

—ঠাকুরকে ডাকো। তোমাদের জন্য তাঁর ঘুম নেই! সংসারে এই পরিবেশ তোমাদের আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে—এর হাত থেকে কিসে মুক্তি পাও তার ব্যবস্থা ঠাকুরেরই জানা আছে। তাঁকে ডাকো। মহামায়ার খেলা বোঝে মানুষের কি সাধ্য! মানুষের কি কোন হুঁশ আছে—এত ঐশ্বর্য, এত বিষয়—এইসব নিয়েই তো দিন কাটছে! অথচ যে এসব দিলে, যার দয়ায় এসব পেলে তাঁর কি কেউ খোঁজ করছে? ওরে ডাক এলে তো যেতেই হবে। সেদিন কি কোরবি! জন্মেছিস যখন তখন মৃত্যু অবধারিত তা জেনেও শুধু জমাচ্ছিস। এ দুনিয়ায় এ ছাড়া যে কত কি যে আছে তা কি এরা জানে। ঐশ্বর্য বৈভবের জন্য সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত লোককে ফাঁকি দিচ্ছে। কত লোককে কাঁদাচ্ছে—অথচ দেখছোনা দুনিয়ায় সমস্ত ঐশ্বর্য জমা হোয়ে রয়েছে ঐ মহামায়ার রাঙা চরণে। তিনি তো দেবার জন্যই বসে আছেন—কই কেউ তো তা নিতে পারছেনা।

একটু থেমে বোললেন মা—ঠাকুর তো ঐশ্বর্য ভোগ কোরবার জন্য সবাইকে ডাকছেন। কেউ কি যাচ্ছে, নরেন গিয়েছে পেয়েছে? গিরিশ পেয়েছে, সাধু নাগ মশায় পেয়েছে। ঘরে বসে থাকলে কেউ কি খাবার মুখের কাছে এনে দেয়? মা মা, কোরে ডাকতে ডাকতে হবে তবেই তো পাওয়া যাবে।

মায়ের মন যেন একযায়গায় আর থাকতে চায় না। মা শ্রীক্ষেত্র গেলেন—সংগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, যোগীন মা। রেলপথ তখনও হয়নি। জাহাজ ষ্টীমার ও হাঁটাপথ দিয়ে মা পৌঁছালেন শ্রীক্ষেত্রে। একে শরীর রুগ্ন তার ওপর এত ধকল সইবে কেন! মা অবার অসুস্থ হোয়ে পড়লেন।

কয়েক দিন পর একটু সুস্থ হোলেন মা। সবাইকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। দর্শন করার পর মা বোললেন—জগন্নাথ দর্শন আমার হোল না। দেখলাম ঠাকুর বসে আছেন, জগন্নাথের আসনে। আর পাশে বসে আমি আছি। দাসীর মত তাঁর সেবা কোরছি।

মা পুরীতে এসে অসুস্থ হোয়ে পড়লেন। মা যার আছে তার সব আছে। তাই সংগীরা ধৈর্য হারায় না। সবাই তাঁর সেবা করে। ভাবে মা তো আছেন তবে আর কি!

মা যদি সংসারে না থাকতেন তাহলে এত স্নেহ, এত মায়া, এত দয়া কোথায় থাকতো। সংসার তাঁকে চায়নি কিন্তু তিনি সংসারকে আগলে রইলেন। সংসারের সব দুঃখ জ্বালা রোগ ভোগ তিনি আপন মনে নিজের ঘাড়েই তুলে নিলেন। তিনি তো অনায়াসে সব কিছু ছেড়ে কঠোর তপস্যায় বসতে পারতেন জংগলে পাহাড়ে। তা তিনি করলেন না—সংসারে থেকে সব কিছু শোক তাপের আগুনে জ্বলে তিনি সবাইকে নিয়েই সাধনা করে চলেছেন। এ কি সবার পক্ষে সম্ভব। না কি কেউ পেরেছে? নিমাই পরমার্থ লাভের জন্য সংসার ত্যাগ কোরেছিল, বুদ্ধদেবও সংসার ত্যাগ কোরেছিলেন কিন্তু ভগবান রামকৃষ্ণ সব কিছুর মধ্যে থেকে কাউকে ত্যাগ না কোরে যে তপস্যা কোরে গেলেন সে সাধনা কোন সাধক কি কোরতে পেরেছেন!

শ্রীমা সেই তাঁরই উত্তর সাধিকা।

মা বোললেন রোগশয্যায় শুয়ে—আমার এ রোগ শুধু রোগ নয়। এ আমার সুখ ভোগ! আমি শুয়ে শুয়ে ঠাকুরকে ডাকছি। তাঁকে স্মরণ কোরছি। চলে ফিরে বেড়ালে বা অন্য কাজে মেতে থাকলে তো আমি পারতাম না। রোগ মানুষকে শুধু ভোগায় না, শান্তিও দেয়।

সে শান্তি ঈশ্বরকে ডাকার শান্তি, সে শান্তি ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের শান্তি—আমাকে আরোগ্য কোরে দাও! তুমি যে ভববৈদ্য।

মা তখন জয়রাম বাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় এসেছেন। একা একাই যতদূর পারেন যোগাড় কোরছেন। এমন সময় দেশড়া গ্রাম থেকে হরিদাস বৈরাগী এলো হাতে তার একতারা। মা তাকে আদর যত্ন কোরে বসালেন।

হরিদাস বোললে—কতদিন থেকে আশা কোরে আছি তোমার

চরণ দর্শন কোরব তা ভাগ্যে আর হোয়ে ওঠে না শুনলাম তুমি পূজোতে এসেছো মা, তাই আমি এলাম মা—একটু আশীর্বাদ করো মা যেন এ ভব যন্ত্রণা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাই।

মা হেসে বলেন—সে কি গো! সবই ঠাকুরের ইচ্ছে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও, আমার কাছে কেন।

হর-গৌরী কি আলাদা? রাম-সীতা কি আলাদা?

না গো আমি অত বড় নই! আমি যে ঠাকুরের দাসী।

তাই তো শ্রীরাধাও তো ঐ কথাই বোলতেন—তুমি যে কি তা কি আর আমি জানি না।

একতারা বাজিয়ে গান ধরলো বৈরাগী হরিদাস—

কি আনন্দের কথা উমে
ওমা লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী।
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি।
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
বিশ্বেশ্বরী, তুই কি বিশ্বেশ্বর ধামে।
ক্ষেপা ক্ষেপা আমায় বলতো দিগম্বরে।
গঞ্জনা সহেছি কত ঘরে পরে।
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরে দ্বারে।
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
হিমালয় বাস পার কোরেছে
ভিক্ষা কোরে দিন মানে কেটেছে।
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হোয়েছে।
ফিরেছে কি কপাল তোর ভাগ্যক্রমে।

এ যেন শ্যামাসুন্দরীর কথা, মেনকার কথা নয়। তখন সবাই জামাইকে পাগল বোলত। কত নিন্দামন্দ শুনতে হোয়েছে শ্যামাসুন্দরী আর সারদামণিকে।

ঠাকুর বোলতেন—লোক না পোক ! এরা শুধু কিলবিল কোরতেই জানে। নিজেদের নড়বার কোন শক্তি নেই।

যারা সার না বুঝেছে তাদের তো শুধু অসার নিয়ে হৈ চৈ কোরতেই হবে !

ব্যথা যারা দিয়েছে তারাই আজ সারদামণিকে দেবী জ্ঞানে পূজো কোরছে। দুঃখ পেলেই ছুটে আসছে মায়ের কাছে।

মা সবাইকেই সমান ভাবেই গ্রহণ করেন। কাউকেই ফেরান না। সন্তান হাজার দোষ কোরলেও মায়ের কাছে সে নিষ্পাপ নিরপরাধ ! মা যে সর্বংসহা ধারত্রীর মত। পাপের বীজ তাও মা গ্রহণ কোরছেন আবার পূণ্যের বীজ তাও মা গ্রহণ কোরছেন।

তোমরা সবাইকেই আমার কাছে আসতে দিও ! কাউকেও ফিরিও না ! আহা কত কষ্ট ওদের। সংসারের জ্বালা সহ্য না কোরতে পেরেই তো আমার কাছে আসে। আমি যে মা, কাকে রাখি আর কাকে দেখি—সব যে আমার কাছে সমান। আমি জানি কত রকম পাপী আসে আমার কাছে। তা আসুক সবাই যে আমার সন্তান।

একটু থেমে বলেন—ঠাকুর পেয়েছিলেন বড় বড় ভক্ত ! আমার যত গরীব --গরীবের মা যে আমি।

মা যেন দিন দিন আর শরীরটাকে টেনে নিয়ে বেড়াতে পারেন না।

ভক্তরা বলে—মা আর কাউকে দিতে পারবেন না ! যত ব্যাধি সব আপনার দেহে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

মা জবাব দেন—সে কি বাবা ! ঠাকুর জীবন ভোর সকলের ব্যাধি কণ্ঠলগ্ন কোরেছেন—সবাইকে তিনি নিরাময় কোরে গেছেন। আর আমার ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নেবার সময় এসেছে আজ কি আমার ও কথা বলা সাজে। সবাই সুস্থ থেকে সৎপথে চলুক এই কামনা আমি শেষ দিন পর্যন্ত কোরে যাবো তাতে যদি সারা বিশ্বের সকলের ব্যাধি আমাকে বহন কোরতে হয় তাতেও আমি রাজী।

সবাই যদি মহামায়ার চরণাশ্রিত হয় তাহালে এ দেহ আমি এখনই ত্যাগ কোরতে পারি।

মা আজকাল ভুগে ভুগে কেমন যেন হোয়েছেন। সব সময় কি যেন একটা কষ্ট শরীরে অনুভব করেন। কখনও মাথায় জল ঢালছেন কখনও বোলছেন—বাতাসে আমি যে জ্বলে পুড়ে ছাই হোয়ে গেলাম। ঠাকুরের ছায়ায় থেকে কত লোক মুক্তি পেয়ে গেলো। আর আমি সেই পাঁচ বছর বয়সে তাঁর চরণ ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি কিন্তু আমার মুক্তি হোল কই? এমন মায়ায় তিনি আমাকে জড়িয়ে গেলেন কেন! কত পাপ আমি কোরেছি তা কে জানে? এ যন্ত্রণার হাত থেকে কবে ঠাকুর আমাকে মুক্তি দেবেন তা তিনিই জানেন!

মায়ের কাছে লোক আসার যেন বিরাম নেই। ভোগীও আসছে যোগীও আসছে। সবারই যেন সমান অধিকার। কে একজন এসেছে মায়ের কাছে—তার ছেলেটা মারা গেছে। চোখের জলে তার বুক ভাসছে।

মাও কাঁদছেন। মা বোললেন—মহামায়ার খেলা বোঝা ভার! নিজেও কাঁদছেন অপরকেও কাঁদাচ্ছেন। সংসার পাতছেন তিনি গুটিয়েও নিচ্ছেন তিনি। কি কোরে বুঝবে মা! ছেলে পেটে ধরছো তুমি কিন্তু লালন পালন কোরেছেন তিনি। এবার ছেলে তোমার কোল থেকে তাঁর কোলে গেছে। মা ও ছেলে তোমার কাছে পোষ্য রেখেছিল গো! কেঁদোনা যার জিনিষ সে নিয়েছে বইতো আর কিছু নয়। ঠাকুরকে ডাকো, তিনিই তোমায় শান্তির পথ দেখাবেন।

আস্তে আস্তে শ্রীমা ধ্যানস্থ হোলেন। চোখে তার জলের ধারা। মা হোলেই কাঁদতেই হয়।

শ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোজ্জ্যের বাড়ী পঞ্চতপায় বসেছেন।

পঞ্চতপা একধরণের তপস্যা। প্রখর রোদে চারিদিকে আগুন জ্বেলে সাধনা করার নাম পঞ্চতপা।

পঞ্চতপা শেষ কোরে তিনি খেতে বসেছেন। এমন সময় কুমিল্লার

সাধু নাগমশাই এসে হাজির। তিনি মায়ের দর্শন না পেয়ে শুধু দোরের চৌকাঠে কপাল ঠুকে যাচ্ছেন।

লোকটা যেন একটা আস্ত পাগল!

মা বোললেন—নাগমশাই ঠাকুরের একজন পরম ভক্ত। এখানে তাঁকে আসতে বলো।

নাগমশাই এসে 'মা' 'মা' বোলে আছড়ে পড়লেন মায়ের পায়ের ওপর। কপালটা ফুলে উঠেছে।

মা নিজের পাত থেকে দুটো সন্দেশ তাঁর মুখে পুরে দিলেন।

সাধু নাগমশায় তখনও 'মা' 'মা' বোলেই চললেন।

মা বোললেন—তোমরা ওকে একটু বাতাস কর। ওর যেন মনে হোচ্ছে জ্ঞান নেই।

সাধু নাগমশাই ঠাকুরের কৃপালব্ধ একজন মহান ভক্ত।

একবার বারুণীর গংগাস্নানের সময় দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আসবার কথা। একধারে ঠাকুর দর্শন ও গংগাস্নান দুই হবে। মনের আনন্দে তিনি দিন গুণছেন। কিন্তু অন্তরায় হোল তাঁর হঠাৎ অসুস্থতা। গংগাস্নানের আগের দিন তিনি ঘুমোতে পারলেন না, শুধু 'মা 'মা' বোলে কাঁদছেন আর বোলছেন—মহাপাপী আমি তাই গংগাস্নান আমার হোল না। এ দেহ চলে যাওয়াই ভালো। যে দেহ কোন পূণ্য কাজে লাগলো না সে দেহ কি প্রয়োজন। সারারাত তিনি কাঁদলেন। চোখের জলে ভিজে ভিজে রাত শেষ হোল। সকালবেলায় দেখা গেলো নাগ মশায়ের উঠান ভেদ কোরে মা গংগা তার অফুরন্ত জলধারায় ভরিয়ে দিচ্ছেন সমস্ত উঠান। নাগ মশাইকে ধরে এনে সেই গংগাজলে স্নান করানো হোল।

মা বোললেন—দেবদেবীরা তো মানুষের কাছে বাঁধা—ভক্ত প্রহ্লাদ থামের ভিতর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়েছিলেন। ভক্ত ধ্রুব হিংস্রশ্বাপদ বেষ্টিত হোয়েও রক্ষা পেয়েছিলেন। সব আছে আজও। চোখ দিয়ে দেখ। হৃদয় দিয়ে অনুভব কর। একাগ্রতা নিয়ে নিয়ে স্মরণ করো মিলবে

ঠিকই। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীচৈতন্য। সর্বানন্দ সবাই তো তোমার আমার মত মানুষ ছিল—ডাকার গুণে তাঁরা পেয়ে গেলো ভগবত দর্শন। ঠাকুরকেও তো দেখলে।

মা থামলেন।

সাধু নাগমশাই তখনও বাইরে বসে 'মা 'মা' কোরছেন।

ঠাকুর যেমন ভক্তও তেমন।

ভগবানের কৃপা কখন যে কি ভাবে কার ভিতর আসে তা কে বোলতে পারে। হঠাৎ যখন এসে বোসলো তখন জোয়ারের জলের মত এসে যায়। ভগবানের কৃপা ছাড়া তো ভগবানকে পাওয়া যায় না।

সংসারে থেকে মায়ার খোলশ গায়ে জড়িয়ে আর কতদিন কাটাবে। হায়রে মানুষ! বন্ধনের পর বন্ধন তারপর আবার বন্ধন। মুক্ত হবার পথ কে খোঁজে? ঘসে ঘসে বাঁধন কাটতে না পারো, দাঁত দিয়ে কাটো। ঈশ্বরকে না ডাকলে তাতে তাঁর কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। শুধু তুমিই ফাঁকে পড়লে। তিনি তো তোমার ডাক শোনার জন্য তৈরী হোয়েই আছেন।

একবার ডাকো। প্রাণমন খুলে ডাকো। ক্ষিধে পেলে যেমন মা মা করো! ভয় পেলে যেমন মা মা করো! তেমনি সময় পেলে এমনিই ডাকোনা। ভাবছো মহাপাপী তুমি ঈশ্বরকে ডাকবে কি কোরে। যদি তিনি ডাক শুনে আসেন তাহলে তাঁকে বসাবে কোথায়? কলিতে দেহের পাপই পাপ। মনের কোন পাপ নেই। মন যদি তোমার খোলা থাকে। মনের বলে যদি তোমার একটি আকুলতার পদ্ম ফোটে তাহলে সেই পদ্মাসনে এসে বসবেন তিনি। দেহের পংকিলতা তাকে স্পর্শ কোরবে কি কোরে। মন তো তখন অনেক দূরে। একবার যদি তাঁর ওপর নির্ভর কোরতে পারো তবে তিনিই তোমাকে অভয় দেবেন। তাঁকে আশ্রয় কোরে ভাসতে হয় ভাসো, আর ডুবতে হয় ডোব।

শ্রীমা জ্বরে পড়লেন। জ্বর আর ছাড়ে না। কে জানে এই জ্বরই মাকে সাথে কোরে নিতে এসেছে কিনা। চিকিৎসা কোরছেন ডাক্তার নীলরতন সরকার। মার দেহে রক্ত নেই, মুখখানা পাণ্ডুর।

মা যখন অসুস্থ শরীর নিয়ে জয়রামবাটি থেকে কোলকাতায় এলেন সেটা ১৯১৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

গোলাপ মা কাঁদতে কাঁদতে বোললেন—তোমরা কি মায়ের এই শুকনো হাড়সার দেহটাই নিয়ে এলে। মা কই!

কবিরাজী চিকিৎসা কোরলেন শ্যামাদাস বাচস্পতি, এলোপ্যাথি চিকিৎসার ভার নিলেন নীলরতন সরকার। তাতেও কিছু হয় না দেখে, এলেন ডাক্তার কাঞ্জিলাল। তিনি তখনকার নামকরা হোমিওপ্যাথ্ চিকিৎসক।

মায়ের খাওয়া বন্ধ হোয়ে গেলো। আর কিছুই খেতে পারেন না। মা কি তবে এবার সকলের মায়া কাটাবেন!

মা ধীরে ধীরে বলেন—আর কেন গো আমাকে ধরে রাখার সাধ তোমাদের! আর কিছুতে কিছু হবে না। এবার ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিতে দাও। মন যে আমার বড় ব্যাকুল হোয়েছে।

অসুখের যন্ত্রণা মা যেন আর সহ্য কোরতে পারছেন না। কেবলই বোলছেন—তোমারা আমাকে একটু গংগার ধারে নিয়ে চল। শরীরটা যে আমার জ্বলে গেলো। একটু হাওয়া লাগুক গায়ে। বড় যন্ত্রণা!

শ্রীমার পরম ভক্ত গৌরীদেবী ও দুর্গাদেবী রোজই আসেন একবার কোরে মাকে দেখতে।

শ্রীমা বলেন—তোমরা আমার কাছে আর এসোনা! আশীর্বাদ করি ঠাকুরের কৃপা যেন তোমাদের ওপর বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে।

তোমাদের সকলের মায়া বড় কঠিন মায়া যেজন্য আমি ছেড়ে যেতে পারছিনা।

১৯২০ সালের ২১শে জুলাই মংগলবার। মায়ের গলার স্বর বসে

যায়। রাত বাড়ে—এ যেন কালরাত্রি। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে পাগলের মত-।মা চলে যাবেন সেও বুঝি তা বুঝতে পেরেছে।

রাত দেড়টা!

মা ডাকলেন সবাইকে—আমি তো চললাম। যাবার বেলায় শুধু একটা কথা বোলে যাই—যদি শান্তি চাও, যদি সুখে থাকতে চাও তাহলে অন্যের দোষ দেখো না। নিজের দোষই দেখো। জেনো এ জগৎ তোমার। জগতের সব মানুষই তোমার আপন জন এদের কাছে টেনে নিও।

আর কিছু শোনা গেলোনা।

শ্রীমার সমাধি হোল। এ সমাধি—মহাসমাধি।

সকলে স্থির নেত্রে চেয়ে থাকে শুধু জীবন্ত মহামায়ার নশ্বর দেহের পানে—যেন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ধীরে ধীরে শ্বেতহংসের মতো ছন্দায়িত ডানা মেলে ঊর্ধ্বাকাশে চলে গেলো।

১৯২০ সালের ২২শে জুলাই বুধবার ভাগীরথী তীরে বাংলার এক মহান সাধিকার জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হল।

সকলের অশ্রুজলের কলতানে বেজে উঠলো দেবী প্রতিমার বিসর্জনের বাজনা।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

লোকমাতা—

রাসমণি

"ওরে হৃদে, আমার রাণীমা যে অষ্টসখীর এক সখী রে"।

—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ

আমগাছের ডালে দড়ি বেঁধে দোলনা তৈরী করে দোল খাচ্ছে কয়েকটি ছোট মেয়ে। একজন বসে আছে দোলনায় আর দুজন দুদিক থেকে দোল দিচ্ছে। যে বসে আছে দোলনায় সে শুধু বোলছে আরও জোরে, এই শ্যামা তোদেরও আমি জোরে জোরে দোল দেবো।

যে দুজন দোল দিচ্ছে তাদের মধ্যে একজন বোলে ওঠে, রাজরাণীর মত বসে বসে শুধু দোল খাচ্ছো আর আমরা যে হাঁপিয়ে মরছি।

দোল খাওয়া মেয়েটা বসে বসে হাসছে। বৈশাখের দুপুর বেলা। শিরশিরে হাওয়ায় দু'চারটে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। দোল দেওয়া মেয়ে দুটো ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কিছুদূরে গংগার স্রোত ঠেলে দুচারটে নৌকা ভাসতে ভাসতে চলেছে। মেয়েটা এবার দোলনা থেকে নেমে বোললে, চল শ্যামা ঐ ডুমুর গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নি। ওরা এলো সেই ডুমুর গাছটার নীচে।

শ্যামা বোললে, রাস্থ, এবার কিন্তু তোর দোল দেওয়ার পালা।

দেবোরে দেবো! আয় দিখিনি তোর ঘামটা একটু মুছিয়ে দি। রাস্থ তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে শ্যামার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে বলে, তোর বড্ড কষ্ট হোয়েছে।

শ্যামা কোন কথা বলে না।

রাস্থ শ্যামার দিকে চেয়ে থাকে।

কি দেখছিস রে রাসু !

তোকে।

কেন রে !

বারে তুই যে শ্যামা !

তাতে কি !

জানিস নে, শ্যামা যে মা কালী !

একটু থেমে হেসে বলে রাসু, জানিস শ্যামা—মাঝে মাঝে আমার ভারী ইচ্ছে হয় তোকে একটা পেন্নাম করি। দাঁড়ানা একটু জিভটা বের করে !

কি যে বলিস, আমি কি মা কালী নাকি !

শ্যামা তোর কথা আম শুনবো না। তোকে একটা পেন্নাম আমি কোরবই। এই বোলে সত্যি সত্যিই রাসু শ্যামাকে একটা প্রণাম কোরলে। প্রণাম সেরে রাসু বোললে, কই বর দে !

শ্যামা গম্ভীর হোয়ে বোললে, এই আমগাছের মত বড় হবি তুই !

সবাই মিলে হেসে উঠলো।

ডুমুর গাছে থোকা থোকা ডুমুর ফলেছে। কিন্তু রাসু অবাক হোয়ে চেয়ে চেয়ে কি দেখছে। সব চেয়ে উঁচু মগডালে এক থোকা ডুমুরের ভিতর সুন্দর একটা ডুমুরের ফুল ফুটে আছে। রাসুর অপর বন্ধুরা সে ফুল দেখতে পায়নি। রাসু বাড়ি এসে মাকে ঐ কথা বলায় তিনি বোলেছিলেন, মা তুই রাজরাণী হবি ! মায়ের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হবার নয়। পরবর্তি কালে সে রাজরাণীই হোয়েছিল।

আর শ্যামার বর তাও কি বিফল হোল ? না তাও হয়নি, রাসু একদিন রাণী রাসমণি রূপে বিরাট মহীরুহের মত আত্মপ্রকাশ কোরেছিল এবং তার স্নেহচ্ছায় শত শত দীন-দরিদ্র অন্ধ-আতুর নিপীড়িত নিগৃহীত আশ্রয় পেয়েছিল। রাসু শুধু একা একাই দোলনায় দোল খায়নি, সারাদেশের মানুষকেই বুঝি সে তার দোলনায় আশ্রয় দিয়েছিলো।

গরীব চাষী হরেকৃষ্ণ দাস। হালিশহরের পূর্বপাড়ে গংগার ধারে কোনাগ্রামে জীর্ণ খড়ের ঘর। খড় অভাবে চালের কোন কোন জায়গা দিয়ে দিব্যি সূর্যের আলো এসে পড়ে। ঘরের বেড়াগুলো ভাঙাচোরা, সারা বাড়ীটা যেন দারিদ্র্যের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা।

এক উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন এই হরেকৃষ্ণ। এত দুঃখের মধ্যে থেকেও দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল অগাধ। আচার ব্যবহারেও এমন একটা নিষ্ঠা ছিল যাতে মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হোত। ভাঙা ঘরে বাস কোরেও হরেকৃষ্ণ কোনদিন এতটুকু দুঃখবোধ করেন নি। শত দারিদ্রের মধ্যেও তিনি নিজের জীবনকে অভিশপ্ত বলে মনে করেন নি। স্ত্রী রামপ্রিয়া স্বামীর মত দুঃখকষ্টকে ঈশ্বরের দান বোলেই গ্রহণ কোরেছিলেন।

হরেকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রামপ্রিয়াকে বোলতেন, ভগবানের কি কৃপা দেখেছো গো। একটু রোদের জন্য কেউ কেউ গংগার ধারে যায় আবার কেউবা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় আর আমরা, ঘরে বসেই রোদ পাই!

রামপ্রিয়া হেসে জবাব দেন, ভগবানকে একবার বলোনা ঘরের বেড়াগুলো একটু ঠিক কোরে দিক্। ডাল চড়িয়ে কি দিয়ে ফোড়ন দি সবই যে রাস্তার লোক দেখতে পায়।

তাঁর কৃপা হোলে তিনি নিশ্চয়ই বেড়া বেঁধে দেবেন। দেহ মন ঘর বাড়ী সবই আমাদের আলগা তাতে আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

লাভ আবার কিসের গো!

লাভ, অনেক লাভ, সব আলগা আছে বোলেই তো ভগবানকে ডাকছি ঢেকে দেবার জন্য। আলগা না থাকলে কি আর তাঁর ওপর টান থাকতো, না তাঁকে ডাকতাম।

একটু থেমে হরেকৃষ্ণ বলেন, ভাল কোরে ঘর বেঁধে কিইবা হবে বলো। দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় যদি ঘরবাড়ী সাথে নিয়ে যেতাম

তাহালে না হয় একবার চেষ্টা কোরে দেখতাম। তা যখন হবে না তখন আর কি হবে।

রামপ্রিয়া আর কিছু বলেন না। মনের আনন্দে ঘরের কাজে মন দেন। মনে যার সুখ আছে, ভাঙা চাল আর ভাঙা বেড়া কি তাকে দুঃখ দিতে পারে।

হরেকৃষ্ণ দাসের ভাঙা ঘর আলো কোরে বাংলা ১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন বুধবার রাসমণি জন্মগ্রহণ কোরলেন। এমন আলো করা রূপ নিয়ে কে এলো এই চাষীর ঘরে? পাড়ার লোক কেউ কেউ বোললে, হরেকৃষ্ণর ভাঙা ঘরে চাঁদ উঠেছে। এমন রূপ এ কি কোন মানুষের হয়, ঠিক কোন দেবী বোধ হয় পথ ভুলে এসেছেন।

হরেকৃষ্ণ মেয়ে দেখে চোখের জল আর রাখতে পারলেন না। ভগবানের এ কি খেলা? এই মেয়ের তিনি যত্ন কোরবেন কি কোরে। অভাব অনটনের সূতোয় যার জীবন বাঁধা, তার মাঝে এই মেয়েকে কি কোরে মানুষ কোরবেন।

স্ত্রী রামপ্রিয়া মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন সব ভুলেছেন। একদণ্ডও তিনি মেয়ের কাছ ছাড়া হন না। রামপ্রিয়ার মনে প্রাণে যে কি আনন্দ তা তিনি যেন নিজেই বুঝতে পারেন না।

হরেকৃষ্ণ রামপ্রিয়ার কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝে বলেন, পরের ধন নিয়ে এত নাচানাচি কিন্তু ভাল নয়!

রামপ্রিয়া যেন অবাক হোয়ে যান, এসব কি বোলছ!

হ্যাগো, ঠিকই বোলছি, বলি তোমার নিজের বোলতে কি আছে বোলতে পারো! তোমার নিজের ঠিকানাই কি তোমার জানা আছে।

কি যে বলো আমি কিছু বুঝতে পারিনে, জানো সবাই কি বোলছে!

কি!

বোলছে এ মেয়ে নাকি খুব ভাগ্যবতী হ'বে!

হরেকৃষ্ণ হাসেন!

রামপ্রিয়া গম্ভীর হোয়ে যান। নিজের রক্তমাংস দিয়ে তিল তিল

কোরে যাকে তিনি তিলোত্তমার মত গড়লেন আর তাই কি না বলে পরের ধন, এ তিনি মানতে রাজী নন। স্বামীকে বলেন, হাসছো যে বড় !

হাসবো না ! বলি জলের ঢেউ দেখেছো। এই দেখলাম এই নেই। ওতে তোমার বিশ্বাস থাকতে পারে। আমার একটুও নেই ! আগে বাঁচুক তারপর তো ভাগ্যবতী হ'বে।

তুমি দেখে নিও !

বাঁচে তো দেখবো বই কি !

হরেকৃষ্ণ একটু চুপ কোরে থেকে বলেন, ভাঙা ঘরের চালের তলায় মানুষ হোয়ে ও যদি ভাগ্যবতী হয়—ওর ভাগ্যে যদি সুখ থাকে নিশ্চয়ই ভগবান ওকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত কোরবেন না। আমি ভাবছি সেই পর্যন্ত ওকে আমি কি কোরে টেনে নিয়ে যাবো।

রামপ্রিয়া এগিয়ে এসে বলেন, তুমি কিছু ভেবো না, ভগবান সহায় থাকলে সব হ'বে !

সেই ভরসাতেই তো এই ভাঙা ঘরে বসেও আমার মহাআনন্দ ! শুধু ভাবি এই আমার যথেষ্ট আর কিছু চাই না।

কোনাগ্রামে নানান জাতের বাস। বামুন কায়েত চাষী কৈবর্ত সবরকম মানুষের বসতি। গংগার ধার থেকেই এসব লোকের বসতি ছিল। বর্তমানে কাঞ্চনপল্লীর নাম কেউ জানে না। সবাই জানে কাঁচরাপাড়া। কাঁচরাপাড়ার একধারে হালিশহর। চৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত হালিশহরে চৈতন্য-ডোবা আজও মহাপ্রভুর পদরজ ধারণ কোরে বিরাজমান। আর একধারে শক্তি সাধক রামপ্রসাদের সাধন পীঠ। একাধারে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও শক্তিসাধক রামপ্রসাদের শক্তিসাধনা পল্লীর মানুষের মনে কোন সংশয় ও তর্কবিতর্কের ঢেউ আনে নি। ধর্মের আবার ধারা কি ! সত্যই তো ধর্ম, এই পরম সত্যকে জীবনের অনুপরমাণুতে জড়িয়ে সবাই চলতো। যে শ্যাম সেই শ্যামা। সবই তো এক। ঈশ্বর সাধনা, ঈশ্বর সেবা যে ভাবে হোক কোরতে

পারলেই হোল। তবুও এর মাঝে যে কিছু কিছু মতান্তর মনান্তর না হোত তা নয়। কিন্তু সবই মিলিয়ে যেতো। সবাইকে সংসার ধর্ম কোরতে হ'বে, ভগবদ সেবা কোরতে হ'বে। পৃথিবীতে আসা তো এই জন্যই। ঈশ্বরকে ভুলে থাকার জন্য তো কেউ আসেনি। তাঁকে যাতে চরম কোরে পাওয়া যায়, তাঁর যাতে দর্শনলাভ হয় সেই সাধনাই তো বাঙালীর সাধনা। যুগে যুগে বাঙালী তো সাধনাই কোরে এসেছে একই পথের সন্ধানে। শক্তি সাধনাই হোক আর বৈষ্ণব সাধনাই হোক সবই তো একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হরেকৃষ্ণ দাস এই মাটিতে বাস কোরে কি অন্যপথে চলতে পারেন? ছোট সংসার। দুই ছেলে, বিধবা বোন ক্ষেমঙ্করী, স্ত্রী রামপ্রিয়া আর মেয়ে রাসমণি। অভাবের ভিতর থেকেও হরেকৃষ্ণ নিয়মিত জপ তপ কোরতেন। নিত্যসন্ধ্যায় গৃহদেবতার সামনে বসে ভগবানের নাম কোরতেন।

রাসমণি ধীরে ধীরে বড় হোতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত সুলক্ষণগুলো যেন তাঁর দেহে এসে বাসা বাঁধলো। মুখের অপরূপ শ্রী, চোখের জ্যোতিঃ, মুখের কথা সবাইকে আকৃষ্ট কোরত। যে তাঁকে দেখতো সেই একটু কোলে কোরে আদর কোরত।

হরেকৃষ্ণর জীবনযাত্রার চাহিদা অতি সাধারণ। ছোট্ট ঘর, ছোট্ট বাসনা, ছোট সুখ এই ছিল তার সুখের স্বর্গ। খাঁটি মানুষ যারা তারা এমনি ধারাই হয় তাদের কোন বড় আশাও নেই বড় লোভও নেই। দুঃখ কষ্টের ঝড় কি এদের গায় লাগতে পারে? ফাঁকী যারা দিতে জানে না তাদের ঘরের চাল দিয়েই তো ফাঁক দেখা যায়। দিন চলে যায়। গংগার দুকূল ছাপিয়ে জলের ঢেউ ওঠে আবার একদিন জল সরে যায়। মাঝে মাঝে চরা দেখা দেয়। চরার ওপর ঘাসের সংসার বসে। আবার একদিন চরা ডুবে যায়। ঠিক যেন মানুষের জীবন। এই তো দেখলাম আশা-নিরাশার ফুলে ফলে সংসার ভরে উঠলো আবার এক অজানা ঢেউয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কোথায় কোন্ অতলে।

রামপ্রিয়া দেহত্যাগ কোরলেন। রাণীকে রাজরাণীর বেশে আর দেখে যেতে পারলেন না। ছেলে দুটো মাকে হারিয়ে কেঁদে গড়াগড়ি যায়, রাসমণি কাঁদলো। বয়স তখন তার আর কত হবে। আট কি নয়। সে চোখের জলে যেন কোন এক মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। রাণী চীৎকার কোরল না। শুধু নীরবে তার চোখের জল ঝরলো। কিন্তু সে চোখের জলের মাঝে যেন দেখা গেলো এক বিরাট প্রতিজ্ঞার হাতছানি, এক বিরাট কর্তব্যের ইশারা। সংসার ভেসে গেলে চলবে না। বাবাকে দেখতে হবে, ছোট ভাই দুটোকে মানুষ কোরতে হ'বে। হরেকৃষ্ণর ভগ্নি ক্ষেমঙ্করী সংসারের হাল ধরলেন। ন বছরের রাণী পাল তুলে দিল। হরেকৃষ্ণ গুণটানতে লাগলেন। রাণীর জীবনেরও যেন পটপরিবর্তন হোল। ঐটুকু মেয়ে কি বোঝে কি জানে। তবুও সে সংসারের কাজে এগিয়ে এলো। অলক্ষ্যে কে যেন বলে, তুমি বিরাট, তুমি মহীয়সী নারী, তুমি সাধিকা, তুমি পালিকা, তুমি একাধারে অন্নপূর্ণা আর একদিকে তুমি বরাভয়দায়িনী খড়গধারিণী মহামায়া। তুমি কি চুপ কোরে বসে থাকতে পারো। তুমি যে মা, জগৎমাতা তোমার লক্ষ লক্ষ সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনিতে জগৎ মুখরিত। তুমি তাদের ভার নাও, পালন করো, তাদের ম্লান মুখে হাসি ফোটাও।

রাণী বড় হোচ্ছে। যতদিন যায় ততই যেন রাণীর রূপ শতদল পদ্মের মত বিকশিত হচ্ছে। এত রূপ কি মানুষের হয়। গ্রামের মানুষ যত দেখে ততই অবাক হয়। কোনা গাঁয়ে কোথাকার ফুল ফুটলো? স্বর্গের পারিজাত কি এবার মর্তে এসে প্রস্ফুটিত হল!

সন্ধ্যাবেলায় হরেকৃষ্ণ দাস গৃহদেবতার সামনে বসে জীবনের হিসেব নিকাশ করে। দেবতার কাছে হিসাব দাখিল করে। ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, কাঁদে। কপালের তিলকটা জ্বলজ্বল কোরছে। গলায় তুলসীর মালা।

রাণী গেছে শিবমন্দিরে। পরণের ছোট লাল পাড় শাড়ীটা গলায় জড়িয়ে প্রণাম করে। মন্দিরের শিব বুঝি চোখ মেলে দেখেন—

মন্দিরে এ আবার কে এলো! এমন ভুবনমোহিনী মূর্তি, এমন মাতৃরূপিণী ভাব, এমন দেবতার আশীর্বাদ মাখানো মুখ এ মন্দিরে কেমন কোরে এলো!

রাণী সন্ধ্যার অন্ধকার গায়ে কাপড় জড়িয়ে বাড়ী ফিরল। হরেকৃষ্ণ তখন মনের আনন্দে গান ধরেছে। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। রাণী কেমন যেন হোয়ে গেলো। কি অপরূপ লাগছে তার বাবাকে। সে চুপি চুপি একপাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে বাবার মত সারা অংগে তিলক লেপন কোরল, গলায় একটা তুলসীর মালা দিল। কাপড়ের আঁচলটা গলায় জড়িয়ে বাবার পিছনে এসে বসলো।

হরেকৃষ্ণ তখন গানে বিভোর—

ভেবে দেখো মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলোনা দক্ষিণা কালী বদ্ধ হোয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হ'বে বলে॥
দুদিনের তরে জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই বলে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥
রামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে তুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে, কি করতে পারবে কালে॥

হরেকৃষ্ণ প্রণাম করেন গৃহদেবতাকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন এক অপরূপ ছবি—মায়ের এ কি রূপ! পরমবৈষ্ণবী মা আমার, সারা অঙ্গে তাই তাঁর তিলক, গলায় মুণ্ডমালার পরিবর্তে তুলসীর মালা।

রাণী তেমনিভাবে বসে আছে হরেকৃষ্ণর পিছনে।

পিছনে তাকিয়ে চমকে ওঠেন তিনি! এ কে! রাণী না—এমন সাজ সেজেছিস কেন মা!

রাণী শুধু বোললে, ভারী ইচ্ছে হোয়েছিল বাবা।

তা বেশ, এই ভাব যেন তোর থাকে মা। তুই রাজরাণী হবি

সবাই বলে কিন্তু তোর এ সাজের কথা যেন ভুলিসনে। তিলক চন্দনে তো দেবতার আসন, তুলসীর মালার ভিতরেই তো দেবতার স্থিতি। এই তো মহারাণীর বেশ।

রাণী আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ভরে গেছে নক্ষত্রের মেলায়। অনেক দূরে ঐ যে ওপরে সাদা মেঘের কোল ঘেঁসে যে তারাটা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সেটা তার মা নয়তো! হয়তো তাই হ'বে, ঐখানেই তো স্বর্গ ঐখানেই তো মা গেছেন। তাঁর রাণীর কথা কি একবারও মনে পড়ছে না। উঠানের মাঝে সারি সারি ফুলের গাছ। কি সুন্দর বড় বড় ফুল। কে জানে তাঁর মা ওরই মধ্যে কোথাও ফুল হোয়ে ফুটে আছেন কিনা!

ছোটবেলায় মা মরে গিয়ে রাণীর সংসার সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা জন্মে গেলো। ঘরকান্নার কাজ, রান্নাবান্না, যত্ন কোরে সবাইকে খেতে দেওয়া, বাবা মার সেবা করা, গৃহদেবতার পূজার্চনার যোগাড়, অতিথি সেবা এর নামই তো সংসার।

হরেকৃষ্ণ কাজকর্ম করেন। গান গেয়ে গৃহদেবতাকে শোনান। ঈশ্বর সেবা তো এরই নাম। সংসারে থেকে সংসারের যিনি সর্বময় কর্তা তাঁর ধ্যানধারণায় নিমগ্ন থাকাই তো পরম মোক্ষ, পরম সিদ্ধি। নাইবা জানা হোল মন্ত্র, নাইবা পড়া হোল পুঁথি। ঈশ্বরের দিব্যকান্তি নাইবা দর্শন হোল, চরণ স্পর্শও তো হ'বে।

ক্ষেমঙ্করী চিন্তায় পড়ে যান। রাণীর বয়স যে এগারো ছাড়িয়ে যায়। সেকালে আর একালে কত তফাৎ। সেকালে আট নয় বছর বয়সেই মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যেতো। সংসারের সব ভারই তাদের বইতে হোত। সেকালে সামাজিক শাসনও ছিল ভয়ানক। ঠিক সময়ে মেয়ের বিয়ে না দিলে তাকে একঘরে করা হোত।

হরেকৃষ্ণ দাসের কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

ক্ষেমঙ্করী শুধু বলে, দাদা তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছো না।

হরেকৃষ্ণ চমকে গিয়ে বলেন, কি রে!

এই যে রাণী বড় হোচ্ছে।

বেশ তো বড় হোক না!

তাতো হোল, ওর বিয়ে দিতে হবে না।

হ্যাঁ হ'বে বই কি! কিন্তু আমার যে কিছুই নেই ক্ষেমঙ্করী, আমার মেয়ে কে নেবে! আমার ঘরের চাল নেই, বেড়াও ভাঙা, সবই তো আলগা, এ আলগা ঘরের মেয়ে কে নেবে রে!

একটু থেমে হরেকৃষ্ণ বলেন, দাঁড়া, রাণী আমার নাকি রাজরাণী হ'বে ওর মা যে আশীর্বাদ কোরে গেছে রে! সে রাজপুত্তুর না এলে আমি কার সাথে ওর বিয়ে দি!

ওসব কথা তুমি মাথায় এনো না দাদা, আমরা গরীব অত সুখ আমাদের কপালে হবে না! আর দেরী কোর না দাদা সময় থাকতে একটা ছেলে দেখে শুভকাজ সেরে ফেলো। শেষে এই কোনাগ্রামে আমরা বাস কোরতে পারবো না। সবাই আমাদের একঘরে কোরে দেবে।

হরেকৃষ্ণ বলেন, তুই কিছু ভাবিসনে। যিনি ওর বিয়ে দেবেন সময় হোলে তিনিই ঠিক ছেলে নিয়ে এসে হাজির কোরবেন, তুই কিছু ভাবিসনে, ওরে রাণী যে আমার রাজরাণী হবে!

হরেকৃষ্ণর মন চায়না তার রাণী এখনই শ্বশুরবাড়ী যাক। তাড়াহুড়া কোরে কি হ'বে ভগবান যখন তার ব্যবস্থা কোরে দেবেন তখন কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। এতখানি আত্মবিশ্বাস হরেকৃষ্ণর। তিনি যে নিজেকে আত্মসমর্পণ কোরছেন ভগবানের কাছে। আর তো তার কোন চিন্তা নেই।

এগারো বছরের মেয়ে রাণী। গংগার পলিমাটির গন্ধ যেন তার সারা দেহে মনে। এখন ও ফাঁক পেলেই গংগার ধারে ছুটে যায় সাথাদের নিয়ে। নোয়ানো গাছের ডাল ধরে আজও তার দোল খেতে ভালো লাগে। ক্ষেমঙ্করীর এসব ভালো লাগতো না অথচ তিনি কিছু বোলতেও পারতেন না। একে মামরা মেয়ে তার ওপর তার ঐ মুখের দিকে চাইলে কোন কিছুই আর মুখে আসে না।

রাণী কি কোন অন্যায় কোরতে পারে? এইটুকু মানুষের কি দয়ামায়া, ব্যথিতের প্রতি কি দরদ! পাড়ায় কারও অসুখবিসুখ হোলে সে ছুটে যেতো। যতটুকু পারতো তার সেবা কোরত। সে যে সকলের সেবা করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে। মহীয়সী নারী হোতে গেলে যে সব গুণের দরকার সবই তার ছিল।

সেদিনও রাণী গিয়েছিল গংগার ধারে। গংগার ঢেউয়ের সংগে তার হৃদয়ের যেন মস্ত এক যোগ রয়েছে। পাল তুলে কত দেশের কত রকম নৌকা চলে যায়। বারবার তার শুধু মনে হয় ঐ নৌকায় বুঝি তার মা আসবে। মা তো অনেকদিন হোল গিয়েছে এখনও কি তার ফেরার সময় হয়নি। নৌকাগুলো থামে না, সোজা চলে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরে যখন কোন নৌকাই এসে ঘাটে ভেড়ে না তখন তার হৃদয় যেন ভেঙ্গে যায়। রাণী বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

এমন সময় পেছন থেকে ডাক শোনা যায়, মা একটু দাঁড়াও তো!

রাণী পিছন ফিরে চেয়ে দেখে দুইজন প্রৌঢ় ব্যক্তি।

তুমি কি এই গাঁয়ে থাকো মা!

হ্যাঁ! আমার বাবার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। আমাদের এই কোনা গাঁয়ে বাড়ী।

হ্যাঁ মা লক্ষ্মী তোমার নামটা কি!

আমার নাম রাসু। ভাল নাম রাসমণি, মা কিন্তু আমার রাণী বোলেই ডাকতেন।

প্রৌঢ় ব্যক্তির ভিতর একজন তার দিকে চেয়ে বলেন, ডাকবেনই তো, তুমি রাণী ছাড়া আবার কি! রাণী নাম তো তোমার সার্থক হোয়েছে মা! তোমার মত সুলক্ষণা মেয়েই তো রাণী হয়!

রাণী লজ্জায় রাঙা হোয়ে গেছে। তার মুখে যেন কোন কথা নেই —এঁরা যে কি বলেন। পরনে তার লালপেড়ে শাড়ী। কালো চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। টানাটানা চোখ দুটোতে কি এক অপরূপ মায়া।

তোমাদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবে মা, বড় ইচ্ছে হোচ্ছে এমন মেয়ে যাদের তাদের একটু দেখে আসি !

বেশতো আসুন। আমরা কিন্তু বড় গরীব !

যাদের ঘরে রাণী আছে, তারা কি কখনও গরীব হোতে পারে !

রাণী চলেছে আগে আগে। পেছনে ওরা আসছেন কথা বোলতে বোলতে। একজন আর একজনকে বোলছে ! বুঝলে মেয়েটি যদি আমাদের স্বঘর হয় তাহলে একেই রাজুর বৌ কোরে নেওয়া যেত।

আমিও তো তাই ভাবছি। এমন সুলক্ষণা মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে। ওরা এসে পৌঁছে গেলেন হরেকৃষ্ণর বাড়ীতে।

হরেকৃষ্ণ ওঁদের বেশভূষা দেখে হতবাক হোয়ে গেলেন।

প্রৌঢ় দুজন হরেকৃষ্ণর ব্যবহারে অত্যন্ত খুশী হোলেন কিন্তু মনের ভিতর একটা অজানা আশংকা শুধু টলমল কোরছে যদি স্বঘর হয় তবেই তো !

কিন্তু ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হোয়ে গেলো। প্রৌঢ়রা জানতে পারলেন হরেকৃষ্ণর মেয়ে তাঁদের ঘরে যেতে পারবে। তখন দুজনের মনে আনন্দ আর ধরে না।

হরেকৃষ্ণ শুধু ইতস্ততঃ কোরছেন, প্রাণ খুলে যেন কথাও বোলতে পারছেন না। কি কোরে বোলবেন—ওঁরা বড়লোক, ওদের মান রাখা কি হরেকৃষ্ণর মত মানুষের পক্ষে সম্ভব। হরেকৃষ্ণ আমতা আমতা কোরে বোললেন, বাবুরা আমার অপরাধ নেবেন না। আমি গরীব, আপনাদের সেবাযত্ন কি আমরা কোরতে পারি। একজন বোললেন, না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা বড় আনন্দ পেয়েছি।

হরেকৃষ্ণ আবার মাথা নীচু কোরে বোললেন, কি জন্যে এসেছেন আপনারা দয়া কোরে যদি একটু বলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ বোলব বৈকি—কোলকাতায় জানবাজার বোলে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার বাড়ী, আমার নাম প্রীতিরাম মাড়।

আমার একটি মাত্র ছেলে রাজচন্দ্র, তার বৌ মারা গেছে, তার জন্যই আমরা এই মা টিকে ভিক্ষা চাইছি।

হরেকৃষ্ণ দাস যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

জানবাজারের প্রীতিরাম মাড়কে চেনে না কে, অত বড় ধনী সারা কোলকাতায় খুঁজলে বড় একটা পাওয়া যায় না। সেই ঘরের বৌ হোয়ে যাবে তার রাণী, একি কখনও বিশ্বাস হয়। হরেকৃষ্ণ বলেন, বুঝতেই তো পারছেন আমি বড় গরীব, তা ছাড়া আমি তো ভাবতেই পারছিনা মামরা ঐ মেয়ের এতখানি ভাগ্য হবে! আপনারা বড়লোক আপনাদের সংগে আত্মীয়তা আমি কি কোরে কোরব।

প্রীতিরাম বোললেন, সে ভাবনা আমার, শুধু একটা সুপারীর যোগাড় কোরবেন তাই দিয়েই দান কোরবেন। আমরা সব ব্যবস্থা কোরব। মা লক্ষ্মী আমার ঘরে যাবে, আমি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে নিয়ে আমার মাকে ঘরে তুলবো।

হরেকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হোয়ে যান: মেয়ে তার সত্যিই তাহলে রাজরাণী হ'বে। হবে না মায়ের আশীর্বাদ কি কখনও বিফলে যায়। তার চোখ দুটো জলে ভরে আসে। রামপ্রিয়ার কথা মনে পড়ে। আজ সে থাকলে কত সুখীই না হোত। হরেকৃষ্ণ ক্ষেমঙ্করীকে ডেকে বলেন, ক্ষেমা দেখলি তো, বোলেছিলাম না, যাঁর ব্যবস্থা তিনিই কোরবেন। দেখ্ তিনি কোরলেন কি না। তিনি যে নিজেই সাথে কোরে আমার রাণীর সম্বন্ধ এনে দিলেন।

ক্ষেমঙ্করীর চোখে জল। বলেন, দাদা, আমি ভাবছি কি জানো!

কি রে, আবার কিসের ভাবনা?

রাণীকে ছেড়ে থাকবো কি কোরে। ও বাড়ীতে থাকতে আমাদের কোন কষ্ট হয়নি। কোন আপদ বিপদও আমাদের কাবু কোরতে পারেনি। ও যে কি আর ও যে কে তাও তো আমি বুঝলাম না।

কিছু ভয় নেই, ভগবানে বিশ্বাস রাখ সব ঠিক হোয়ে যাবে। তাঁর ওপর নির্ভর কোরতে শেখ কোন বিপদ হবে না!

কোনাগাঁয়ে কথাটা রাষ্ট্র হোয়ে গেলো। সবাই বোললে, রাসমণি এবার সত্যি সত্যিই রাণী হোল!

খবর শুনে শ্যামা এলো।

রাণী তাকে জড়িয়ে ধরলো।

হ্যারে রাণী, এবার তো সত্যিই রাণী হলি। আমার কথা মনে থাকবে তো!

থাকবে রে থাকবে, তুই যে শ্যামা, তোকে ভুলবো কি কোরে। তুই যে মা কালী!

থাম আর বোলতে হবে না।

কেন রে! আজ তোকে আমার পেন্নাম কোরতে ইচ্ছে কোরছে! রাণী! তোকে পেয়ে সব ভুলেছিলাম। তুই যে কি তা তো জানিনে, যেখানেই থাকিস আমার কথা একটু মনে রাখিস। ছোটবেলায় তোকে কত দোল দিয়েছি। দোল খেয়ে এতদূর চলে যাবি তা আগে ভাবিনি।

রাণী বোললে, বাবাকে দেখিস্। আমি যে বাবা ছাড়া কাউকে জানি না ভাই।

শ্যামা ঘাড় নাড়ে।

১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ এক স্বর্ণলগ্নে জীর্ণ খড়ের ঘর ছেড়ে সারা অংগ সোনায় ঢেকে জানবাজারের সাতমহলার বাড়ীর বৌ হোয়ে প্রবেশ কোরলেন রাসমণি। রাণী এবার সত্যিই রাজরাণীই হোলেন।

নবাব আলীবর্দ্দির সময়ে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয়। সকলেই সন্ত্রস্থ, ভীত। কে কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই। আলীবর্দ্দির রাজত্বের সময়ই তিনি একবার চেষ্টা কোরেছিলেন কিন্তু তার ক্ষুদ্রশক্তি পেরে উঠবে কেন। আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর এলেন তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা, তারপর এলেন মীরজাফর, এলেন মীরকাশিম। ইতিহাসের গতি যেন ক্ষণে ক্ষণে দিক বদলে যাচ্ছে। ইংরেজরা তখন সবে তাদের দোকানের ঝাঁপ খুলছে। এ দেশের মাটির ওপর তাদের

লোলুপ দৃষ্টি। বর্গিরা সমানে চালাচ্ছে অত্যাচার। কি ভয়ানক দুর্যোগ তখন বাংলার আকাশে। এর ওপর আছে জমিদার আর জোতদারদের আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার। এককথায় বাংলাদেশ তখন যেন মগের মুল্লুক।

এই সময়ে রাণী রাসমণির আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়। চিরকালই এ দেশ সাধক সাধিকার দেশ, এ দেশের মাটিতে সাধনার বীজ পোঁতা আছে। সংস্কৃতি ও সাধনার তীর্থক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের কোল বেয়ে জোয়ার ভাঁটার খেলা চলছে গংগা যমুনা মেঘনা পদ্মা ব্রহ্মপুত্রে। এর জলের স্রোতে আছে মুক্তির গান, এর ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেলে অমৃতের সন্ধান। এই স্রোত বেয়েই তো একদিন এসেছিলেন সীতা-সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা, তারা, মন্দোদরী, পদ্মাবতী, মীরাবাঈ, বিষ্ণুপ্রিয়া, অহল্যাবাঈ, সারদামণী, রাণী রাসমণি, রাণী ভবানী।

সেই মুহূর্তে রাণী রাসমণির আবির্ভাব দেশের এক আশীর্বাদ। কোনাগ্রামের সেই ছোট্ট মেয়ে আজ রাণী রাসমণি। সত্যের সন্ধান যাঁরা দেবেন, যাঁরা সত্যাশ্রয়ী, যাঁরা মানুষকে ভরসা দেবেন তাঁদের এ আসা যাওয়া বুঝি চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। রাণী রাসমণিও তাদেরই একজন।

বর্গীর হাঙ্গামা তখন প্রবলভাবে চলছে। প্রীতিরাম মাড় হাওড়া জেলার ঘোষালপুরে বাস কোরতেন। এইসব ঝামেলা দেখে তিনি দুটি ভাইকে নিয়ে জানবাজারে মান্নাবাবুদের বাড়ী পিসীমা বিন্দুবালার কাছে চলে এলেন।

বিন্দুবালা ভাইপো তিনটিকে কাছে রেখে মানুষ কোরতে লাগলেন। ভালও বাসতেন তিনি খুব। ঐ বিপদের সময় তিনি যদি ওদের আশ্রয় না দিতেন তাহলে আজ আর তাদের অস্তিত্বই বোধহয় খুঁজে পাওয়া যেতো না।

কিছুদিন পর ডানফিন সাহেবের দেওয়ান মান্নাবাবুদের অক্রুরবাবুর

সহায়তায় প্রীতিরাম বেলেঘাটায় সাহেবের নুনের কারবারে মুহুরী নিযুক্ত হোলেন। প্রীতিরাম সৎ ও চরিত্রবান ছিলেন। যেমন চালাক ছিলেন তেমনি তিনি ব্যবসাটাও বেশ বুঝে ফেললেন এবং রোজগারও ভালভাবেই সুরু কোরে দিলেন। প্রীতিরামের ভাগ্যের চাকা যেন ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে।

কিছুদিন পর ডানফিন সাহেব মারা গেলেন। নুনের কারবার বন্ধ হোল, প্রীতিরামও বেকার হোলেন। কৃতীপুরুষ যাঁরা তাঁরা কোনদিন সামান্যতে কাবু হন না। প্রীতিরাম মন বাঁধলেন দৃঢ় কোরে।

ডানফিন সাহেবের কারবারে এক পূর্ববংগের ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। প্রীতিরাম তার কাছে আত্মসমর্পণ কোরলেন। গড়ে উঠলো প্রীতিরামের এক বিরাট বাঁশের আড়ত। সৎবৃত্তি আর সদ্‌ভাব যাঁর হৃদয়ে জাগ্রত থাকে ভগবান তাকে চিরকালই হাত ধরে নিয়ে চলেন, ভগবানে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা যার অবিচল তিনি কখনও আছাড় খান না। প্রীতিরাম বাঁশের কারবারে মোটা পয়সা লাভ কোরলেন। প্রীতিরাম দাস থেকে হোলেন প্রীতিরাম মাড়। বাঁশের আড়তকে বলে মাড়।

জাগ্রত ভগবান প্রীতিরামকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। শহর অঞ্চলের যত অনাবাদী জমি সব তিনি কিনে নিয়ে চাষ সুরু কোরে দিলেন। তখনকার দিনে এত আলোর রোশনাই ছিল না। বড় বড় জংগল, ঝোপঝাড় ভেঙে রাতবিরেতে মানুষ চলাফেরা কোরত। প্রীতিরাম নীলাম ডাকা সুরু কোরলেন। মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিলেন। ধীরে ধীরে প্রীতিরাম এক মস্ত ধনী হোয়ে উঠলেন। ভগবদকৃপা যার ওপর বর্ষিত হয় তার আর কি ভাবনা থাকে। সকলের নজর তাঁর ওপর পড়লো। যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রীতিরামকে দেখে এত মুগ্ধ হোলেন যে তিনি তাঁকে সাথে কোরে নিয়ে গেলেন। যশোহর থেকে ঢাকায়ও তিনি কিছুদিন কাজ করেন।

নাটোরের রাজা রামকান্ত রায় শুনলেন প্রীতিরামের কথা। তিনি তাঁকে সাদরে ডেকে নিয়ে এসে নাটোর এস্টেটের দেওয়ান করলেন।

মানুষ সৎ হোলে তাকে যে সবাই কাছে টানতে চায় তার প্রমাণ প্রীতিরাম। তিনি ফিরে এলেন আবার কোলকাতায়। সব যুগেই মানুষের কিছু পয়সা হোলেই তার মন অন্যরকম হোয়ে যায়। নানারকম খেয়াল ঢোকে। বাগান বাড়ী তৈরী হয়, গান বাজনা, বাঈজী, নেশা ও রঙবেরঙের বন্ধু এসে জোটে। তারপর কলসীর জল ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে শূন্য হোয়ে যায়। বাগান বাড়ী নীলাম হয়, গান বাজনা থেমে যায়, বাঈজীর রঙীন শাড়ীর আঁচল আর দেখা যায় না। সম্পত্তি নীলামে উঠে। এ ধরণের নজির সবকালেই ছিল।

প্রীতিরাম সে ধরণের বড়লোক ছিলেন না। তিনি তাঁর পয়সাকে মা লক্ষ্মী ভেবে চরণ আঁকড়ে ধরে থাকলেন। টাকা তিনি নষ্ট কোরলেন না। ব্যবসা বড় থেকে আরও বড় হোতে লাগলো। টাকাও বাড়তে লাগলো। ব্যবসা কোরতে হোলে দুটো জিনিষের প্রয়োজন। এক সততা আর এক কথার দাম। কথার দাম যার আছে তার সবই আছে।

প্রীতিরাম ফিরে এলে যুগলকিশোর বাবু নিজের মেয়ের সংগে তার বিয়ে দিলেন। বিয়েতে তিনি যৌতুক দিলেন অনেক জমি। বিরাট একখানা বাড়ীও তৈরী কোরলেন প্রীতিরাম। জানবাজারে এবার সত্যিই মাহিষ্য বংশের সুরু হোল। মকিমপুর পরগণা তিনি উনিশ হাজার টাকায় কিনে নিলেন। চার পাঁচ বছরে সে জমিতে কোন ফসলই মিললো না। প্রীতিরাম ঘাবড়ালেন না। লোকসানে যেন তাঁর কোন দুঃখই নেই। তারপর এল বন্যা। বন্যার জল এসে সমস্ত মকিমপুর পরগণা ভাসিয়ে দিল। পলিমাটিতে ভরে গেলো সব জায়গা। মাঝখানে জল জমে বিরাট এক একটা দীঘির মত হোয়ে গেলো। প্রীতিরাম তাতে হাজার হাজার টাকার মাছ ছাড়লেন। সমস্ত জমিতে যা ফসল হোল- তাতে তার লোকসান পুষিয়ে গিয়েও অগাধ লাভ হোল। প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হোয়ে প্রীতিরাম মাড় কোলকাতার সেরা ধনী

হোলেন। সংসারও বড় হোতে লাগলো। দুই ছেলে হোল প্রীতিরামের। একজন হরচন্দ্র আর একজন রাজচন্দ্র। সুখের মাঝে দুঃখও বুঝি প্রয়োজন হয় তাই অকালে হরচন্দ্র মারা গেলেন। প্রীতিরাম শোকাতুর হোলেন কিন্তু পাগল হোলেন না। কাউকে কিছু না বোলে তিনি নীরবে চোখের জল ফেললেন। ভগবান এমনি ভাবেই বুঝি মানুষকে মাঝে মাঝে চালুনী দিয়ে চেলে নেন। ধীরে ধীরে সয়ে গেলো প্রীতিরামের পুত্রশোক। খুব ধুমধাম কোরে তিনি বিয়ে দিলেন রাজচন্দ্রের। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম। সে বৌ মারা গেলো কয়েক মাস বাদেই। আবার ছেলের বিয়ে দিলেন সে বৌও মারা গেলো। প্রীতিরাম মাড় এবার চিন্তিত হোয়ে পড়লেন। কেন এরকম হোল! তিনি তো কোন অন্যায় করেন নি তবে ঈশ্বর তাকে বারবার এমন শাস্তি দিলেন কেন! বংশ থাকবে কি কোরে! প্রীতিরাম এবার সারা দেশ খুঁজে এক সুলক্ষণা মেয়ে আনবেন তার জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকার কোরতে প্রস্তুত।

পাত্রী দেখতে লোক ছুটলো চারিদিকে, তিনি নিজেও সন্ধান নিতে গেলেন। সেকালে রাজচন্দ্রের মত ছেলেও কম ছিল। শিক্ষায় দীক্ষায় রাজচন্দ্র তখনকার সভ্য সমাজে উঁচু আসনই লাভ কোরেছিলেন। বড়লাট অকল্যাণ্ড থেকে সুরু কোরে তৎকালীন সমস্ত নামকরা লোকই তাঁর বন্ধু ছিলেন। এমন কি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদার বিরাট ধনী জনবেব ভারতবর্ষে এসে রাজচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ কোরে তাঁর সংগে বন্ধুত্ব কোরেছিলেন।

কিন্তু মনের মত পাত্রী মেলে কই? ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হোয়ে গেলেন। তাহলে কি তাঁর বংশ রক্ষা হবে না। মনের দুঃখে একদিন তিনি গংগায় নৌকা ভাসালেন। সংসারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হোয়ে যদি একটু শান্তি পাওয়া যায়। সারা দেহে মনে শুধু অশান্তির জগদ্দল পাথর মাঝে মাঝে ভারী হোয়ে উঠছে। একটু শান্তির প্রয়োজন, একটু মুক্ত বাতাস, একটু বিষয় ভুলে থাকা।

প্রীতিরামের নৌকা এসে থামলো হালিশহরে কোনা গ্রামের ঘাটে। ঘাট ভুল হয়নি নৌকার, ঠিক জায়গায় এসেই থেমেছে। মিলে গেলো প্রীতিরামের সাধনার ধন। রাণীকে তিনি পেলেন, কুড়িয়ে নিলেন পরম যত্নে।

এগারো বছরের মেয়ে রাণী সবাইকে আপন কোরে ফেললেন। ঐটুকু মেয়ে যেমন বুদ্ধি তেমনি ধর্মভাব। সকলে সুখী হোলেন। সংসারের হাল ধরলেন তিনি এসেই। কি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, কি সুন্দর ঘরকন্নার কাজ, কি অপরূপ দেবসেবা। সকলের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা, কি অপূর্ব সেবাযত্ন। প্রীতিরামের আনন্দ আর ধরে না।

রাশি রাশি ধনরত্নের ওপরেও যেন তাঁর রাণীরত্ন।

রাণী নিত্য উঠেই শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে তবে কাজ সুরু কোরতেন। প্রীতিরাম আশীর্ব্বাদ কোরতেন, মা আমার সুখে থাকো।

অন্তর্যামী ভগবান কিন্তু তা চান না। তিনি চান রাণী তো নিজের সুখের জন্য পৃথিবীতে আসেনি। সকলকে সুখী করার জন্যই তো তার জন্ম। সাতমহলা প্রাসাদের রাণী সে নয়, সে সত্যিকারের সকল মানুষের রাণী। তার আশ্রয় দেবতার আশ্রয়। তার কথা বরাভয় দান কোরবে। তার সেবায় অন্ধ আতুরের হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তার নিষ্ঠায় দেবতার ঘুম ভাঙবে। সে যে একাধারে অন্নপূর্ণা আর একাধারে বরাভয়দায়িনী মহাশক্তির আঁধার। মা হোয়ে সন্তান পালন করাই হ'বে তার ধর্ম। সে যে সকলের মা।

এত বড় প্রাসাদ, এত ঐশ্বর্য, এত লোকজন। রাণী কিন্তু নিজেকে হারালেন না—আরামের বিলাস শয্যায় তিনি গা মেলে দিলেন না, নিত্য নতুন সাজে তিনি নিজেকে সাজালেন না। ভালো ভালো জিনিষ তিনি নিজের ভোগে লাগলেন না।

এ আবার কেমন বৌ গো। এ যে কিছুই চায় না, এর কি কোন কামনা বাসনা নেই। আলমারী ভর্তি দামী দামী কাপড়, গয়না, কত জিনিষ, সে তো কোন কিছুর দিকেই ফিরে চায় না।

অবাক হোয়ে যান প্রীতিরাম, চিন্তিত হন রাজচন্দ্র, চমকে যায় অন্যান্য সবাই।

প্রীতিরাম রাণীর বেশ দেখে বড় ব্যথা পান। তাঁর এত ঐশ্বর্য, আর তাঁর ঘরের লক্ষ্মীর এ বেশ কেন। তিনি বলেন, মা, এ তোমার কি বেশ, পরনে লাল পাড় শাড়ী, হাতে লাল শাঁখা আর দুগাছা সরু চুড়ী, কেন মা! কাশী থেকে আনা সেই যে সোনার জরি দেওয়া বারশো টাকার শাড়ী সেটাও তো পরতে পারো।

রাণী হেসে জবাব দেন, সবই আছে বাবা! মেয়েদের এই বেশই তো ভালো। আপনি যে রোজ আমায় আশীর্বাদ করেন তাইতো আমার কাছে সব বেশভূষা সব অলংকারের চাইতে অনেক বেশী, আমার মত সুখী এ দুনিয়ায় কে আছে! আপনার মত শ্বশুর, ঐ রকম স্বামী আবার কি চাই। এসব কি আপনার ঐশ্বর্যের চেয়ে কম দামী।

প্রীতিরাম আর কোন কথা বলেন না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন মর্তের এই দেবীকে।

রাজচন্দ্ররও অভিযোগ কম নয় রাণীর বিরুদ্ধে। তিনি মাঝে মাঝে বলেন, আচ্ছা রাণী! তুমি কি অতীতকে ভুলতে পারছো না।

রাণী হাসেন, কি বোলতে চাও, পরিষ্কার কোরেই বল না। আমি বাপু মুখ্যুমানুষ অত শত বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারিনে।

বোলছিলাম, এক কালে তুমি গরীব ছিলে কিন্তু এখনও কি তুমি তাই আছো।

একথা কেন?

ভালো কাপড় পরোনা, ভালো গয়না পরোনা, দাস দাসীদের খাটতে দাও না।

রাণী হাসছেন। স্বামীর দিকে চেয়ে শুধু হাসছেন। পরে একটু থেমে বোললেন, তোমার মত স্বামী যার তার কি শাড়ী গয়না দরকার। তুমি আশীর্বাদ করো যেন জনম জনম আমি এমনিভাবে সকলের সেবা কোরতে পারি। সত্যিই আমি জানি আজ

আমার কোন অভাব নেই। কিন্তু আমি যে কত গয়না শাড়ী পেয়েছি এর মধ্যে যে আমার রাখবার জায়গা নেই।

কে দিল এত জিনিষ, রাখলেই বা কোথায় ?

পেয়েছি তোমার কাছে, বাবার কাছে আরও অনেকের কাছে রেখেছি বুকের ভিতরে। সকলের আশীর্বাদ আমার মাথায় এত জমেছে যে চলতে ফিরতেও আমার অসুবিধা হয়।

রাণী—

বলো গো, তোমরা যে কত ভালো, কত মহৎ, কত উদার, ভাবতে গেলেও বিস্মিত হোতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো!

কি ?

মনে হয়, সম্পূর্ণ বাড়ীটাই যেন এক বিরাট দেবমন্দির। তোমরা সবাই আমার জাগ্রত দেবতা আর আমি তোমাদের নিত্যপূজোর পূজারিণী!

রাজচন্দ্র আর কিছু বলেন না। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন।

রাণী ব্যস্তভাবে চলে যান। রাজচন্দ্র ভাবেন, রাণীর ভিতর কে যেন লুকিয়ে আছে আত্মগোপন কোরে। এমন প্রতিভাধর নারী রাজচন্দ্র জীবনে কোনদিন দেখেন নি। এমন পরহিতে ব্রতী, এমন ধৈর্য তিতিক্ষা, এমন মানুষ আপন করা মানুষবা কোথায় আছে। তাই ডুবতে হ'বে রাণীর হৃদয় সরোবরে। রাজচন্দ্র সম্পত্তির ব্যাপারে সবসময় রাণীর সংগে পরামর্শ করেন। অবাক হোয়ে যান রাণীর বুদ্ধি দেখে। যে সব বিষয় রাজচন্দ্র বা প্রাতিরাম সমাধান কোরতে পারছেন না রাণী তা এক নিমিষেই কোরে দিচ্ছেন। রাণীর বুদ্ধিও বিচক্ষণতায় প্রীতিরাম এত সম্পত্তির মালিক হোলেন যে তার সঠিক হিসাব দেওয়াই কঠিন হোয়ে উঠলো।

হুকডবসন কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হোল। এই কোম্পানীতে রাজচন্দ্রর এক ভগ্নিপতী কাজ কোরতেন। কোম্পানী দেউলে হোয়ে গেলো। রাজচন্দ্র সেই কোম্পানীর সাহেবকে এক লক্ষ টাকা ধার দেবেন বোলে কথা দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর সাহেব সেই এক লক্ষ টাকা ধার চাইলেন। আপত্তি জানালেন ভগ্নিপতী, ডুবে যাওয়া কোম্পানীকে টাকা ধার দিলে তা আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সত্যাশ্রয়ী রাজচন্দ্র এক লক্ষ টাকা সাহেবকে দিয়ে দিলেন। সত্য যা তাই তো ধর্ম। সেই সত্যধর্ম পালন কোরতে রাজচন্দ্র সেদিন পেছিয়ে যান নিঁ।

রাণী স্বামীর এই কাজে এত সন্তুষ্ট হোয়েছিলেন যে টাকা দেওয়ার পর বোলেছিলেন, তুমি শুধু রাজচন্দ্র নয় তুমি রামচন্দ্র। তুমি যেমন সত্য, তোমার ধর্মও তেমন সত্য। আমাকে তুমি বাঁচালে, তোমার জন্যই তো আমি দেবতার আশীর্বাদ পেলাম! তুমি তো শুধু মানুষ নয়, তুমি আমার রাজা রামচন্দ্র।

রাণী আনন্দে যেন আত্মহারা হোয়ে গেলেন। জানবাজার আজ রাণী রাসমণির নামে মুখরিত।

প্রীতিরাম ও রাজচন্দ্রর নাম আজ আর হয়তো কারও মনে নেই কিন্তু এই মহীয়সী নারী যিনি আজ লোকমাতা হোয়ে মানুষের হৃদয়ে পটের ছবি হোয়ে আছেন তার পিছনে প্রাতিরাম ও রাজচন্দ্রের দান কম ছিল না।

আজকের মানুষ সোজা পথে চলে না, চলতে জানে না। আঁকা-বাঁকা পথই আজ মানুষের পদরজ মাখা। যে সরল সজ্জন তাকে আজ অনাহারে উপবাসে দিনের পর দিন কাটাতে হোচ্ছে, যাদের কথার মূল্য জীবনের মূল্যের মত তারা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন কোরেছে। ফাঁকীবাজ আর শঠে দেশ গেছে ছেয়ে, তাদের দাপটে আজ ধরিত্রী টলমল কোরছে. তাদের অনাচারে আজ দেবদেবতা চঞ্চল।

সে প্রীতিরাম আর রাজচন্দ্রর মত মানুষের দেখা আর এ যুগে কোথায় মিলবে? আর রাজার ঘরের বৌ হোয়ে রাজঐশ্বর্যের ভিতর থেকেও যে বৈরাগ্যের সাধনা কোরতে পারে সে কি সাধারণ মানুষ।

ভারতের সাধনা বৈরাগ্যের সাধনা, আত্মনিবেদনের সাধনা, আমাদের পরমাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ।

১২৩০ সালে হরেকৃষ্ণ দাস দেহত্যাগ কোরলেন।

রাণী গেলেন গংগার ধারে পিতার চতুর্থীর শ্রাদ্ধ কোরতে। কোনার গংগায় যে মেয়ে স্নান করতো, সেই মেয়ে রাণী রাসমণি হোয়ে এলেন কলকাতার গংগায় শ্রাদ্ধ কোরতে।

কিন্তু একি ঘাটের অবস্থা! পবিত্র সুরধনীতে যারা দেহমন ডুবিয়ে মোক্ষ লাভ কোরবেন সে ঘাটের এই অবস্থা দেখে তাঁর বড়কষ্ট হোল। স্বামীকে এসে জানালেন মনের ব্যথা।

রাজচন্দ্র গ্যারিসন অফিসারের অনুমতি নিয়ে বহু টাকা খরচ কোরে ছত্রিশটি থাম আর চাঁদনী সমেত বাবুঘাট তৈরী কোরে দিলেন।

সকলের আশীর্বাদ এসে জমা হোল রাণী রাসমণির মাথায়।

সে যুগে গংগার বুকে অন্তিম আশ্রয় পেলে মানুষ স্বর্গে যেতো। মহাপাপী যে তারও মাথায় একফোটা গঙ্গাজল পড়লে সেও বুঝি পাপ থেকে মুক্তি পেতো। সে গঙ্গা আজও আছে তার কলতানে আজও আছে মোক্ষের সুর। মুক্তির ব্যঞ্জনা, কিন্তু সে মানুষ কই? সে মানুষ যেন কোন পথ দিয়ে কোথায় চলে গেছে। সে বিশ্বাস মানুষের নেই। বিজ্ঞান আজ বিধাতা, বিধাতা আজ ঘুমন্ত। সবই নাকি বিজ্ঞানে সম্ভব হোচ্ছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা, আত্মিক সাধনা এও কি চিরকাল বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত কোরেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে প্রেমভক্তির বন্যায় মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। মীরার সাধনা, চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির ভাবধারা, এসব কি বিজ্ঞানে সম্ভব? সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের যিনি কর্তা তিনিই তো সবকিছুর নিয়ন্ত্রতা, তিনিই তো ভাঙছেন তিনিই তো গড়ছেন। বিধাতা ছাড়া বিজ্ঞান মৃত, বিধাতা ছাড়া বিজ্ঞান কোথায়? বিজ্ঞানীর সাধনাই তো ভগবদ সাধনা। কারণ পরিপূর্ণ সত্যের প্রকাশ একমাত্র বিজ্ঞানে আছে।

রাজচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হোয়ে পড়লেন! কমা তো দূরের কথা সে অসুখ দিন দিন বেড়েই চললো। কত ডাক্তার কত ওষুধ। রাণী রাসমণি তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা কোরলেন। রাজত্ব যায় যাক, বাড়ী ঘর দোর সব যাক তিনি তাঁর স্বামীর প্রাণটুকু ফিরে পেলেই আর কিছু চান না। কিন্তু বিধাতার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম।

রাণী রাসমণির বন্ধন ছিন্ন না হোলে তো বিশ্বকল্যাণ ব্যহত হ'বে তাই রাজচন্দ্রকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হোল।

১২৪৩ সাল। রাসমণির বয়স তখন ৪৯।

রাজচন্দ্র চলে গেলেন কিন্তু রেখে গেলেন যশের মুকুট। রাসমণির মত স্ত্রী আর তিন মেয়ে তিন জামাই আর কয়েকটি নাতিনাতনী।

রাণী রাসমণি স্বামীর বিয়োগে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্বল বড় অবলম্বন যে স্বামী সেই স্বামী জনমের মত ছেড়ে গেলে যে কি অবস্থা হয় তা এক ভুক্ত ভোগীরাই জানেন।

রাণী কাঁদলেন কিন্তু ধীরে ধীরে পাথরের মত শক্ত হোলেন। স্বামীর এই অগাধ সম্পত্তি তিনি কিছুতেই এক তিল নষ্ট হোতে দেব্বেন না।

রাণী রাসমণি খুব জাক জমক কোরে স্বামীব শ্রাদ্ধ কোরলেন। দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এলেন। তাছাড়া আরও প্রায় ৩৫।৪০ হাজার মানুষ পেট ভরে খেলো। প্রত্যেকেই কাপড়, টাকা পয়সা দান গ্রহণ কোরল। পরের দিনও অনুষ্ঠান শেষ হোলনা। তিনি ওজন হোলেন। একদিকে রূপোর টাকা আর একদিকে রাণী। ৬০১৭ টাকা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলি কোরলেন তিনি। স্বামীর শ্রাদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হোল।

একবার এক সন্ন্যাসী ভর দুপুর বেলায় এলেন। রাজচন্দ্রর সংগে দেখা কোরতে চাইলেন। তিনি তাঁকে রঘুনাথজীর একটা মূর্তি দিয়ে

তাঁর নিত্য পূজা কোরতে বোলে গেলেন। সেই 'রঘুনাথজী' রাণী-রাসমণিকে বুঝি সব সময় আগলে রয়েছেন।

সেই সাধু রাজ চন্দ্রর শ্রাদ্ধবাসরে এসেছিলেন কিন্তু তিনি কোন দান গ্রহণ না কোরে রাসমণিকে আশার্বাদ কোরে গেলেন—তুমি সবাইকে রক্ষা করো। ধর্মে তোমার মতি থাকবে।

রাণী রাসমণির জীবন নাট্যের তৃতীয় অংক শুরু হোল। এবার তিনি হোলেন পালিকা। তাঁর এ বৃহৎ নাট্যের পার্শ্ব চরিত্র হোলেন জামাই মথুর বাবু। এত বড় সম্পত্তি যার তাঁকে কতকখানি বুদ্ধি ধরতে হয় তার কি কোন হিসেব আছে। সমস্ত কোলকাতায় তাঁর সম্পত্তি। বাইরেও প্রচুর জমি জায়গা। আশী লক্ষ টাকার ব্যবস্থা নগদ টাকা সোনা দানা তারও তো পরিমাণ কম নয়। ওসব রক্ষা করতে কি যে সে পারে!

সকাল থেকেই শুরু হোত তাঁর কাজ। দুপুরে একটু বিশ্রাম, সন্ধ্যায় দেব সেবা। ভাগবত পাঠ। রামায়ণ গান। কথকতা। তিনি মন প্রাণ এক কোরে শুনতেন সেইসব মহাজ্ঞানের কথা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন তিনি এসব।

ক্রমে ক্রমে রাণী রাসমণির দুটো রূপ ফুটে উঠলো। এক ফুলের মত কোমল আর এক বজ্রের মত কঠিন। অত্যাচার অবিচার তিনি কঠিন হস্তে দমন কোরতেন।

প্রজাপালন যে রাজার ধর্ম। প্রজার সুখ দুঃখের ভাগীদার না হোলে যে জমিদার হওয়া যায় না তা রাণী রাসমণি যা দেখিয়ে গেছেন তা ইতিহাসের পাতা থেকে কোনদিনই মুছে যাবেনা।

ঠোনার খাল সংস্কার, জেলেদের জলকর মাপ কোরে দিয়ে তাদের রক্ষা করা। নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যচার, গোরা সৈন্যদের খড়্গ নিয়ে মহাশক্তি সেজে লড়াই। যতদিন পুঁথিপত্র থাকবে এসব ততদিন মুছে যাবে না।

শক্তিরূপিনী না হোলে তার পক্ষে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়।

একধারে অসুর বিনাশিনী শক্তি আর একদিকে বরাভয়দাত্রী মাতৃভাব এই দুই নিয়েই তো রাণী রাসমণি।

একবার ত্রিবেনীতে গংগাস্নান কোরবার ইচ্ছে হয়। ফেরার পথে তাঁর বাপের ভিটে দেখার সাধ হওয়ার কোনা গ্রামে এসেছিলেন। কোনার সেই ছোট মেয়েটি আজ তিরিশ বছর বাদে এসেছে গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো। হালিশহর, নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, কাঞ্চন পল্লী, চাকলা, মালঞ্চ, জেথিয়া, ডিঙ্গনী, প্রভৃতি যায়গা থেকে দলে দলে লোক এলো রাসমণিকে দেখতে।

কোনা গ্রামে সেদিন যেন উৎসব লেগেছে। বাল্যের সহচরী শ্যামার বিয়ে হয়েছে সে সুখে ঘর সংসার কোরছে, আর আর সঙ্গীদের কেউ কেউ পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে। রাণী রাসমণি তাদের জন্য চোখের জল ফেললেন। অন্তর যাদের কাঁদে তারা বড় হলেও কাঁদে। তাদের চোখের জল সবার জন্য। গ্রামের গরীব দুঃখীদের তিনি হাজার হাজার টাকা দান কোরলেন।

রাণী ফিরে এলেন কোনা গ্রাম থেকে জানবাজারে। বাংলাদেশ বহু সাধনা কোরে দুজন রাণী পেয়েছে! এক রাণী ভবানী আর এক রাণী রাসমণি। এই দুই রাণী নিয়েই তো সেদিনকার বাংলার গর্ব ছিল। বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থায় রাণী ভবাণী বা রাণী রাসমণির মত রাণী যদি থাকতো তাহলে মানুষের এ দুর্গতি আজ হোত না।

১২৫৫ সাল।

রাণী রাসমণির মন ব্যাকুল হোয়ে ওঠে তীর্থ যাবার জন্য। বিষয় ঘেঁটে ঘেঁটে তো জীবনের তিনভাগ সময় কেটে গেলো এবার মালিকের খোঁজ করার জন্য তাঁর মন পাগল হোল। সম্পত্তি, বিষয়, ঐশ্বর্য, সোনা দানায় তো ঘর ভরে উঠলো কিন্তু মনের ঘরে তো কিছুই নেই। এ ঘর ভরবে কিসে? এসব ঘেঁটে ঘেঁটে তো দেহে মন জ্বালায় ভরে গেলো কিন্তু শান্তি পেলেন কই। এ সবে বুঝি শান্তি মেলে না, সুখ মেলে না, আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দময়ীকে না পেলে

বুঝি আনন্দ মেলে না, সুখের আঁধার যিনি শান্তির মহাকর্ত্রী যিনি তাঁর খোঁজ তো করা হোল না।

"রাণী মা, কিছু খেতে দেন" এক ভিখারী সদর দরজায় চীৎকার কোরছে! দারোয়ান তাকে আসতে দেবে না।

রাণী রাসমণি বোললেন ওকে ভেতরে আসতে দাও।

ভিতরে এলো ভিখারী, হাতে তার একতারা।

রাণী বোললেন একটা গান গাও শুনি—

ভিখারী গাইতে লাগলো—

ডাক দেখি মন ডাকার মত

কেমন শ্যামা থাকতে পারে।

রাণী রাসমণি চঞ্চল হোয়ে গেলেন আর না গান থামাও, টাকা আর কাপড় দিয়ে তিনি তাকে বিদায় কোরে ডাক দিলেন জামাই মথুর বাবুকে।

সংগে সংগে মথুরবাবু এসে হাজির হোলেন।

মথুর আমি কাশীধামে যাবো, যত তাড়াতাড়ি পারো সব ব্যবস্থা করো।

বেশ তো আমি এখুনি সব ব্যবস্থা কোরছি।

মথুর, দু-একদিনের মধ্যেই আমি যাত্রা কোরতে চাই। মন একবার পাগল হোলে আর ঘরে মন বসে না। হৃদয়ে একবার যদি তোলপাড় সুরু হয় সব কিছু ওলট পালট হোয়ে যায়। তাই আর দেরী নয়! দেরী হোলে বুঝি আর পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পাওয়া যাবে না!

তখনকার দিনে তো রেলপথ ছিল না। পায়ে হেঁটে আর নদী পথেই মানুষ তীর্থ যাত্রা কোরত। সব ব্যবস্থা হোয়ে গেলো। তিরিশখানা বজরা পাইক বরকন্দাজ খাদ্য সামগ্রী, গরু, বিচালি, ডাক্তার বৈদ্য গোয়ালা, ধোপা, নাপিত সব তৈরী হোয়ে গেলো। যেন একটা গোটা রাজ্য উঠে চলেছে কোথাও। অনেক দিন থেকেই এ সাধ তাঁর মনে ছিল যে কাশীতে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার চরণ দর্শন কোরতে হবে।

যাত্রার দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই যেন রাণীর আগ্রহ কমে যেতে লাগলো। সারা দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে—নিরন্ন মানুষের বুকফাটা করুণ কান্না তার কানে আসছে। দুটো ভাতের জন্য কত মানুষ যে মারা গেলো তার কোন হিসেব নেই। দেশের এই দুরবস্থা তিনি কি কোরে তীর্থে যাবেন! তাঁর মন কেঁদে উঠলো। এদের বুক ফাটা কান্নাকে দুপায়ে দলে তিনি কি কোরে যাবেন বিশ্বেশ্বর দর্শনে। এই যে মানুষের জন্য ব্যথা, তাদের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মেশানো একি সবাই পারে? তাইতো রাণী রাসমণি রাণী, প্রজাপালিকা, লোকমাতা সাধিকা।

এখন যেমন দেশ জোড়া অভাবের ভিতর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কোরে আমাদের শাসকেরা বড় বড় অধিবেশন করেন। আকারণে লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয় হয়—অথচ মানুষ কাঁদে ক্ষুধার জ্বালায়। পথ্য অভাবে ঘরের শিশু রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে।

যে মাটিতে রাণী রাসমণি, রাণী ভবানী জন্মেছেন সে মাটিতে এসব পাতাল ফোঁড় দেশ নায়ক কোথা থেকে এলো।

রাসমণির চোখে ঘুম নেই। রাতে স্বপ্ন দেখেলেন—মা অন্নপূর্ণা বোলছেন—তোর আর কাশী যেতে হবে না। এইখানে ভাগীরথী তীরে শিবশক্তির মূর্তি প্রতিষ্ঠা কোরে তার নিত্য পূজো ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি রোজ এইখানেই তোর পূজা নেবো। রাণী রাসমণি বোললেন মথুরকে, বজরা ফেরাও আমি আর কাশী যাবো না—মা আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, এখানেই তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা কোরে পূজা কোরতে।

বজরা ফিরে চললো গংগার ধার দিয়ে—রাণী শুনতে পেলেন—কে যেন আকুল স্বরে গাইছে।

কাজ কিরে মন গয়া কাশী
তোর পদতলে পড়ে আছে গয়া গংগা বারানসী

বজরা ফিরে এলো। যত জিনিষ পত্তর ছিল সব গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হোল। গরীবের দুঃখে এমন প্রাণ কার কাঁদে।

গংগার পশ্চিমকুল বারানসী সমতুল ভেবে মন্দির প্রতিষ্ঠার যায়গা খুঁজে শেষে পূর্বদিকে দক্ষিণেশ্বরেই যায়গা পাওয়া গেলো মনের মতন। এখানেই পঞ্চবটি রোপন করা চলবে। এ না হোলো যায়গা। মূর্তি প্রতিষ্ঠা এখানেই হবে। সাধন ভজনের এই তো উপযুক্ত স্থান।

সর্বপাপহারিণী ভাগীরথী তীরে মহান তপস্বিনী সাধিকা রাণী রাসমণি মহামায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরলেন ষাট বিঘা জমির ওপর। শক্তির দক্ষিণ পাশে প্রতিষ্ঠা করলেন দ্বাদশটি শিবের মন্দির।

কিন্তু ভোগই বা রাঁধবে কে? আর নিত্য পূজোই বা কে কোরবে? পণ্ডিতদের মতামত নেবার জন্য লোক ছুটল, কাশী, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর। কেউই মত দিলেন না। রাণী ভেঙে পড়লেন ভাবনায়? দেবতার পূজা করবার অধিকার তাও সকলের নেই! মায়ের সন্তান তো সবাই তবে এ ভেদ কেন!

ঝামাপুকুরের টোলের পণ্ডিত রামকুমার সব ব্যবস্থা করলেন ও পূজো করবার ভার নিলেন। শক্তি পূজার সাধক ভক্ত রামকুমার নিত্য সেই ঝামাপুকুর থেকে পায়ে হেঁটে পূজো কোরতে আসতেন।

রাসমণির সাধনা ব্যর্থ হবার নয়।

১২৬২ সালের সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার তিথিতে জগৎ বিখ্যাত মন্দির তৈরী হোল। রাসমনি দক্ষিণেশ্বরকে ভারতের এক মহাতীর্থে পরিণত কোরলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত যায়গা থেকে পণ্ডিতরা আসলেন। এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে রাসমণি নয় লক্ষ টাকা খরচ কোরেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরবার পর রাম কুমারের কাজ বেড়ে যায়। টোলের ছাত্র বাড়তে থাকে, এদিকে পূজো। একা যেন আর সামলাতে পারেন না। তাই খবর দিয়ে

কামারপুকুর থেকে ছোটভাই গদাধরকে নিয়ে এলেন। তিনি ভাবলেন গদাধর তো ছোটবেলা থেকেই পূজার্চনার প্রতি আকৃষ্ট তাছাড়া দেবদ্বিজে ভক্তিও আছে, ও এলে তাঁর অনেক সাহায্য হবে! মায়ের অপূর্ব খেলা!

সবাইকে এক যায়গায় একত্র না কোরতে পারলে তো তার খেলা জমবে না। তাই হুগলী জেলার কামারপুকুর আর কোনা জানবাজার সব একাকার হোয়ে গেলো।

গদাধর ছোটবেলায় শুনেছিলেন যে, ঠাকুরকে ডাকলে তিনি আসেন. কথা বলেন দেখা দেন, তাই সেই থেকে তাঁর মন পাগল হোয়েছে যে যাকে পেলে আর কিছু পাওয়ার লোভ থাকে না সেই পরম বস্তুকে পেতে হবে। লেখাপড়ায় তাঁর কোন তৃষ্ণা নেই। ওসব করে কি হ'বে। দেবতার দর্শন পেতেই হ'বে। তাকে ডাকতে হবে তো সে নাম ধরে ডাক দিলেই চলবে তার জন্য আবার লেখাপড়ার কি দরকার, শুধু চাই আত্মবিশ্বাস আর আকুলতা।

গদাধর চলে এলেন কোলকাতায়। রূপের মধ্যে অরূপের আবির্ভাব সতেরো বছরের গদাধর এলেন দক্ষিনেশ্বরে। প্রণাম জানালেন মা ভবতারিণীকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন, হাসলেন আবার সবার আলক্ষ্যে কাঁদলেনও। যেন এইভাবে—তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াছি সেই কবে থেকে আর তুমি দিব্যি এসে এখানে বসে আছো। এবার শক্ত কোরে বাঁধবো যাতে আর পালাতে না পারো। গদাধর ভাবলেন—ডুব দিতে হ'বে। মনের গহনে ডুবতে হ'বে নইলে তো অরূপ রতন মিলবে না।

গদাধর দেখলো চারিদিক। একপাশে পঞ্চবটি আর একপাশ দিয়ে মা গংগা কুলকুল কোরে বয়ে চলেছে যেন বোলছে—ওরে বসে যা, ভাবছিস কি—মাকে জাগা। নিজে জাগ সবাইবে জাগা।

গদাধর বেশ ভালভাবেই মন বসিয়ে দিল এই দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে, সবই মায়ের ইচ্ছে—গদাধরকে তাই তো তিনি এনেছেন। তিনি

মাঝে মাঝে তন্ময় হোয়ে যান। কি যে ভাবেন তা তিনিই জানেন। মনের ভিতর তাঁর মাঝে মাঝে কে যেন আসেন।

গদাধর পঞ্চবটি বনে বসে কখনও গান ধরেন—

ওগো আনন্দময়ী হোয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোর না।
(ওমা) দুটি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না।
তপন তনয় আমার মন্দ কয়, কি বলিব তার বল না।
ভবে না বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।
অকুল পাথারে ডুবাবি আমায় মা স্বপনেও এতো জানিনা।
অহরহনিশি দুর্গা নামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেলো না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না।"

মাকে ডাকতে আবার মন্ত্র কি, তন্ত্র কি! মা মা বোলেই ডাকলেই তো সব হোল. নিজের মাকে ডাকতে আবার বই পড়তে হবে কেন! ডাকার মত ডাকতে পারলে মা নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। গদাধর রামকৃষ্ণ হোয়ে শুধু 'মা' মন্ত্র দিয়েই ভবতারিণীকে পেয়েছেন।

মথুরবাবু একদিন রামকুমারকে বোললেন—ছোটভাইকে মায়ের পূজোয় লাগিয়ে দিন না কেন? উনিও তো বেশ নিষ্ঠাবান বোলেই মনে হয়। গদাধর প্রমোশন পেলেন।

একেবারে মা ভবতারিণীর পূজারী। মা ধীরে ধীরে কাছে টানছেন। গদাধর একদিন পূজো কোরতে কোরতে ভাবামাধি হোলেন। গদাধরের পূজার্চনা কোন বাধা ধরা নিয়মে চলে না, তাই দেখা যায় ঘরময় ফুলপাতা ছড়ানো। মনে হয় দূর থেকে কেউ ছুড়ে দিয়েছেন।

মায়ের পূজা তার আবার নিয়ম কি! পূজাপদ্ধতি মানবে তারা যাদের কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু গদাধর যে মাকে জানেন, মাকে চেনেন—তাই শুধু চাই ভক্তি, আর এই ভক্তিতেই সব আছে।

ভারতের সাধনা ভক্তি সাধনা। এই ভক্তির জোরেই কত সাধক-সাধিকা দেবতার দর্শন পেয়েছেন।

মথুরবাবুর মনের সংসয় যায় না। গদাধরকে ঠিক বুঝতে পারেন না যে, কেমন ঠাকুর তিনি।

মথুরবাবু বোললেন—আপনি তো মায়ের পূজো করেন আজকাল ?

গদাধর বুঝতে পারেন মথুরবাবুর মনের কথা। বোললেন—বুঝেছি মনে একটা অবিশ্বাস জন্মেছে, ওরে মা যে আমার জাগ্রত। আমি বিশ্বাস করি, এই বিশ্বাস নিয়েই তো মার কাছে আসতে পেরেছি।

বিশ্বাস কোরলে সব হয় ?

হ্যাঁ সব হয়—

এই জবাগাছে সাদাফুল দেখাতে পারেন ?

হ্যাঁ মায়ের ইচ্ছে হোলে সবই সম্ভব, তুমি দেখবে আচ্ছা কাল সকালে এসো !

মথুরবাবু চলে গেলেন !

গদাধর বোললেন মায়ের কাছে—মা ওর অবিশ্বাসী মনটাকে একটু মোড় ঘুরিয়ে দে, আমি যে ওকে কথা দিলাম সাদা জবা দেখাবো তোর ওপর বিশ্বাস কোরেই তো বোললাম। তুই তো সব পারিস।

পরদিন মথুরবাবু এসে জবা গাছে সাদাফুল দেখে অবাক হোয়ে ভাবলেন, এ পূজারী তো সাধারণ পূজারী নন। বিশ্বাস যে কোরতে পারে তারই শুধু নিঃশ্বাস বয় আর সবই তো মরা।

দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসে রাসমণির কানে, এমন সুরে কে গায় !

কে একজন বলে—মন্দিরের ছোট ঠাকুর।

রাণী রাসমণি চমকে ওঠেন, এ সুর তো তাঁর অপরিচিত নয়। কবে যেন শুনেছেন তিনি !

সবাই চিনতে ভুল কোরলেও রাণীমার চিনতে ভুল হয়নি যে গদাধর পাগল নয়, পাগলের ওঝা।

গদাধর পাগলের মত রাতবিরেতে পঞ্চবটি বনে ঘুরে বেড়ায়। পূজা অর্চনাও যেন কেমন ধারা করেন। মায়ের ভোগ দিয়ে নিজেই মাকে

কখনও খাইয়ে দিচ্ছেন, কখনও নিজে খাচ্ছেন আবার কখনও নিজে খেয়ে মাকে দিচ্ছেন। ঠিক যেন জ্যান্ত মা। গদাধর বোলছেন—কি খাবিনে, কেন রাগ হোল বুঝি? ও আমায় খেতে বোলছিস, বেশ এই তো খাচ্ছি, এবার তুই খা!

ভাগনে হৃদয় লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে আর ভয়ে আধমরা হোয়ে যায়। ভাবে, তার মামা ঠিক পাগল হোয়ে গেছে, কিন্তু কেউ দেখে ফেললে তো মামার ধড়ে আর প্রাণ থাকবেনা। চাকরীও যাবে।

কখনও নিজেই মায়ের সিংহাসনের ওপর শুয়ে পড়ে বোললেন—আমায় শুতে বোলছিস, বেশ শুলাম। সকালে দেখা গেলো হয়তো গদাধর মায়ের সিংহাসনের পাসে ঘুমে অচেতন। তাঁর কোন জ্ঞান আছে কি না কে জানে।

গদাধর ঘিরে থাকেন মাকে যেমন কোরে সন্তান মাকে জড়িয়ে থাকে। নিজের খেয়ালে পূজা করেন। পূজোর সময় শুধু মা মা ডাক আর কিছুই নয়।

মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীরা মথুরবাবুকে বোললেন, মন্দিরে পূজো হোচ্ছে না, যা হোচ্ছে তা অনাচার। পাগল দিয়ে কখন এসব কাজ হয়।

একদিন মথুরবাবু নিজে এলেন দেখতে। পাগল গদাধর তখন তন্ময় হোয়ে আসনে বসে আছেন, দু'চোখে জলের ধারা। গদাধর শুধু বোলছেন—মা দেখা দে, পাষাণী হোয়ে আর কতকাল থাকবি! মা বোলে কি শুধু শুধু আমি ডাকি, আমার সাথে কথা বল, কি চাস! আমার তো কিছু নেই, বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, আছে শুধু মা মা বলে ডাকার ক্ষমতা।

মথুরবাবু ফিরে যান। রাসমণিকে সব জানান।

রাসমমণি মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানান। মায়ের পূজোর আসল পূজারী এবার মিলেছে। রাসমণি গদাধরকে চিনেছেন। তিনি হুকুম দিলেন—ছোট ঠাকুর যে ভাবে খুশী পূজো করুন তাতে

কারও কিছু বলার নেই। তিনি তাঁর ইচ্ছে মত কাজ কোরবেন, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়।

মথুরবাবু হলেন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষক। তিনি তো জন্মেছেন এই জন্যই। তিনি মন্দিরে যখনই আসেন তখনই তার চোখে জল আসে। এ যেন সবাই উন্মাদ।

রাণী রাসমণি মাঝে মাঝে মন্দিরে আসেন ঠাকুরের মুখে গান শোনার লোভে। ঠাকুরের গানে রাসমণি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ না দেখে।
কামনা দিয়ে দিয়ে, ফাঁকী আয় মন বিরলে দেখি।
রসানারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বোলে ডাকে।
কুরুচী কুমন্ত্রী যত। নিকট হতে দিওনা কো।
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলা কান্তর মন ভাই আমার এই নিবেদন
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে।

ঠাকুর যে কে তা জানেন রাসমণি আর রাসমণি যে কে তাও জানেন ঠাকুর।

ঠাকুর বলেন—ওকি যে সে। ওকে তোমরা কেউ জানো না, ও যে শ্রীরাধার অষ্টসখীর এক সখী।

রাসমণি আর ঠাকুর একই ঘরের মানুষ। একই ভাবধারায় দুজনার জীবন সাধনা। নররূপে মর্তে লীলা। এঁরা দুজনে যেন কত ফাঁক কিন্তু অন্তরে এঁরা এক। যে রাম সেই কৃষ্ণ—দুয়ে মিলে রামকৃষ্ণ। মানুষরূপে দক্ষিণেশ্বরে ভগবানের আবির্ভাব। সাধন ভজন তো অনেকেই করেন কিন্তু এমন সাধনার কথা কি কেউ শুনেছে। রামকৃষ্ণর সাধনা আত্মার সাধনা। তাই তো আত্মানুসন্ধান কোরে পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছেন।

একদিন রাণী রাসমণি এসেছেন মন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন পূজায় মত্ত। রাণী রাসমণি তাঁর পূজা দেখছেন। সেই একই পূজা। যেমন করে ছেলে মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলার ফুল ফেলে দেয় মূর্তির গায়। ভোগ দিয়ে বলে এবার খাও তবে আমরা প্রসাদ পাবো। রামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর—দেখা দে মা, কমলা কান্তকে দেখা দিলি রামপ্রসাদকে দেখা দিলি ! তাদের সঙ্গে কত খেলা খেললি আর আমি কি দোষ কোরলাম।

হঠাৎ ঠাকুর রাসমণির পিঠে একটা চড় মেড়ে বোললেন—কি এখানেও সেই বিষয় চিন্তা। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেলো। রাণামার গায়ে হাত। এবার ঠিক শিক্ষা পাবে। দূর কোরে তাড়িয়ে দেবে। সবাই ভয়ে জড়সড়। কি যেন একটা ব্যাপার এখুনি ঘটে যাবে।

রাণা রাসমণি সবাইকে বোললেন—কেউ যেন ঠাকুরকে কিছু না বলেন। তিনি এই আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

রাণী রাসমণি শৈশব থেকেই সাত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। এত ঐশ্বর্যও তাঁকে পিছল পথে চালিত কোরতে পারেন নি। গরীবের ঘরে জন্মে, দরিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়ে তিনি ভাগ্যগুণে ধনী হোয়েছেন কিন্তু অতীতকে তিনি ভোলেন নি। গরীবের ব্যথা যে কি তা তিনি জানেন তাই আজ তিনি সকলের রাণী। রাণী রাসমণির ভাগ্যে রামকৃষ্ণর মত গুরু পাওয়া কোন দৈব ব্যাপার নয়।

মা ভবতারিণীই আগে থেকেই সব নির্দিষ্ট কোরে রেখেছিলেন। এরকম নিরঅহঙ্কারী নির্লোভী গুরু কজনের ভাগ্যে মেলে।

রামকৃষ্ণ বলতেন—আমি আবার কি জানি। মাই আমার সব তিনিই সব জানেন। আমার মন্ত্রতন্ত্র শাস্ত্র তো সবই তো তিনি। আমাকে যা তিনি বলান তাই আমি বলি, যা তিনি আমায় করান তাই আমি করি। কখনও বলেন --'মায়ের চরণে পৌঁছানোই হোল সার কথা, যে যে রাস্তায় পারো যাও। ছাদে উঠতে হোলে সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পারো, মই দিয়েও উঠতে পারো, লক্ষ্য তো সবারই এক। পথ যদি আলগা হয় তাতে কি যায় আসে।'

এমন কথা এর আগে কেউ কি শুনেছে। সোজা সরল ভাব না আছে পাণ্ডিত্যের বহর, না আছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা। অথচ কি অপূর্ব। এমন অমৃতময় বাণী। এমন সহজ ভাবে মানুষের ভিতর দেবত্বভাব বিতরণ করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

রাণী রাসমণির জীবন সার্থক, তাঁর দরিদ্র নারায়ণ পূজা সার্থক। এই সাধনার ভিতর দিয়েই পেলেন তিনি মাতৃকৃপা। যা পেলে সব পাওয়া যায়, যা দেখলে সব দেখা যায়, যা জানলে সব জানা যায় সেই জিনিষই তো পেয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁর আছে তাঁর আর কি চাই ?

মথুরবাবু হাজার টাকা দিয়ে শাল কিনে দিলেন ঠাকুরকে। সে শাল গায়ে জড়িয়ে দূর কোরে ফেলেদিলেন ঠাকুর।

মথুরবাবু তৃপ্ত হোয়েছেন—নিজেকে ভাগ্যবান মনে কোরছেন।

ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্র ধন্য হোল ঠাকুর রামকৃষ্ণর পরশ পেয়ে রাণী রাসমণির জীবনও অমরত্ব লাভ কোরল ঠাকুরের সান্নিধ্য পেয়ে।

স্নানযাত্রার দিন গোবিন্দজীর মূর্তি পড়ে গেল পূজারী ক্ষেত্রনাথের হাত থেকে। মূর্তির পা ভেঙে গেলো। রাণী রাসমণি মহাঅমংগলের আশংকায় চিন্তিতা হোয়ে পড়লেন। তাইতো মূর্তির যে খুঁত হোয়ে গেলো, পূজো হবে কি কোরে! তিনি বড় বড় পণ্ডিতদের মতামত জানতে পাঠালেন, সবাই বোললেন বিগ্রহ না পাল্টালে পূজো হবে না।

রাণী রাসমণি ভাবলেন তাইতো ঠাকুরের তো মতামত নেওয়া হোলনা। তিনি কি বলেন একবার শুনে দেখলে কেমন হয়।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বোললেন—হ্যাঁগা এ তোমাদের কেমন ব্যবস্থা, বলি আজ যদি মথুরবাবুর পাটা ভেঙে যেতো তাহালে কি পাটা সারানোর ব্যবস্থা না কোরে আর একটা জামাই আনতে! পা ভেঙেছে তো কি হোয়েছে। তা সারানো যায় কিনা দেখতে হবে তো। একটু থেমে বোললেন—তোমার গোবিন্দজীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও আমি তাঁর ভাঙা পা জুড়ে দেবো।

পরে ঠাকুর এমন সুন্দর কোরে গোবিন্দজীর পা জুড়ে দিয়েছিলেন যে তা আর বোঝাই যে গেল না ভাঙ্গা বোলে।

মথুরবাবু তীর্থে চলেছেন সংগে চলেছেন ঠাকুর। দেওঘরে এসে ঠাকুর নড়তে চান না। সেখানে লেগেছে দুর্ভিক্ষ।

ঠাকুর বোললেন দাওনা এদের খাবার আর জামাকাপড়। এদের এত কষ্ট আর আমি তীর্থে যাই কি কোরে।

মথুরবাবু কোলকাতা থেকে টাকা আনিয়ে খুব দান ধ্যান কোরলেন।

ঠাকুর মহাখুশী। মথুরবাবুও খুব ধন্য মনে কোরলেন নিজেকে ঠাকুর মথুরবাবুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে নৃত্য করেন—

পরমধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

ক্রমে রাণী রাসমণির দিন ফুরিয়ে আসে। জীবনের হিসেবে নিকেশ এবার বুঝি তিনি শেষ কোরে দিতে চান। তিনি কালীঘাটে যেতে চাইলেন। বোললেন—চলো মা আমাকে ডাকছেন। সেই জন্ম থেকে মা মা বোলে কাঁদছি। যতবারই কেঁদেছি ততবারই মা এক একটা খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, এবার মা আমার দিকে হাত বাড়িয়েছেন কোলে নেবার জন্য। আর কি আমি থাকতে পারি!

রাণীমা চোখ মেলে দেখলেন—এক অপূর্ব জ্যোতিঃতে যেন তাঁর চারপাশ ভরে গিয়েছে।

সেটা ১২৬৮ সালের ৯ই ফাল্গুন বুধবার। সারা দেশের রাণীমা রাসমণি সকলকে কাঁদিয়ে মহামায়ার কোলে আশ্রয় নিলেন।

নশ্বর দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হোল। যা রইল তা এক চিরস্মরণীয় চিরবরণীয় নাম—লোকমাতা রাণী রাসমণি।

মানুষ মরবেই—এ জগতে কেউই চিরদিন বেঁচে থাকতে আসেনি। মৃত্যুভয় আছে বোলেই আজ আমরা সাধন-ভজন করি। যে দিন মৃত্যুভয় থাকবে না সেদিন আমরা পাবো দেবতার নির্মল সান্নিধ্য। রাণী

রাসমণি জগতের বৃহৎ কল্যাণে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অমরত্ব লাভ কোরে মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

ভারতবর্ষ সাধনার দেশ। ঋষির দেশ, সাধকের পদস্পর্শে এদেশের গংগা যমুনা পূতপবিত্র। অভাবেরর ভিতরেও যে ভাব তা ভারতবর্ষের সনাতন জিনিষ। এই ভাব নিয়েই তো ভারতের সাধনা। সে ভাব প্রেমের, সে ভাব ভক্তির, সে ভাব মুক্তির। আজ ভারতবর্ষের মাটি অনুর্বর। জীবন-ধারনের জন্যও এ মাটিতে ভাল ফসল হয় না। মানুষের মনও অভাবে অনটনে পতিত জমির মত অনাবাদী হোয়ে পড়ে আছে, তাই এখন আর ভাবের ফসল ফলে না। তবুও চির আশাবাদী আমরা—দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়েই ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে একদিন! বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, মীরাবাঈ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাসমণির সাধনা ব্যর্থ হবে না কোনদিনই। কালের প্রয়োজনে যুগে যুগে আবির্ভূতা হবেন কত সাধক-সাধিকা যাঁদের স্পর্শে মুক্তি পাবে ভারতের নিগৃহিত, নিপীড়িত ঘুমন্ত জাতি।

'ও আমার সোনার বাঙ্গলা তোমায় ভালবাসি'

জনম তপস্বিনী—

গৌরী মা

"ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দ ময়ীরে জানে"

পাঁচ ছয় বছরের ফুটফুটে মেয়েটা কেঁদেই চলেছে। চোখের জলে পরনের জামা ভিজে যাচ্ছে। কেউ তাকে থামাতে পারছেনা চোখমুখ কাঁদতে কাঁদতে লাল হোয়ে গেলো। মেয়াটা হাঁপাচ্ছে তবুও তার কান্নার বিরাম নেই।

বাড়ীর লোক বিব্রত হোয়ে পড়ে। বিস্কুট দেয়, লজেন্স দেয়, মিষ্টি দেয়—তবুও মেয়ের কান্না থামে না। সব ফেলে দেয় ছুড়ে। আরও বেশা কাঁদতে থাকে।

কেউ বা বলে নিশ্চয়ই ওর পেট কামাড়াচ্ছে আর না হয় কানে পিঁপড়ে ঢুকেছে তা না হোলে মেয়ে অত কাঁদবে কেন। একটু তেল গরম কোরে নিয়ে এসো। ওর কানে দিলেই সব কান্না জল হোয়ে যাবে। একজন তাড়াতাড়ি তেল গরম কোরতে গেলো।

তখন সকাল বেলা। রোদ্দুরে ভরে গিয়েছে উঠান। গাছের ফুল গাছেই রয়ে গেছে এখনও পূজোর সাজিতে তোলা হয়নি। এমন সময় একজন ভিখারী গান গাইতে গাইতে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো।

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার আপন রে

মেয়েটার কান্না যেন একনিমিষেই থেমে গেলো। আর কান্না নেই।

গুটি গুটি পায় এগিয়ে এসে ভিখারীকে বোললে—কই গান করো! আবার গান সুরু হোল—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

মেয়েটা এবার হাততালি দিয়ে নাচতে থাকে। কোথায় গেলো কান্না আসল ওষুধ ওর কানে ঢালা হোয়ে গেছে।

যে নাম একবার কানে গেলে আর কোন ব্যথা থাকে না, আর কোন যন্ত্রণা থাকে না সেই নাম ওর কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে হৃদয়ে গিয়ে আসন পেতে বসেছে। সমস্ত ভব যন্ত্রণার ওষুধই তো কৃষ্ণ নাম। যত ভব ব্যধি তার একমাত্র আরোগ্য ঐ গৌরাঙ্গ নামে।

বাড়ীর লোক সব হতবাক হোয়ে যায়। ঐটুকু মেয়ে বাড়ীর সবাইকার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পাড়ার লোক ছুটে এসেছিল তার কান্না শুনে।

আর এখন মেয়ে যেন বরফ হোয়ে গেছে। এ মেয়ে যে কাঁদতে জানে তা আর এখন দেখলে বোঝা যায় না। কে একজন বোললে, এত কাঁদছিলি কেনরে—

মেয়েটি কাদার ঢেলা হাতে কোরে হাসতে হাসতে বোললে—আবার কাঁদবো, বেশ কোরব।

কাঁদবেই তো, কাঁদলে যদি ঠাকুর দেবতার কথা কানে আসে তাহলে ক্ষতি কি? মানুষ তো সংসার নিয়েই ব্যস্ত, কিসে সুখ হবে,, কিসে দুঃখ যাবে, কিসে ঘরে ধামাধামা টাকা পয়সা আসবে এই চিন্তাতেই তো সব বিভোর। সুখ দুঃখ যিনি দিলেন তাঁর খোঁজ কোরল কে? শুধু সংসারে সাজালো ছেলে মেয়ে সাজালো, ঘর সাজালো। শুধু আগাছা ভর্তি হোয়ে রইল মনের বনে, তা তো কেউ পরিষ্কার কোরল না।

ভারী আশ্চর্য লাগে মেয়েটিকে—কাদা ঘাটছে তো ঘাটছেই। একবার গোল কোরছে একবার হাতে ফেলে চাপড়াচ্ছে আবার

কখনও তন্ময় হোয়ে দেখছে। কি দেখে ও ঐ কাদার ভিতরে! কে জানে—

মা জিজ্ঞেস করেন—হ্যারে খাবিনে নাকি ঐ কাদা নিয়ে খেলবি! মেয়েটি আপন মনে জবাব দেয়—একটু দেরী আছে, এই দুটো বানালেই হোয়ে যায়।

চোখ! কিসের চোখরে—মেয়েটি তেমনি ভাবে আপন মনে বলে—কেন আমার ঠাকুর কি কানা হবে। চোখ দুটো বানিয়ে, ভোগ দিয়ে পেসাদ নিয়ে আসছি। আপন মনে মেয়েটি ঠাকুর বানায় আর বলে—সবাই ভাবে তোমার বুঝি চোখ নেই, যারা বলে তারাই কানা। এই তো হোয়ে গেলো, তোমরাও বুঝি ক্ষিধে পেয়ে গেছে, লক্ষীটি আর একটু কষ্ট করো।

একটা কচু পাতার ওপর কাদা দিয়ে ঠাকুর তৈরী হোল। ঘর থেকে দুখানা বাতাসা নিয়ে এলো মেয়েটা। সামনের গাছ থেকে ফুটো ফুল তুলে নিয়ে এলো। এইবার পূজা। মেয়েটির মাটির উপরই আসন কোরে বসে ঠাকুরের সামনে হাত জোড় কোরে বসে চোখ বুজে রয়েছে। মন্ত্র নেই, তন্ত্র নেই, আড়ম্বর নেই। অথচ পূজা! হ্যাঁ এই আসল পূজা—ভগবানকে ডাকতে আবার মন্ত্র তন্ত্র লাগে নাকি—অন্তরের ভক্তি আর শ্রদ্ধা এই তো পূজার উপকরণ—এই তো ফুল বিল্বপত্র, এই তো নৈবেদ্য। ভক্তি আর শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আর ভক্তি। এতেই তো ভগবানের পূজা। এতেই তো ভগবানের সেবা। সবাই খেলে দিন কাটায়। কত রকম খেলা, কত আনন্দ! মেয়েটি চুপ কোরে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কারও সংগে কোন কথা বলে না। চুপ কোরে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে একা একা।

কেউ যদি বলে—হ্যাঁরে যা খেলগে—মেয়েটি চট কোরে জবাব দেয়—ও খেলা আমার ভালো লাগে না।

কি খেলা তোর ভালো লাগে!

কেন ঠাকুর নিয়ে খেলা। ঠাকুরের ভোগ দেওয়া, প্রসাদ পাওয়া। ইস্ আমার বড় ঠাকুরওয়ালীরে—

মেয়েটি কোন কথা বলেনা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে! তার মন চলে যায় ঠাকুর ঘরে, যেখানে রাধাবিনোদ আছেন, যেখানে হোচ্ছে নিত্য ভোগারতি। কি সুন্দর লাগে দেখতে, ঠাকুর বসে আছেন সিংহাসনে, ফুলে ফলে হোচ্ছে তাঁর পূজা, ধূপদীপে হোচ্ছে তাঁর আরতি। পূজাতে প্রসাদ, তার চেয়ে মধুর আর কি আছে। তার মত আনন্দ আর কি আছে। সে আনন্দ কি সবাই পায়? সে আনন্দের সন্ধানই বা কজন জানে? সকাল থেকে সন্ধ্যা যাদের কাটে শুধু খেলা কোরে তাদের তো এ আনন্দের সংবাদ পাবার কথা নয়। সে আনন্দময়ীর সন্ধান যে করে সেই তো পায় সে আনন্দ।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দজয়ীরে জানে।

যে তাঁকে জানতে পারে, যে তাঁকে বুঝতে পারে তার মত আনন্দ আর কার। পরমানন্দময়ীর চরণ যে আশ্রয় কোরেছে তার মত সুখীই বা কে?

দিন যায়, মাস আসে, বছরও চলে যায়। মনের বনে কত ফুল ফোটে আবার ঝরে যায়। আগাছা জন্মে আবার তাও পরিষ্কার হোয়ে যায়। আবার ফুল ফোটে। মেয়েটাও বেশ বড় হয়, বছর নয় দশ হবে বোধ হয়। দিন দিন তার ভাব যেন জেগে ওঠে। লেখাপড়ায় কোন মন নেই, মন আছে শুধু দেবদেবতায়—বইয়ের যত অক্ষর সব যেন দেবতার চরণে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। বইয়ের পাতায় সে অক্ষর কই, বইয়ের পাতায় সে ভাব কই—সবই যখন ঐ চরণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তখন বই রেখে ঐখানেই শরণ নেওয়া ভালো। যত দিন যায় ততই মেয়েটির ভক্তি যেন ফুল হোয়ে ফোটে। শ্রদ্ধা যেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঘা মারে, অন্তরের প্রেম যেন হাতছানি দিয়ে হৃদয়ের আরও গভীরে নিয়ে যায়।

সে বুঝি শুনতে পায় অন্তরের ডাক—ওরে আয়, এই তো আমি তোর ভিতরেই আছি। ডুব সাঁতার দিয়ে চলে আয়।

দশ বছরের মেয়ে হোল এবার একটু সাজ-পোষাকের দরকার? বয়স বাড়েনা, সাজ বাড়ে। দেহের রূপ, মনের রূপ, যৌবনের রূপ। মানুষ সাজে, সাজাতে ভালবাসে। ভালো কাপড় পরে, গয়না দিয়ে দেহ সাজায়, মুখে রং লাগায়। এ সাজ কেন? এ সাজ কার জন্য? কে বুঝি অলক্ষ্যে বসে আছে এরূপ যৌবন ভোগ করার জন্য, কবে আসবে গো, তার জন্য আগে থেকেই চলে মানুষের এই প্রস্তুতি। এ সাজ তো নকল সাজ! এ সাজ তো যাত্রাদলের সাজ! এতো ভাড়া করা পোষাক। ভক্তির জরি দিয়ে যে শাড়ী তৈরী, শ্রদ্ধার কারুকার্য খচিত যে গয়না, প্রেমের রঙ দিয়ে যে হৃদয় রাঙে, সে সব তো কেউ পারে না! এতে কি প্রেমাস্পদকে পাওয়া যায় না। নিশ্চয় যায়।

এ প্রেমাস্পদ তো তোমার দেহের কাঙাল নয়, এ প্রেমাস্পদ তো তোমার আগাছা ভর্তি মনের দুয়ারে আঘাত কোরতে চায় না।

প্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান—যুগে যুগে তিনি তোমার কাছে প্রেমাকাংখী। কই তাঁকে একটু প্রেম দাও! তাঁকে দিলে তো হাজারগুণ সুদে আসলে পাবে।

মেয়েটির এসব ভাল লাগে না মা দুগাছা সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছেন। কানে দুল। রঙীন ছাপা শাড়ী। মেয়েটা দেখে কত বাড়ীর মেয়ে বৌকে গা ভর্তি গয়না পরতে। ভালো ভালো চোখ ঝলশানো শাড়ী পরতে। মেয়েটা ভাবে এতে কি আছে। এই ভেবে একদিন হাতের দুগাছা বালা আর কানের দুল দুটো খুলে মুখে দিয়ে চিবাতে লাগলো। এ কি, এর তো কোন স্বাদ নেই! না মিষ্টি, না টক, তবে এ পরে কি হবে! যার কোন স্বাদ নেই তার কোন প্রয়োজনই নেই! সে টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে।

মাছ মাংস তার আবার এক পরম শত্রু। দুনিয়ার কত ভাল

জিনিষ আছে। ভাত, ডাল, তরকারী, ঘি, মিষ্টি, দুধ। তা রেখে মানুষ জ্যান্ত মাছগুলো খায়। পাঁঠা গুলো কেটে তার মাংস খায়। একটু দয়ামায়া যদি থাকে—খাবে না সে কিছুতেই ঐ সব ছাই ভস্ম! না খেয়েও থাকতে সে রাজী আছে তবুও সে ঐসব খাবে না!

কেউ কেউ রেগে বলে—কোথাকার একটা বিধবা এসেছে এই বাড়ীতে কত কালকার বিধবা তা কে জানে।

মেয়েটি হাসে মহানন্দে—হ্যাঁ আমি তাই গো! আর কোন কথা সে বলে না! ধীরে ধীরে চলে যায় সেখান থেকে।

দক্ষিণেশ্বরের কাছে নিমতার ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে মেয়েটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না।

কে একজন বোললে—কাকে খুঁজছো গো!

—কোথায় এক কলাবাগানে ঠাকুরমশাই থাকেন তাঁকেই তো আমি খুঁজছি!

জবাব এলো—ওরে বাবা তোমার তো সাহস কম না! সে সাধুর জটা দেখলেই তো ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। তাঁর চোখের দিকে চাইলেই তো বুকে কাঁপ লাগে: না বাপু তুমি যেও না!

বলোনা কোথায় তিনি থাকেন!

ঐ যে ক্ষেতের শেষে বাগান তারই ওপাশে—

মেয়েটা সন্ধান পেয়ে ছুটতে থাকে। কিছুক্ষণ ছোটার পর পেয়ে যায় সাধুর আস্তানা। গিয়ে সোজা একেবারে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে।

ঠাকুর মশাই বোলে ওঠেন—তুই আসবি আমি জানতাম, যার কৃষ্ণে মতি আছে সে কি না এসে পারে।

মেয়েটি ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হোচ্ছে কি এক অমূল্য জিনিষের সে যেন সন্ধান পেয়েছে।

ঠকুর মশাই বোললেন—কাল তোকে দীক্ষা দেবো।

এদিকে বাড়ীর লোক খুঁজে হায়রান। সন্ধান পেয়ে পরদিন এসে হাজির হয় ঐ কলাবাগানে ঠাকুর মশাইয়ের কাছে।

ঠাকুর মশাই বলেন—ওকে তোমরা কেউ কিছু বোলনা। ও যে সে মেয়ে নয়।

এই মেয়েটির নাম মৃড়ানী।

ইনি ১২৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনিই পরবর্তিকালে জগতপূজ্য গৌরীমাতা নামে পরিচিতা হন।

মৃড়ানীর পিতা পার্বতীচরণ মায়ের নাম গিরিবালা দেবী। পার্বতীচরণ থাকতেন শিবপুরে আর চাকরী কোরতেন এক সওদাগরী অফিসে। তিনি অতি স্বজ্জন ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। দেব দেবতার প্রতি তাঁর অশেষ ভক্তি ছিল। স্ত্রীর গিরিবালা দেবীও একজন ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। দরিদ্রের ব্যথা তিনি নিজের ব্যথা বোলেই মনে কোরতেন, কারো অভাব অনটন হোলে তাঁর প্রাণ এত কেঁদে উঠতো যে তিনি ঘরে যা থাকতো তাই দিয়ে দিতেন। বাংলাভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা কোরেছেন—কবিতার রচনা শৈলী যে কোন খ্যাতিমান কবির মতই মনে হয়। তাঁর অধিকাংশ কবিতা শ্যামাসংগীত বিষয়ক। এসব দেখে মনে হয় তিনি একজন পরম কালীভক্ত ছিলেন।

আমার দেহযন্ত্রে যন্ত্রী হোয়ে ওরে প্রাণ
অবিশ্রাম করো কালীর গুণ গান।
বাজিয়ে দেহ-সেতারা। কর গান বলে তারা
ভাব সদা ভব দারা। যদি ভবে চাহ ত্রাণ
আনন্দের মালঞ্চে চল যাই মলিনা হয়ে
লহরে নিবৃত্তি সাজে করেতে করিয়ে।

গিরিবালা দেবী তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে সাধনা কোরে গেছেন। তিনি স্বর্গ চান না। কোন মুক্তি চান না। কঠোর বৈরাগ্য তাও তাঁর কাম্য নয়! তিনি চান ভক্তি আর প্রেম।

তোর মুক্তি চাই না মুক্তকেশী, ভক্তি অভিলাষী দাসী।
বিপদে সম্পদে পদে মন যেন রয় দিবানিশি।
কি হবে মা স্বর্গে গিয়ে, কি দুঃখ নরকে রয়ে।
তোমাকে রাখি হৃদয়ে সদা মা আনন্দে ভাসি।

জগৎ জননী মহামায়ার কৃপা যার ওপর সবসময় বর্ষণ হোচ্ছে তাঁর পক্ষে এ রচনা লেখা সম্ভব।

মৃড়ানীর বাল্যকাল থেকেই পালাই পালাই ভাব। এই আছেন, এই নেই। কোথায় যান কি করেন তা কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। কোথায় কি তীর্থস্থান আছে সেখানে কি ঠাকুর আছে তা জানবার জন্য তিনি উপবাস কোরেও দিনের পর দিন কাটাতে পারেন। হিমালয়ের গল্প শুনতে শুনতে তাঁর মন যেন পাখা মেলে উড়ে যেতো হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়। গিরিশিখরে! সেখানে যেতে গেলে যে কি নিদারুণ কষ্ট। হিমালয়ের রূপ যে কি ভয়াবহ তা শুনে তিনি শিউরে উঠতেন। কঠিন কঠোর ঐ তুষার মৌলী হিমালয়ের যে আরও একটা রূপ আছে সে কথা ভাবতে ভাবতে তিনি এমন হোয়ে উঠতেন যেন এখুনি ছুটে চলে যাবেন। সে রূপ শাশ্বত সুন্দর রূপ। ঐ হিমালয়ের ওপরেই তো দেবাদিদেব মহাদেব থাকেন গিরিকন্যা উমাকে নিয়ে। দেবতারা যেখানে থাকেন সে যায়গা না জানি আরও কি সুন্দর। মনে মনে এমনি ধারা ভাবের জাল বুনতেন আর মাঝে মাঝে চোখের কোণে অশ্রু জমে উঠতো। যে ভাবে হোক তাঁকে যেতে হবে ঐ দুর্গম গিরিরাজ্যে। দেখে আসতে হবে সেখানে কেমন কোরে ঘর বেঁধেছেন দেবতারা।

গিরিবালার মাঝে মাঝে মৃড়ানীর জন্য চিন্তা হোত। সংসারে থেকেও যে সংসারের নয়—জলে নামে কিন্তু গায়ে জল লাগে না। এ কেমন ধারা মেয়ে। এর কি কোন শখ আহ্লাদ নেই। এ কি ঘর সংসার কোরবে না। মেয়ে হোয়ে যে জন্মেছে তাকে ঘর সংসার কোরতে হবে। মা হোতে হবে। সংসারের বোঝা নিতে হবে। কখনও কাঁদতে হবে, কখনও হাসতে হবে। কিন্তু এর তো সবই উল্টো। কোন বাঁধনই যেন এর সয়না।

গিরিবালা একদিন চণ্ডীচরণ কে ডাকিয়ে নিয়ে এসে বোললেন

—বাপু তুমি তো খুব ভাল জ্যোতিষী জানো, দেখেতো মেয়েটার হাতটা ভাগ্যে কি আছে।

মৃড়ানীর হাতটা বেশ ভাল ভাবে দেখে চণ্ডীচরণ বোললে—এ মেয়ে সন্ন্যাসিনী হবে! মৃড়ানী মনে মনে হাসে।

মায়ের প্রাণ গিরিবালার, তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

কুঁড়ি দেখেই বোঝা যায় কোনটা ফুল হোয়ে ফুটবে আর কোনটা আদৌ ফুটবেনা। মৃড়ানীর বাল্যকাল দেখেই বোঝা যায় যে এ মেয়ে কি রকম হবে। শিশুকাল থেকেই মৃড়ানীর চরিত্র এমনি ভাবে গড়ে ওঠে যে, যত বড় হতে থাকে ততই ধর্মভাবে প্রবল ভাবেই দেখা যায়।

বাবা নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ। মাতা মা মহামায়ার উপাসিকা। কন্যার চরিত্র ভিন্নমুখী হবে কি করে।

মৃড়ানীর পূজার্চনা। ভগবতভক্তি দেখলে মনে হয় গত জন্মের বাকী কাজ সে এই জন্মে শেষ কোরতেই এসেছে। গত জনমে যে প্রারব্ধ কাজ শেষ কোরতে পারেনি। তাকে তো আবার জন্ম নিতে হবে! তাই বুঝি আবার জন্ম নিয়েছে। ওকে কি ঘরে বাঁধা যায়। ও যে বনের পাখী। খাঁচার ভিতর ওর তো ভাল লাগবে না।

বনের পাখী বনেই উড়ে যাবে—বাল্যকালের ঐ উড়ু উড়ু ভাব বনে উড়ে যাওয়ারই পূর্বাভাষ। চণ্ডীচরণের কাছে গৌরাঙ্গদেবের সব কাহিনীই শোনা হোয়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে হোলে তার চোখ ছাপিয়ে জল আছে। সেও বিষ্ণুপ্রিয়ার মত ঐভাবে ভগবানের সেবা কোরতে চায়। বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে তাঁর মাঝে। তাই সে মাঝে মাঝে কলাবাগানে ঠাকুর মশায়ের কাছে ছুটে যায়। পথের শেষ কোথায়? তাকে খুঁজতে হবে জানতে হবে! কোন পথে গেলে তার আরাধ্য দেবতাকে পাওয়া যাবে—সে পথের সন্ধান তো দেবেন ঐ কলাবাগানের

ঠাকুরমশাই। উনি তো পথের ঠিকানা দেবার জন্যই ওখানে বসেছেন। মৃড়ানী তাই বার বার যায় সেখানে।

কাদা দিয়ে শুধু ঠাকুর গড়ে সে। কখনও কালী। কখনও কৃষ্ণ। কখনও শিব। এই সব তার নিত্য খেলা, নিত্য লীলা। কাদার ঠাকুরই তো পূজা নেন! এ পূজা ব্যর্থ নয়। এমনি করে খেলতে খেলতেই তো আসল ঠাকুরকে পাওয়া যাবে।

গিরিবালা মাঝে মাঝে বলেন—ঠাকুর নিয়ে ছেলে খেলা করা পাপ। ওসব তুই বাদ দে. মন দিয়ে লেখাপড়া কর।

খেলতে খেলতেই তো আসল মিলতে পারে মা! মৃড়ানী আর কোন কথা বলে না। শুধু মনে মনে ভাবে—এমন কোন মন্ত্র যদি তার জানা থাকতো যে কাদার ঠাকুরও কথা বোলবে তাহালে সে সবাইকে দেখিয়ে দিত। মানুষের এত অবিশ্বাস!

এ অবিশ্বাসের জগদ্দল পাথর দুহাত দিয়ে ঠেলে না ফেললে তাঁর কাছে পৌঁছান যাবে না।

বিশ্বাস কোরতে হবে ভক্তধ্রুবর মতো প্রহ্লাদের মতো। ঈশ্বর যে সর্বভূতে বিরাজমান।

খেলতে খেলতেই তিনি একদিন ঘরের ভিতর একটা পাথর কুড়িয়ে পেলেন। পাথরটি দেখতে ঠিক নারায়ণ শিলার মতই। তিনি বুকের ভিতর সেই পাথর চেপে ধরলেন। কি এক অজানা আনন্দে তাঁর সমস্ত দেহমন উদভাসিত হোয়ে উঠলো। এত আনন্দ কেন হোল? কে এলো বুকের ভিতর! যিনি সকল জ্বালার উপসম করেন তিনি বুঝি এলেন।

—হ্যাগা আমার ঠাকুরকে দেখেছো! পেয়ে থাকতো দিয়ে দাও। কে একজন এসে বোললে মৃড়ানীকে—

মৃড়ানী বুকের ভিতর থেকে বের কোরে দিল নারায়ণ শিলা। মনের ভিতর যেন একটা হাহাকার পড়ে গেলো। পরক্ষণেই মৃড়ানী শান্ত হোল! ভাবলো! ঐ ঠাকুর কেন থাকবে আমার

কাছে। এমন কি সুকৃতি তাঁর আছে যে ঠাকুর তার কাছে থাকবেন।

ঠাকুর নিজে না ধরা দিলে কি কেউ ধরতে পারে, না বাঁধতে পারে। যিনি ঐ ঠাকুরের অধিকারী তিনি মৃড়ানীকে বোললেন—এ ঠাকুর এমন জাগ্রত যে যার কাছে থাকবে তার গায়ে কাঁটার আচড় লাগবে না। এ ঠাকুর আমার এমনই যে হাত ধরে তোমায় নিয়ে যাবে ইষ্টসন্ধানে। পরে মৃড়ানীর দিকে চেয়ে তিনি বোললেন—আমার ঠাকুর তোমার ভক্তি দেখে ভারী সন্তুষ্ট হোয়েছেন। তোমার সাথে ঘর কোরবার ইচ্ছে হোয়েছে তাই তোমার বুকের ভিতর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বড় ভক্তিমতী তুমি। আশ্চর্য তোমার ভগবদ ভক্তি! এ ঠাকুর এখন থেকে তোমার। তুমি এঁকে নিয়ে ঘর করো। ঠাকুরেরও তাই ইচ্ছে।

মৃড়ানী হাত পেতে ঠাকুরকে গ্রহণ কোরে একেবারে বুকে চেপে ধরলেন।

এই নারায়ণ শিলা হোল মৃড়ানীর দামোদর। মৃড়ানীর সাধন পথে এই দামোদরই হোলেন পথ প্রদর্শক। সংসার যাঁকে চায় না, সংসার তাঁকে বাঁধতে পারবে না। সংসারের বাঁধন যিনি ছিন্ন কোরবার জন্যই দুনিয়ায় এসেছেন, তাঁকে সংসারের বেড়াজালে বাঁধবার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।

বিয়ে দিলেই বুঝি সব কিছুর সমাধান হয়। সংসারের সবাই ভাবলে মৃড়ানীর বয়স বাড়ছে। দেহের ও মনের সংযোগ হোলেই ও সব ভুলে যাবে।

সকলে মিলে উঠে পড়ে লেগে গেলো পাত্র ঠিক কোরতে। পাত্র পক্ষের লোক ওকে দেখতে আসে। কিন্তু মৃড়ানী কোথায়? তিনি তখন ঠাকুর ঘরে দরজা দিয়ে দামোদরে সামনে বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন।

পাত্র পক্ষ নানারকম মন্তব্য কোরে চলে যায়। কেউ বলে—

মেয়ের মাথার ঠিক নেই! কেউ বা বলে—এ মেয়ে ঘরে আনলে আর সংসার থাকবেনা। সবাই নানান মন্তব্য কোরে যায়।

মৃড়ানী খুব খুশী। তিনি বাড়ীর লোককে বলেন—তোমরা মিছে হায়রান হোচ্ছ কেন, আর যারা আসছেন তাদের কাছেই বা অপ্রিয় হোচ্ছ কেন! একটু থেমে পরে বলেন—এমন বর তোমরা আমকে এনে দিতে পারো যে অমর—খোঁজ কোরে যদি আনতে পারো তাহলে তার গলায় আমি মালা দেবো।

গিরিবালা চিন্তিত হোয়ে পড়েন। মেয়ের বয়স বাড়ছে অথচ পাত্রস্থ কোরতে না পারলে লোকে নিন্দে কোরবে। মান সম্মান সব ধূলোতে মিশে যাবে। মেয়ে ছেলে হোয়ে যখন জন্মেছে তখন তো তাঁকে ঘর সংসার কোরতে হবে। লোকাচার, দেশাচার, পারিবারিক সম্মান, বংশ মর্যাদা সবই কি এবার ভূমিস্মাৎ হোয়ে যাবে। গিরিবালার চণ্ডীচরণের কথা মনে পড়ে। সে হাত দেখে বোলেছে—এ মেয়ে যোগিনী হবে।

মৃড়ানী তাঁর সিদ্ধান্তে অচল।

গিরিবালা বলেন—মা আমার বড় সাধ তুই ঘর সংসার কর।

এই কথা শুনে মৃড়ানীর চোখ দুটো জলে ভরে আসে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে বলেন—মা আমার তো বিয়ে হোয়ে গেছে। আমার স্বামী তো ঐ মন্দিরের সিংহাসনে বসে আছেন। মন্দিরের দেবতা ঐ দামোদরই আমার স্বামী। উনি ছাড়া আমার যোগ্য স্বামী তো আর পেলাম না মা! দয়া কোরে আমায় চরণে আশ্রয় দিয়েছেন।

এ জীবন তাহলে এই ভাবেই কাটাবি!

কেন মা! আমি তো বেশ ভালই আছি—পরমানন্দে স্বামী সেবা কোরছি আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে!

তোর যা ভালো মনে হয় তাই কর—আমারই পোড়াকপাল নইলে তুই এমন হবি কেন—সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার কোরবি, দুচোখ ভরে আমি দেখবো এইতো আমার সুখ!

কেন তুমি এরকম কোরছ মা! স্বয়ং জগৎপতি তোমার জামাই, আর কি তোমার চাই। আমার স্বামীই তো জগতের স্বামী।

মৃড়ানীর বাবা মেয়ের ব্যবহারে সন্তুষ্ট নন, আত্মীয় স্বজনরাও মনে মনে মৃড়ানীর এসব ভণ্ডামী বরদাস্ত কোরতে পারছেন না। তাঁরা ঠিক কোরলেন মেয়ের বিয়ে জোর কোরেই দেবেন।

মেয়েরা অনেকেই বিয়ের আগে ওরকম কোরে থাকে তারপর বিয়ে হোয়ে গেলে সব ঠিক হোয়ে যায়। স্বামীর মুখ একবার দেখলে সব মেয়ের মনই অন্যরকম হোয়ে যায়। জোর কোরেই বিয়ে দেওয়া হবে মৃড়ানীর। আত্মসম্মান মান মর্যাদা বাঁচাতে গেলে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

তেরো বছরের মেয়ে মৃড়ানী বুঝতে পারছেন যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব কাজ হোচ্ছে। কি আর করেন যিনি রক্ষা কর্তা তাঁরই চরণে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। চোখের জলে নিবেদন কোরলেন মনের ব্যথা। হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ঢেলে দিলেন তাঁর রাঙা চরণে। জানালেন—তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে রক্ষা করো। আমাকে দ্বিচারিণী যেন হোতে না হয়। প্রভু তুমি থাকতে আমি কি নিগৃহীতা হবো! আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো নইলে আমার মরা মুখই তোমাকে দেখতে হবে প্রভু!

এদিকে বিয়ের সব যোগাড় হোয়ে গেছে। এমন কি দুচার জন লোকজনও নিমন্ত্রণ হোয়ে গেছে। বিয়ের জিনিষপত্র সব এনে একটা ঘরে জমা কোরে রাখা হোচ্ছে।

মৃড়ানী সব দেখছেন—তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরে ঢুকে দামোদরকে সিংহাসনের ওপর থেকে এনে নিজের বুকের ভিতর রেখে বিয়ের জিনিষপত্র যেখানে ছিল সেই ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে দিল। সমবয়সীরা কেউ তাঁকে ডাকতে গেলে তাদের ওপর বিরক্ত হোয়ে উঠেন। কেউ তাঁকে বশে আনতে পারছে না।

শাঁখ বেজে উঠলো। মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়। বিয়ে বাড়ীর ব্যস্ততা

সবই দেখা যাচ্ছে। শুধু যাঁর বিয়ে তাঁরই সাড়া নেই! লগ্ন এগিয়ে আসে। মেয়ে সাজাবে কখন—পাত্র পক্ষর ভিতর চঞ্চলতা দেখা দেয়। এবার ছেলে নিয়ে যেতে হবে।

পার্বতীচরণ এসে কাকুতি মিনতি করেন—ছি! মা বেরিয়ে আয়। লোকে আমাকে নিন্দে কোরবে।

ফিরে যেতে বলো ওদের বাবা! মানুষের সাথে আমার বিয়ে হবে না। আমি তো বিবাহিতা। মৃড়ানী সাপের মত গজরাতে থাকেন—পার্বতীচরণ যতই অনুরোধ করেন ততই মৃড়ানীর রাগও বেড়ে যায়।

এবার তিনি অন্য পথ ধরলেন—ঘরের ভিতর যা ছিল সব একধার থেকে ভাঙতে সুরু করেন। দইয়ের ভাঁড় সজোরে আছাড় মেরে ফেলে দেয়। খাবারগুলো ছুড়ে ছুড়ে মারতে থাকে বাইরে জানালার ভিতর দিয়ে।

পার্বতীচরণ চিন্তিত হোয়ে গিরিবালাকে বোললেন—তুমি একবার দেখো!

তোমরা পারলে না আর আমি পারবো!

মানসম্ভ্রম যে গেলো!

সবই অদৃষ্ট!

তাই বোলে মেয়ের জিদই বজায় থাকবে।

মনে হয় তাই থাকবে—আমি ও মেয়ের আশা ত্যাগ কোরেছি।

পার্বতীচরণ রাগে কাঁপতে থাকলেন।

গিরিবালা ভাবছেন অন্যকথা।

জোর কোরে এ কাজ কোরতে গেলে মেয়ে যদি আত্মহত্যা করে! নাই বা হোল বিয়ে—তবুও তো সে চোখের সামনে থাকবে। মা বোলে তো ডাকবে। মায়ের প্রাণ এমনি ধারাই হয়।

গিরিবালা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান মৃড়ানীর দিকে—এদিকে প্রথম লগ্ন উতরে গেলো। পরের লগ্নে শুভকাজ শেষ কোরতেই হবে।

পার্বতীচরণ বরপক্ষকে নানানভাবে বোঝান।

গিরিবালা মৃড়ানীকে বলেন—তোর দামোদরকেই যদি স্বামীত্বে বরণ কোরে থাকিস আমি তাতে বাধা দেবোনা—আমি তোকে তাঁর হাতেই সমর্পণ কোরলাম। ঈশ্বর সেবাই যদি তোর জীবনের লক্ষ্য হয় আমি তাতেই সুখী—গিরিবালার চোখ ফেটে জল আসে।

জানালার ওপাশে মৃড়ানী কাঁদছে।

গিরিবালা বোললেন—তুই বেরিয়ে এসে পেছন দোর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে চণ্ডীচরণের বাড়ী গিয়ে আজ রাতটা লুকিয়ে থাক—তা না হোলে তোকে আজ ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। জোর কোরেই তোর বিয়ে দিবে।

মৃড়ানী চুপি চুপি বেরিয়ে এসে পেছনের দোর দিয়ে সেই রাতে একাকী চলে গেলেন। দামোদর যাঁর বুকে আছে তাঁর আবার কিসের ভয়। একবার তাঁর ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে তাঁকে স্পর্শ করে কে?

ঈশ্বরে যে একবার আত্মসমর্পণ কোরে বসে আছে সে মুক্তি পাবেই। মৃড়ানী আজ মুক্ত। যে বাঁধা পড়েছে পরম আশ্রয়ে তাকে নতুন কোরে বাঁধে এমন শক্তি কার আছে। মৃড়ানীর এখন পথ খোলা। সামনে তাঁর দিগন্ত বিস্তৃত পথ। এই পথ ধরেই তিনি চলে যাবেন যতদূর চোখ যায়। মনে মনে ঠিক কোরলেন তিনি আর বাড়ী ফিরবেন না। তিনি হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় পর্বত পার হোয়ে চলে যাবেন হিমালয়ে। দেবদেবতার লীলাভূমি এই হিমালয়। ভারতবর্ষের বড় বড় সাধক মহাপুরুষ এই হিমালয়ে বসেই সাধনা কোরেছেন, সিদ্ধিলাভ কোরেছেন। তাঁকেও যেতে হবে সেই হিমালয়ে। সংসারই যখন ত্যাগ কোরলেন তিনি তখন যত ঝড়ঝঞ্ঝা বাধাবিঘ্ন আসে আসুক তবুও ঈশ্বর দর্শন তাঁকে কোরতেই হবে।

কিন্তু মৃড়ানী সবার চোখকে ফাঁকী দিয়ে পালাতে পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন—তাঁকে আবার ফিরে আসতে হোল।

বাড়ী আসার পর তাঁর অবস্থা যেন আরও শোচনীয় হোয়ে উঠলো। নানান লোকের নানান কথায় তাঁর কান ঝালাপালা হোয়ে গেলো।

কেউ বোললে—মেয়ের চিকিৎসা করানো দরকার। মারাত্মক কোন ব্যাধি হোয়েছে। কেউ বোললে—গলায় ঠাকুর ঝুলিয়ে উনি দেবতা হোয়েছেন। ভেবেছেন ঐ সব ভড়ং দেখে সবাই ওকে পূজো কোরবে। আবার কেউ বা বোললে—এটুকু বয়সে ঐরকম দেবদ্বিজে ভক্তি ছলাকলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়ের ভিতরে কিছু গোলমাল ঢুকেছে।

মৃড়ানী নীরবে তাঁর দামোদরের কাছেই দুঃখ জানান। তার ব্যথা অনুভব কোরবার ঐ একটি মাত্র লোকই আছে, তাই চোখের জলেই অন্তরের বেদনা নিবেদন করেন।

গিরিবালা আর কোন কথা বলেন না—যা বলার তিনি বোলেই দিয়েছেন। এরপর একদিন আবার তিনি সবার অজ্ঞাতে ঘর ছেড়ে পথ ধরলেন। ঘর যেন তাঁর কাছে কারাগার। এখানে যেন তাঁর দম বন্ধ হোয়ে আসে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে সব সময় হাত ছানি দিয়ে ডাকে।

এবার মৃড়ানীকে ঘরের ভিতর আটকে রাখা হোল। সবাই তাঁকে নজরে নজরে রাখলেন।

পার্বতীচরণ মহাচিন্তায় পড়লেন। বয়স্থা মেয়ে, বিয়ে হোল না। নানান লোকের নানান কথা কানে আসে।

গিরিবালা বলেন—বনের পাখীকে খাঁচায় পুরলে তার কি থাকতে ভালো লাগে!

পার্বতীচরণ বিরক্ত হোয়ে বলেন—এই বয়সের মেয়েকে কি বোলতে চাও তার ইচ্ছেমত কাজ কোরতে উৎসাহ দেবো! একটু থেমে বলেন —বেশ তো। তোর যদি সাধন ভজনে মন হোয়েই থাকে তাহলে ঘরে বসেই তা করুক। কত সাধু মহাজন তো ঘরে বসেই সাধন

ভজন কোরেছেন। ঈশ্বর দর্শনও কারও কারও হোয়েছে তাও তো জানা যায়। তবে তোমার মেয়ে তা পারবে না কেন?

গিরিবালা কোন জবাব দেন না!

মৃড়ানীর মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় সেই কলাবাগানে ঠাকুর মশাইয়ের কথা। এসময় যদি তাঁর কাছে একবার যেতে পারতেন তাহলে অনেকটা শান্তি পেতেন।

কিন্তু কি কোরে তিনি যাবেন? তাঁকে যে এরা সবাই আটকে রেখেছে!

সিদ্ধপুরুষ ভগবান দাস বাবাজীর নাম তখন দেশবিশ্রুত। তাঁর সাধনার কথা তখন মানুষের মুখে মুখে।

মৃড়ানীর বড় ভাই অবিনাশ চন্দ্র মৃড়ানীকে নিয়ে কালনায় এলেন।

বাবাজী মৃড়ানীর সব কথা শুনে হাসতে লাগলেন আর বার বার তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বোললেন—বাবা এ মেয়ে তো অন্য সব মেয়ের মত শুধু নিজের ঘর বাঁধতে আসেনি এ এসেছে ঘর বেঁধে ঘরহারাদের আশ্রয় দিতে। তোমাদের বহুভাগ্য গুণে তোমাদের সংসারে ওকে পেয়েছো। পূর্বজন্মের সুকৃতি ছাড়া এ রকম হয় না।

মৃড়ানীর বক্ষে দামোদর বুঝি হাসছেন। যেন বোলছেন—এই তো পেয়েছিস তোর আকাংক্ষিত বস্তু। তোর কাছে তো আমি অনেকদিন থেকেই বাঁধা আছি!

মৃড়ানী বাবাজীর পদধূলি নিতেই তিনি বোললেন—পথ তো পেয়ে গেছিস মা। এবার হাঁটা সুরু কর, ঠিক পৌঁছে যাবে ইষ্টদেবের চরণে।

মৃড়ানী গেলেন নবদ্বীপে। শ্রীচৈতন্য মূর্তি দেখে তার মন বড় অস্থির হোয়ে গেলো।এখানে চৈতন্যদাস বাবাজীর সাথে তাঁর দেখা হোল।

তিনি আশীর্বাদ কোরলেন—তুমি তো আগের জনমেই অনেক

পথ এগিয়ে গিয়েছিলে। বাকী পথটুকু পার হবার জন্যই তোমায় আবার আসতে হোয়েছে। এমন গৌরভক্ত তুমি! তোমার তো গৌরকৃপা লাভ কোরতে বেশী দেরী হবে না। যিনি তোমার দামোদর তিনিই গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। শুধু সাধনা করো।

মৃড়ানী ফিরে এলেন বাড়ীতে। কিছুই তাঁর ভালো লাগে না। সংসার দেখতে দেখতে তাঁর মন বড়ই উচাটন হোয়ে যায়। শুধু দিনরাত খাওয়া-পরার কথা। বিষয়-আশয়ের কথা। অর্থ ঐশ্বর্যের কথা। এছাড়া আর যেন কোন কথা নেই। এসব ছাড়া এ দুনিয়ায় কি আর কিছু ভাববার নেই। শুধু খেয়ে পরেই জীবন শেষ হোয়ে যাবে! এর নামই বুঝি মনুষ্য জনম। এই জনম লাভ কোরবার জন্যই বুঝি মানুষ চুরাশি কোটি যোনী ভ্রমণ কোরে এসেছে।

ধিক্ এই মানুষকে! এ মানুষের প্রতিবেশী তিনি হোতে চান না। হাজার ফোঁটা চোখের জল এরা অনিত্য বস্তুর জন্য ফেলবে তবুও এক ফোঁটা চোখের জল এরা ভগবানের জন্য ফেলতে পারে না। তাইতো এদের এত শোক। এত ভোগ। এত রোগ। এত জ্বালা। এত যন্ত্রণা।

মন্দিরের ভিতর দামোদরকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনমনে তার সাথে কথা বলেন মৃড়ানী—কই তুমি তো আমার সাথে কথা বলো না! তোমার বাঁশীর সুরও তো আমি শুনতে পাইনা! আমাকে কি তুমি কৃপা কোরবে না?

তাঁর এই এক চিন্তাই ধ্যান জ্ঞান হোল। কিভাবে তিনি দামোদরের দর্শন পাবেন। কিভাবে তাঁর কৃপালাভ করে তিনি কৃতার্থ হবেন।

সব কিছু ত্যাগ কোরেই তো তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি তো সব কিছুই ত্যাগ কোরেছেন তবে তিনি কেন তাঁর দর্শন পাবেন না! চোখের জলেই তিনি দামোদরকে জানান তাঁর মনের ব্যথা!

আঠারো বছর বয়সে গিরিবালা কন্যাকে নিয়ে গংগাসাগর যাত্রা কোরলেন। তারপর সেখান থেকে কাশী মথুরা বৃন্দাবন যাবেন। মৃড়ানী যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

গংগাসাগর গিয়ে মৃড়ানী খুবই খুশী হোলেন।

গিরিবালা ভাবলেন মেয়ের মনের বোধ হয় পরিবর্তন আসছে!

সাগরসংগমে মৃড়ানী ভক্তিভরে স্নান কোরলেন। দামোদরকেও স্নান করালেন। বোললেন মনে মনে—এবার তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

মৃড়ানী একদিন দামোদরকে বুকে কোরে গংগাসাগর থেকে অজানা পথে পাড়ি জমালেন। কি অপূর্ব অনুভূতি! কি অফুরন্ত আনন্দ—এখানে সংসার নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। কোন বন্ধন নেই। শুধু পথ, যে পথ অসীমের, সে পথ অনন্তের। গিরিবালার ক্রন্দন, আত্মীয়-স্বজনের হাহাকার সব কিছু ভুলে গেলেন তিনি, পথ চলার আনন্দে তিনি বিভোর। তিনি চলেছেন হরিদ্বারের পথে........

সংগে আছেন কতকগুলি সাধু। তিনি এই যোগাযোগকে দামোদরের কৃপা বোলেই মনে কোরলেন। তিনি পথ চলেন আর মনে মনে শুধু একটা অজানা আশংকা! ঐ বুঝি ধরা পড়ে যান, ঐ বুঝি কেউ তাঁকে দেখে ফেলে, তিনি বেশ পরিবর্তন কোরে পশ্চিমদেশীয় ধরনে জামাকাপড় পড়লেন।

মনের আনন্দে তাঁর সব কিছু বুঝি বিস্মরণ হোয়ে যায়! কতদিন ধরে তিনি যেন এই দিনটি প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। তিনি বারবার দামোদরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। হিমালয়ের পাথর ঢালা পথে চলতে তাঁর কষ্টই হয় কিন্তু এ কষ্টকে তিনি আনন্দের সংগেই গ্রহণ করেন।

গিরিকন্যা গৌরী এই হিমালয়ে বসেই তপস্যা কোরে মহাদেবকে পেয়েছিলেন। কত সাধকের সাধনক্ষেত্র, দেবদেবতার লীলাক্ষেত্র এই হিমালয়। এখানকার গাছপালা বৃক্ষলতা পাহাড়-পর্বত সবাই যেন তপস্যায়রত।

এখানকার সাধনা বুঝি কারও ব্যর্থ হয়নি—তাই কালে কালে যুগে যুগে ভারতবর্ষের যত সাধক সবাই এসে এই দেবাত্মা গিরিরাজের কোলে আসন পেতেছিলেন সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য।

সেকালে হিমালয় কন্যা গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হোয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন আর একালের এক গৌরীও আজ তপস্যা কোরতে এসেছেন হিমালয়ে।

তপস্যা শেষে কি পাবেন তা তিনিই জানেন। মৃড়ানীকে সব সাধুরা গৌরীমা বোলে ডাকা স্বরু কোরলেন, কারণ মৃড়ানী গিরিকন্যা গৌরীর মত সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন। মৃড়ানী এবার হারিয়ে যান এই হিমালয়ের পাতা ঝরা বনে।

গৌরীমা চলেছেন হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ, সেখান থেকে কেদারনাথ, বদরীনাথ, তারপর জ্বালামুখী। এইভাবে তিনি তীর্থের পর তীর্থ শুধু ঘুরে চলেছেন। তিন বছর ধরে চলে তাঁর তীর্থপরিক্রমা। কখনও সংগী পান, কখনও একা, তবে চিরসংগী দামোদর আছে তাঁর গলায় ঝোলানো।

ধীরে ধীরে তিনি সন্ন্যাসিনীর বেশই ধারণ কোরলেন, মাথার চুল ছোট কোরে ফেললেন—পরনে গেরুয়া, হাতে রুদ্রাক্ষের বালা। কত লোকে তাঁকে কত প্রশ্ন কোরেছে তিনি শুধু বোলেছেন তিনি তাঁর স্বামীর নির্দেশেই এ পথে এসেছেন। স্বামী তাঁর সংগেই আছেন। যদি কেউ তাঁর স্বামীকে দেখতে চেয়েছেন সংগে সংগে তিনি গলায় ঝোলানো দামোদরকে দেখিয়ে দিয়েছেন!

যাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা হাত জোড় কোরে প্রণাম কোরে বোলেছেন—তুমি তো চিরসধবা, জগৎস্বামীই যে তোমার স্বামী, গৌরীমার কঠিন তপস্যা স্বরু হোয়ে যায়, কখনও সকালে বসেন তো দিন কেটে যায়, রাতও শেষ হোয়ে যায়, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, কোন আলস্য নেই।

কোন এক মহাপথের আলো দেখতে বুঝি তিনি পেয়েছেন তা না

হোলে সব কিছু ভুলে তিনি এভাবে কি কোরে কাটান, অমৃতপথ যাত্রী তিনি, তাঁর তপস্যা কখনও ব্যর্থ হবার নয়।

গৌরীমার জীবনে এবার কঠোর কৃচ্ছসাধন সুরু হোয়ে গেলো। এত ভাবাবেগ তাঁর দেহে মনে এসেছে যে কোন কিছুই তাঁর খেয়াল নেই। পাহাড়ের পথে চলতে চলতে তিনি একবার পার্বত্য নদীর ভিতরে পড়ে যান। তাঁর যেন কোন জ্ঞান নেই, বরফগলা জলে ভাসতে ভাসতে তিনি চলেছেন যখন জ্ঞান হোল তিনি দেখলেন চারিদিকে বরফের চাঙড় আর তিনি তার মধ্যে দিব্যি বসে আছেন। চারিদিকে তাকালেন তিনি—কই কোনদিকে তো কোন পথ নেই। গলায় তাঁর দামোদর ঝুলছেন। এ কোথায় তিনি এলেন। কোন জনমানবেরও সাড়া এখানে মেলে না।

এমন সময় একজন পাহাড়িয়া রমণী এসে তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে একটা পাহাড়িয়া পল্লীতে নিয়ে এসে হঠাৎ অদৃশ্য হোয়ে গেলেন। আর তিনি সে রমণীর সন্ধান পেলেন না। তাঁর কোন বিপদ কি হতে পারে। তিনি যে একজনের ওপর নির্ভর কোরে আছেন।

হিমালয় পাদদেশে ঘুরতে ঘুরতে কতবার যে গৌরীমা পথ হারিয়েছেন তার হিসাব নেই, কতবার তিনি ভীষণ ভয়াল শ্বাপদশঙ্কুল বনে গিয়ে পড়েছেন, কতবার তিনি পথ চলতে রাত্রি হোয়ে যাওয়ায় বনের মাঝে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু কোন এক অদৃশ্যশক্তি তাঁকে উদ্ধার কোরেছে।

গৌরীমা হিমালয়ে তপস্যা কোরতে কোরতে একবার ব্রজভূমি পরিক্রমা করার ইচ্ছে হওয়ায় তিনি মথুরায় চলে আসেন। এখানে এসে তিনি তাঁর একদূর সম্পর্কের কাকার দেখা পান তিনি তাঁকে একরকম জোর কোরেই তাঁর বাসায় নিয়ে আসেন।

গৌরীমা আবার জড়িয়ে পড়লেন নতুন জালে। যমুনায় স্নান কোরবার সময় তাঁর যেন মনে হোল কে তাঁকে অনুসরণ কোরছে,

স্নান সেরে উঠলেন তিনি। ছোট একটা ছেলে ভারী অপরূপ তার চেহারা হঠাৎ তাঁর পিছু নিল।

গৌরীমা তাকে ডাকলেন কাছে—এই তোর নাম কিরে ?

ছেলেটা হাসতে হাসতে বোললে—দামোদর।

গৌরীমা যেন চমকে উঠলেন ! দামোদর, হ্যাঁ দামোদরইতো, এমন সুন্দর চেহারা কি দামোদর ছাড়া আর কারও হয়।

গৌরীমা রহস্য কোরে বোললেন, তোমার মাথায় চূড়া কই, পায়ে নূপুর কই, হাতে বাঁশীই বা কই !

কেন বিশ্বাস হোচ্ছেনা বেশ আমি চললাম, কিন্তু তুমি আর বেশী দেরী কোর না তোমাকে ধরতে লোক আসছে !

ছেলেটা পথ চলতে চলতে অদৃশ্য হোয়ে গেলো। আর তাকে দেখা গেলো না। এক লহমায় কোথায় যেন হাওয়ার মত মিলিয়ে গেলো। সেই রাত্রেই তিনি মথুরা ত্যাগ কোরে অন্যপথ ধরলেন। সে পথ দ্বারকার তাঁর দামোদরের বিরহ মিলনের লীলাক্ষেত্র। এখানেই ভারতের আর এক সাধিকা মীরাবাঈ সাধনার শেষ কোরেছেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিশে গিয়ে।

গৌরীমা কাঁদছেন, চোখের জলে বুক ভেসে যায়, দামোদরও ভাসছেন তাঁর চোখের জলে। এ দেহ মন প্রাণ তিনিও বিসর্জন দিতে চান ঐ কৃষ্ণসরোবরে, কিন্তু এমন সুকৃতি কি তাঁর হবে !

কৃষ্ণময় মন হোল তাঁর ! কোথায় গেলে তিনি তাঁর দেখা পাবেন, কত তীর্থেই তো তিনি ঘুরলেন, কই কোথায়ও তো তাঁর দেখা পেলেন না। এমন কৃষ্ণপাগল হোলেন যে আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়ে তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন আর মনে মনে বলেন—প্রভু, তোমার জন্য যে আমি সব ছেড়েছি, তোমার সেবা কোরে সুখী হ'বো বলে সেই আশায় দিন কাটাচ্ছি আর তোমার তবুও দয়া হোচ্ছেনা, তুমি যদি আমাকে দেখা না দাও তাহালে এ জীবন আর আমি রাখবো না।

তিনি দৃঢ়সংকল্প কোরে জলে ঝাপ দিলেন গভীর রাতে, কৃষ্ণ কালো অন্ধকার রাত। যমুনার কালো জলে কৃষ্ণেরই ছায়া। তর তর কোরে বয়ে চলেছে রাতের যমুনা। যেন বোলছে—ওরে তোর যে এখনও কাজ বাকী আছে।

পরদিন সকালে দেখেন যে গৌরীমার দেহ যমুনার পাড়ের ওপর পড়ে আছে, মরা হোল না গৌরীমার, মনের ব্যথা মনে নিয়েই তিনি ধীরে ধীরে উঠে এলেন। তিনি যেন পাগলের মত চলেন পথ বেয়ে, কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন। কৃষ্ণপ্রেমে যে পাগল তাঁর এই ভাবই কৃষ্ণভাব।

গৌরীমার জীবন যেন চলমান, থামলেই যেন তাঁর জ্বালা বাড়ে। ভাবেন ঐ বুঝি আবার জড়িয়ে পড়লেন. তিনি কাশী গেলেন সেখান থেকে সোজা হৃষিকেশ, এখানে এসেই তিনি এক সাধুর দর্শন পান। তিনি গৌরীমাকে নির্দেশ দিলেন বাড়ী ফিরে যাবার জন্য কারণ তাঁর মার জীবন শেষ হোয়ে আসছে।

গৌরীমার অন্তরাত্মা হাহাকার কোরে উঠলো। যে মা তাঁর হাত ধরে তাঁকে এই পথে ঠেলে দিয়েছেন তাঁর শেষ সময়ে নিশ্চয়ই তাঁর আশীর্বাদ কামনা করেন। ফিরে এলেন তিনি তাঁর মায়ের পাশে।

মা মেয়েকে পেয়ে ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

গৌরীমা বোললেন—মা আমি শ্রীক্ষেত্রে যাবো, জগন্নাথদেবের চরণ দর্শন কোরবার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে।

মা আনন্দে তাকে শ্রীক্ষেত্রে যেতে বোললেন।

এরপর তিনি ফিরে আসেন কোলকাতায়।

এবার তিনি এসে উঠলেন বলরাম বসুর বাড়ীতে। বলরামবাবু প্রায় ফাঁক পেলেই দক্ষিণেশ্বরে যান, গৌরীমা একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস কোরলেন—রোজ কোথায় যাওয়া হয় শুনি?

বলরাম বসু জবাব দেন—দক্ষিণেশ্বরে একটি মহাপুরুষ বিচিত্র এক সাধন-ভজনের কারখানা খুলেছেন, কি অপরূপ, কি গভীর জ্ঞান, মনে

হয় যেন দিনরাত জ্ঞানসাগরে পানকৌড়ির মত ডুবছেন আর ভাসছেন। এমন আর হয় না। কত তীর্থ তো দেখে এলে এমনটি তোমার নজরে পড়েনি। চলো না একদিন দেখবে—

গৌরীমা বলেন—সাধু দেখার সাধ আমার মিটে গেছে। এখন যা দেখার জন্য ঘুরে মরছি তাই যদি দেখতে পেতাম তাহালে মরতেও আমার অসাধ ছিল না।

বলরাম বসু বললেন—তবুও বোলছি একবার চলো দেখে আসবে। এমন গৃহী মহাপুরুষ ভারতবর্ষে আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ, আমি অনুরোধ করছি তুমি একদিন চলো!

গৌরীমা পাগলের মত হাসতে থাকেন।

বলরাম বসু বলেন এত হাসছো যে—

হাসবো না তো কাঁদবো নাকি—তোমার সাধুর যদি গুণ থাকে তাহলে গুনটেনেই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন! আমি আগে তাঁর কাছে যাবো না, তা তিনি যতবড় মহাপুরুষ হন না কেন! প্রকৃত ভক্তেরই এমনি ধারা মনের জোর হোয়ে থাকে।

ভক্তের ডাকে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে। ডাকের মত ডাক তাঁর কানে গেলে তাঁকে চঞ্চল হোতেই হবে। বলরাম বসুর বাড়ীতে সিংহাসনে বসে আছেন দামোদর। এখানে গৌরীমা তাঁর নিত্যপূজা, নিত্যভোগারতি করেন। গৌরীমা সেদিন দামোদরকে স্নান করাচ্ছেন আর আপনভাবে বিভোর হোয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন স্নান শেষে দামোদরকে সিংহাসনে রাখতে গিয়ে দেখেন সিংহাসনের ওপর দুখানা কাঁচা মানুষের পা রয়েছে, বার বার দেখেন কিছুই বুঝতে পারেন না। দামোদরকে হাতের ওপর ধরে তিনি বেতশ পত্রের মত কাঁপছেন। কেন এমন হোল! হঠাৎ হাত থেকে দামোদর পড়ে গেলেন মাটিতে। তার অন্তর কেঁদে উঠলে—এ রকম হোল কেন? কি তাঁর অপরাধ কে জানে! দামোদরের পায়ে বার বার তুলসী দেন আর সেই তুলসীপত্র ঐ কাঁচা পা দুখানার ওপর গিয়ে পড়ে।

গৌরীমা চঞ্চল হোয়ে পড়েন। বার বার দামোদরের পায়ে মাথা ঠোকেন আর চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়।

বলরাম বসুর পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবী গৌরীমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকছেন অনেকক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলে চান। চোখ মেলার পর তাঁর আর এক উপসর্গ দেখা দেয়। বার বার তিনি বুকে হাত দেন আর তাকান।

কৃষ্ণভাবিনী বলেন কি হোল মা অমন কোরছেন কেন ?

কি জানি কেবলই আমার মনে হোচ্ছে কে যেন আমাকে সূতো বেঁধে টানছে অথচ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে আবার কি ! সূতো আবার কে বেঁধে দিল !

রাতে গৌরীমার ভাল ঘুম হয় না। সারারাত বিছানায় ছটপট করেন। শেষরাতে গৌরীমা তন্দ্রাচ্ছন্ন হোলেন। স্বপ্নে কে যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। গৌরীমা বোলে উঠলেন কে ?

ওরে মা ভাল কোরে দেখতো চিনতে পারিস কিনা, শুনলাম আমি না টানলে নাকি তুই আমার কাছে যাবিনে তাই তোকে টানছি। দেখতো, আমার কত কাজ বাড়িয়ে দিয়েছিস—তোকে ঘুড়ি কোরে বেঁধে দক্ষিণেশ্বরে আমি লাটাই হাতে কোরে বসে শুধু পাক দিচ্ছি। খুব ভাল ভক্তির মাঞ্জা দেওয়া সূতো কিনা তাই তুই আর থাকতে পারছিস না। আয়, আয় এবার কাছে আয়।

ঘুম ভেঙে যায় গৌরীমার। রাত পোহালে গৌরীমা আর ঘরে থাকতে পারেন না। পা বাড়ান দক্ষিণেশ্বরের পথে।

সংগে চললেন বলরাম বসু আরও অনেকে। গৌরীমার রাতের সে তন্দ্রাভাব যেন তখনও কাটেনি। নিজের যেন কোন শক্তি নেই—কে যেন তাঁকে যন্ত্রচালিতের মত টেনে নিয়ে চলেছে।

গংগার ধারে পঞ্চবটিতে বসে আছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের সংগে কথা বোলছেন আর আপন মনে একটা কাঠিতে সূতো জড়াচ্ছেন।

গৌরীমা ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পা দুখানা দেখে তিনি চমকে উঠলেন—এই তো সেই পা দুখানি যে পা তিনি দামোদরের সিংহাসনে দেখেছিলেন।

রামকৃষ্ণ গৌরীমাকে আসতে দেখে সুতো জড়ানো কাঠিটা একপাশে রেখে দিলেন।

গৌরীমা প্রণাম কোরলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। তাঁর দেহ যেন হালকা হোয়ে গেলো।

বলরাম বসু বোললেন ঠাকুরকে—কাঠিতে সূতো জড়ানো কেন!

ঠাকুর হেসে বোললেন—ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম। এখন ঘুড়ি নামিয়ে নিলাম।

ঘুড়ি আবার কোথায়?

খুঁজে দেখো ঠিক পাবে। বা-বা! এ কাগজের ঘুড়ি নয়—এ ঘুড়ির কাঠি বাঁধা ভক্তির সূতো দিয়ে, কাগজ মোড়ানো ভাবের আঁঠা দিয়ে, ভারী শক্তরে, বাতাসে ফাটেনা, ছেড়ে না।

গৌরীমা মনে মনে ভারী খুশী হোয়েছেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে। এমন আনন্দময় মহাপুরুষ বহুভাগ্যে মেলে। গৌরীমা ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন!

ঠাকুর আবার হাসলেন—ওরে বাবা এ মেয়ে কে গো! ওর শরীরে যে যোগের বাসা, ওর সারা দেহে ভক্তির মালমশলা ভর্তি, ও তো যে সে মেয়ে নয়।

গৌরীমা প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়ালেন!

ইস্ চোখে মুখে দেবভাব যে ফেটে পড়ছে! আবার আসবি তো না আমাকে আবার টানতে হবে! ঠাকুর আর কোন কথা বোললেন না। চোখ বুজে বিড়বিড় কোরে শুধু মা মা কোরে ডাকতে থাকেন। তাঁর চোখদুটো অশ্রুসিক্ত হোয়ে যায়।

গৌরীমা ধীরে ধীরে চলে আসেন পঞ্চবটি ছাড়িয়ে।

কৃষ্ণভাবিনী বোললেন—একেই বলে ভাগ্য! আমরা তো কতজনই এলাম কিন্তু ঠাকুর চিনলেন শুধু ওঁকে!

বলরাম বসু জবাব দেন—গৌরীমা যে খাঁটি সোনা তাই পাকা জহুরী ঠাকুরের চিনতে দেরী হোল না।

গৌরীমা চলেছেন। মুখে কোন কথা নেই—শুধু আপনমনে পথ চলেছেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরলেন বটে গৌরীমা কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল সেখানে, শুধুই মনে হোতে থাকে আবার কবে যাবো!

পরদিন আবার গেলেন গৌরীমা।

ঠাকুর যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলেন।

বোললেন—আয় তোর জন্য যে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!

গৌরীমা জবাব দিলেন—আমিও তো রাত থেকে ছটফট কোরছি কখন আসবো।

ঠাকুর তাঁকে নহবত খানার দিকে নিয়ে চললেন।

গৌরীমা বোললেন—কোথায় চললেন ?

আয় না, এখানে শুধু ভবতারিণীই নেইরে আরও একজন আছেন তিনিও কম যান না তাঁর কাছেই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

মা সারদামণি তখন নহবতখানায় রয়েছেন।

ঠাকুর বোললেন—দেখো গো কাকে ধরে এনেছি, নাও তোমার একজন সংগী হোল।

শ্রীশ্রীমা গৌরীমাকে আদর কোরে বসালেন কাছে। বোললেন—তুমি আমার গৌরদাসী।

ঠাকুর বোললেন একটু হেসে—বেশ হোল, একে সারদা তার ওপর আবার হোল গৌরদাসী, জ্ঞানের সংগে ভক্তির যোগাযোগ হোল।

জয় মা, জয় মা! বোলতে বোলতে ঠাকুর মন্দিরের দিকে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়ে। গৌরীমার যেন আর ফেরবার ইচ্ছে নেই। এ জায়গা থেকে ফিরবার ইচ্ছা কার হয় ?

ঠাকুর এলেন এমন সময়। গৌরীমা তখন জপের যায়গা কোরছেন, ঠাকুর বোলে উঠলেন—ওরে আগে দুটো মুখে কিছু দিয়ে নে, তারপর

জপতপ। মা ভবতারিণী আমাদের তো পরম আপনজন দেহমন সুস্থ কোরে তবে জপতপ। তবে বাপু তোর মত এত কঠোর তপস্যা আমি আর কাউকে কোরতে দেখিনি—এমন তপস্যায় ভগবান তো ছেলে মানুষ তার ওপরও যদি কেউ থাকে তাহালে সেও ধরা দিতে বাধ্য।

গৌরীমা বলেন—তোমাকে বাঁধতে হোলে এর চেয়ে বড় তপস্যার প্রয়োজন।

বলে কি, আচ্ছা মা, আমাকে তুই কি ভাবিস?

কি আবার ভাববো, তুমি তো সেই!

ঠাকুর আনন্দে গদগদ হোয়ে সবাইকে বলেন—ওগো তোমরা শুনছো তোমাদের গৌরীমা কি বোলছে, বোলছে আমি নাকি সেই! কি যে বলে এরা, জয় মা, জয় মা, এদের কথা তুই শুনিস নে!

সেবাধর্ম কি তা ঠাকুর রামকৃষ্ণ গৌরীমাকে বেশ ভালভাবে হৃদয়ে গেঁথে দিলেন ধীরে ধীরে। মানুষের ওপর আর কে আছে? সেই মানুষের সেবাই তো ঈশ্বর সেবা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গৌরীমার ওপর ভার দিলেন এই কাজের! ঠাকুর বোললেন গৌরীমাকে—তুই কে জানিস! তুই যে ব্রজের মেয়ে, তুই শুধু যোগিনী নোস, তুই গোপীনি।

শ্রীশ্রীমাও বোললেন—গৌরদাসী বৃন্দাবনেরই একজন, সেই ভাব ওর মধ্যে সব আছে।

গৌরীমা নারীজাতির দুর্দশা লাঘব কোরবার সংকল্প নিলেন। এ দেশের মেয়েদের ভিতর বড় অজ্ঞতা, তারা যেন জনমদুঃখিনী, তারা বড়ই অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা। তাদের এ দুঃখ দূর কোরতেই হবে, চিরকাল তারা শুধু অত্যাচার সয়েই যাবে, না তা হবে না—

ঠাকুর ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ দেহত্যাগ কোরলেন গৌরীমা তখন বৃন্দাবনে, বৃন্দাবন থেকে এসে যখন শুনলেন যে ঠাকুর নেই তখন তিনি কচি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। এমন গুরু পেয়েও তিনি

হারালেন। এ দেহধারনের আর কি প্রয়োজন তাঁর, তিনিও দেহত্যাগ কোরবেন ঠিক কোরে ফেললেন।

অন্তর্যামী ভগবান রামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে দেখা দিয়ে বোললেন—তোর কি মাথা খারাপ হোল নাকি, ওরে তোর মরা এখন চলবেনা, কাজ যে এখনও অনেক বাকী।

গৌরীমা প্রকৃতিস্থ হোলেন।

আবার তিনি মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার প্রভৃতি যায়গা ঘুরে কিছুদিন বাদে কোলকাতার বরানগরে ফিরে এলেন। বরানগরে এক ভাড়াটে বাড়ীতে তখন মঠ প্রতিষ্ঠা হোয়েছে। তিনি মঠে আর গেলেন না কারণ মঠে মেয়েদের যাওয়ার নিয়ম নেই।

স্বামী বিবেকানন্দর কানে এ সংবাদ পেঁাছানো মাত্র তিনি ছুটে এসে বোললেন—মা তুমি যে আমাদের মা, তোমার মঠে গেলে কোন দোষ নেই।

স্বামী বিবেকান্দ গৌরীমাকে জোর কোরেই ধরে নিয়ে গেলেন।

গৌরীমা বোললেন—তোমার হাত থেকে রক্ষা পেলাম না তাই আসতে হোল।

আমাদের ফেলে তুমি যাবে কোথায় মা ?

কিন্তু আমার কাজ এখনও বাকী রয়েছে আমার কি থাকলে চলে। যেতে আমাকে হবেই আজ হোক আর কাল হোক। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বোললেন—আমাকে বুঝি কেউই চান না।

আবার শুরু হোল তীর্থ পরিক্রমা।

রাজমহেন্দ্রী, মাদুরা, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, পক্ষীতীর্থ, শিবকাঞ্চী, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী প্রভৃতি ঘুরে আবার কোলকাতায় ফিরে এলেন। দামোদরের আপনজন ছাড়া এমন কোরে আর কে টেনে নিয়ে বেড়াতে পারে এত তীর্থ তিনি ঘুরেছেন কিন্তু দামোদরের সেবাযত্নের কোন ত্রুটিই হয়নি। নিত্য চণ্ডীপাঠ তাঁর দৈনন্দিন কর্মেরই একটা অংগ ছিল। এমন সুন্দর চণ্ডীপাঠ বড় বড় পণ্ডিতেও বোধ হয় কোরতে পারতেন

না। তাঁর চণ্ডীপাঠ একবার যার কানে যাবে তাঁকে থমকে দাঁড়াতেই হবে।

দীর্ঘ তীর্থপর্যটনে গৌরীমার মন বড় ব্যথাতুর হোল মাতৃজাতির দুর্দশা দেখে। মেয়েদের ওপর যা অত্যাচার হয়, যে ভাবে তারা অপমানিতা লাঞ্ছিতা হয় তা চোখে দেখা যায় না। নারী হোয়ে জন্মানোটা কি একটা অপরাধ? যাদের কোলে লাখো লাখো সন্তান মানুষ হোচ্ছে। যারা জীবপালিনী তাদের এ কি দুর্দশা? কোনখানে স্বামীর অত্যাচারে গৃহলক্ষ্মী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কোনখানে পুত্র মাতাকে নিপীড়ন কোরছে। চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে গর্ভধারিণী! না এ ব্যবস্থার একটা প্রতিবিধান করতেই হবে!

এই পবিত্র সংকল্প নিয়ে তিনি ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা কোরলেন। ধীরে ধীরে অনেক কুমারী, বিধবা ও সধবা এই আশ্রমে এলো।

দেখতে দেখতে কয়েক মাসের ভিতর মানুষের দানে আশ্রমের চেহারা পাল্টে গেলো। আশ্রম যেন একটা তীর্থে পরিণত হোল। কত যায়গার লোক আসে যায়। গৌরীমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে চলে যায়।

মাতৃজাতিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। যে সমস্ত পুরুষ ভক্ত তাঁকে দর্শন কোরতে আসতো তিনি তাদের বোলতেন—মাতৃজাতি তোমাদের শ্রদ্ধার পাত্রী, জগতের যে কল্যাণ চায় তাকে মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা কোরতে জানতে হবে তারা মেয়ে মানুষ শুধু নয় তারা জগৎপালিকা। তারা মহাশক্তির অংশ!

পিতামাতা হোলেন সাক্ষাৎ ইষ্ট—গৌরীমা আশ্রমের বালক বালিকাদের এই শিক্ষাই দিতেন।

কালে কালে যখন মানুষের ভিতর ভক্তিশ্রদ্ধাভাব নিভে যায় তখনই ঈশ্বর প্রেরিত এক একজন দূত এসে অবতীর্ণ হন।

গৌরীমা হোচ্ছেন সেই দেবদূত। তিনি মানুষের ঘুমন্ত জীবনকে

জাগাতে এসেছেন। গৌরীমা আশ্রমের কাজে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন তাঁর আসল কাজ কিন্তু কখনও ভুল হোত না। তাঁর প্রাণপ্রিয়তম দামোদরের সেবা তাঁর নিত্যপূজা কোনদিন এদিক ওদিক হয়নি। কতখানি নিষ্ঠা থাকলে মানুষ এ কাজ কোরতে পারে।

কেউ কেউ বোলত ধন্যি মেয়ে বাবা! একটা পাথরের টুকরো বুকে কোরেই সারা জীবন কাটিয়ে দিলে।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার ভিতরেও ঐ পাথরের টুকরার কথা তাঁর বিস্মরণ কোনদিন হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ গৌরীমাকে বড় ভক্তি কোরতেন। তিনি সবাইকে বোলতেন—গৌরীমার মত শক্তিময়ী অরও যদি দেশে কয়েকজন থাকতো তাহালে দেশের চেহারা পাল্টে যেতো।

স্বামী বিবেকানন্দ গৌরীমাকে একদিন বোললেন—আমি তো এবার চললাম, তুমি রইলে তাই শান্তিতে আমি যেতে পারবো।

গৌরীমা সংগে সংগে তাড়া দিয়ে বলেন—ঐসব অলক্ষুণে কথা তোমার কাছে কি আমি শুনতে চেয়েছি!

ঠাকুর আমাকে টানছেন আমার তো থাকার উপায় নেই, তোমরা মায়ের জাত বড় কাতুরে, যতই সাধন-ভজন করো কিন্তু সন্তানের অমংগল হোক এ কামনা তোমরা কখনই কোরতে পারো না।

১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসে বেলুড়মঠে স্বামীজি দেহ রক্ষা করলেন।

গৌরীমা কাঁদছেন। সন্তান বিয়োগে মা যেমন কাঁদে—

এবার গৌরীমা আশ্রম তুলে নিয়ে এলেন কোলকাতার গোয়াবাগানে। এ সময় তিনি খুব আর্থিক কষ্টে পতিত হন। আশ্রমের মেয়েদের জন্য মাঝে মাঝে তাঁকেও ভিক্ষে কোরতে বের হোতে হোত।

এই ভিক্ষে করা নিয়ে তাঁকে কতদিন কত প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হোয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গৌরীমাকে দেখলে তো আর ভিখারী বোলে মনে হোত না। তাঁর মাথায় সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁন্দুর। পরনে গেরুয়া। সারা চোখে মুখে এক অপরূপ জ্যোতিঃ যেন ছিটকে পড়ছে।

একদিন ভিক্ষে কোরতে গেলে একজন সভ্রান্ত ঘরের বৌ তাঁকে বোললেন—হ্যাগা তোমার স্বামী থাকতেও তুমি ভিক্ষে করো কেন!

গৌরীমা জবাব দেন—মাগো স্বামী যে আমার সন্ন্যাস নিয়েছেন। আমিও তাই এই বেশ ধারণ কোরেছি।

স্বামী বুঝি খুব দেবতার ভক্ত ছিলেন?

ভক্ত কি গো! তিনি সন্ন্যাস নিলে নদীয়ার সব মানুষ এমনভাবে কেঁদেছিল যে সব জল ধরে রাখতে পারলে আর একটা ছোট খাটো গংগা হোয়ে যেতো।

আহা অমন লোকের তো সন্ন্যাস নেওয়া উচিত হয়নি!

উনি সন্ন্যাস না নিলে যে জীব কাঁদবে না মা, জীবের মুক্তির জন্যই তো ওর সন্ন্যাস নেওয়া।

আহা! তবু ভাগ্যবতী তুমি, এমন লোকের ঘরণী হোতে পেরেছিলে। একটু চুপ করে থেকে পরে আবার তিনি বোললেন—আর কি শান্তিতে আমরা আছি, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা যে কি সাংঘাতিক তা তোমাকে কি বোলব। কোন সুখটা যে আছে তা তো বুঝতে পারিনে—

গৌরীমা এবার একটু হাসলেন—সংসারের থেকেও তো সৎ কাজ করা যায়! ঈশ্বর তো শুধু সন্ন্যাসীর নয়, ঈশ্বর তো গৃহীরও। তুমি এইখানে বসেই তাঁকে ডাকো মা। তোমার ডাক ঠিক তাঁর কানে পোঁছাবে।

গৌরীমা চলে যান ভিক্ষা নিয়ে।

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটিতে। এই সময় গ্রামের অনেকগুলো ছেলে মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধু হোয়ে যায়। কিন্তু গ্রামের মাতব্বরদের এসব মোটেই পছন্দ হোত না। তারা বোলে বেড়াতে লাগলো সারদামণি অজাত-কুজাতকে মন্ত্র দিচ্ছে।

মা একদিন গৌরীমাকে কথায় কথায় বোললেন—গৌরদাসী শুনেছো, এখানে সবাই বোলছে, আমি নাকি, সবাইকে সাধু বানিয়ে

ঘর থেকে বার কোরে দিচ্ছি। যত অজাতকে আমি দীক্ষা দিচ্ছি। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। সেখানে জাতও নেই অজাতও নেই।

গৌরীমা সবশুনে বোললেন—তোমার কাছে সন্ন্যাস পাওয়া তো মহাভাগ্যের কথা! যারা এইসব কথা প্রচার কোরে বেড়াচ্ছে তাদের কাছে গিয়ে গৌরীমা বোললেন—তোমরা এখনও মানুষ চিনতে পারলে না গো! উনি কি তোমার আমার মত সাধারণ মানুষ। উনি যে স্বয়ং নারায়ণী। মানবদেহ ধারণ কোরেছেন শুধু তোমাদের মুক্তির জন্য।

যারা বোলেছিল এসব কথা পরে তারা গৌরীমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোরল।

১৩২৬ সালে মা সারদামণির স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হোতে সুরু হোল। শত চিকিৎসাতেও মায়ের কোন উপকার হোলনা। দিন দিন শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হোতে লাগলো।

গৌরীমাও চিন্তিত হোয়ে পড়লেন, তিনি মায়ের কাছ ছাড়া হন না। সবসময় মায়ের সেবাযত্ন নিয়েই দিন কাটান।

একদিন বিকেলে মা বোললেন গৌরীমাকে—আর কেন মা এবার আমায় ছেড়ে দাও। আমি ঠাকুরের কাছে যাবো, আমার মন বড় ব্যাকুল হোয়ে পড়েছে।

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মংগলবার মা সারদামণি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চলে গেলেন।

গৌরীমা যেন এবার অকূলসাগরে পাড়ি দিলেন। কার কাছে তিনি উপদেশ নেবেন, কার কাছে তিনি জীবনের কথা শুনবেন, কে তাকে অভয়বাণী দেবেন।

গৌরীমা যেন মহাসংকটে পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি কি সংকটে পড়তে পারেন, সকল সংকটের ত্রাণ কর্তা যিনি তিনিই তো তাঁর কণ্ঠলগ্ন হোয়ে রয়েছেন। বিপদবারণ, পরিত্রাতা দামোদর রয়েছেন তাঁর সাথে সাথে। এত বড় আশ্রমের দায়ীত্ব যাঁর স্কন্ধে তাঁর কি বিচলিত হোতে চলে।

আশ্রমের মেয়েরা মাঝে মাঝে শংকিতা হোয়ে বোলত—মা আমাদের কি হবে!

ভালই হবে! হ্যাঁরে এই যে আশ্রম, এর যে বিরাট কাজে এ কি আমরা কোরলাম? সবই তো ঠাকুর আর মাই কোরেছেন! ওঁরা ছিলেন জীবন্ত দেবতা, বিশ্বাস কোরে সব চিন্তার ভার ওদের ওপর ফেলে দাও, সব ঠিক হোয়ে যাবে। ওঁরা তো বেশীদূর যান নি—ঠাকুর বোলতেন এ ঘর আর ওঘর। তবে আমরা ভেবে মরি কেন?

একটু থেমে বলেন—আজ ভারবর্ষের কে না জানে আমাদের আশ্রমের কথা। দেশবিদেশ থেকে কত বড় বড় লোকের আনাগোনা চলছে, এসব তো ঠাকুরই করাচ্ছেন!

আশ্রম যেন তীর্থক্ষেত্র। সবাই আসেন আর গোরীমাকে যতই দেখেন ততই চমকে যান!

মেয়েমানুষ হোয়ে গৌরীমা যা কোরলেন এদেশের কটা পুরুষমানুষ তা কোরতে পারে।

গৌরীমার জন্মতিথি উৎসব পালন কোরবার ভারী সাধ আশ্রম বাসিনীদের। কিন্তু গৌরীমার তাতে ঘোর আপত্তি। জন্মোৎসব কোরতে হয় ঠাকুরের করো, মায়ের করো, প্রভু নিত্যানন্দের করো আমার কেন!

গৌরীমা বোলতেন—আমি কে! মানুষের সেবা কোরবার সাধনা কোরতে এসেছি। মনেপ্রাণে আমি বিশ্বাস করি যে জীব সেবাই শ্রেষ্ঠসেবা আর এই সেবাই ঈশ্বর সেবা। জীবের মাঝেই তো শিব, সেই জীব সেবাই তো শিব সেবা। মহাভাগ্যবতী আমি যে ঘর সংসার ছেড়ে এসে তোমাদের সেবা কেরতে পারছি। জীবসেবার পথ তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। বাকী জীবনটাও এই ভাবেই আমি কাটিয়ে দিতে চাই! নাইবা পেলাম ঈশ্বরকৃপা, নাইবা হোল ঈশ্বরদর্শন। যা পেলাম এতেই আমর জন্ম সার্থক হোয়েছে।

গৌরীমার প্রাণের সমস্ত সত্তাটুকু যেন জড়িয়ে আছে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী

আশ্রমে। এই প্রতিষ্ঠান কে যেন তিল তিল কোরে তিনি তিলোত্তমা গড়ে তুলেছেন।

গৌরীমা বোলতেন—যে পবিত্র স্মৃতি বহন কোরছে এই আশ্রম তা পূর্ণ সফলতা লাভ কোরবে সেইদিন যেদিন এই আশ্রমে আমরা দেখতে পাবো শত শত আদর্শ গৃহিণী, শত শত জননী, শত শত সাধিকা।

গৌরীমার সে আশা পূর্ণ হোয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বোলতেন—মেয়েরা যদি সন্ন্যাসী হয় তাহালে কি আর সে মেয়ে থাকে। সে তখন পুরুষমানুষের প্রণম্য হয়!

সারদামণি বোলতেন—মেয়ে জাতটা কি শুধু ভোগের জন্য সৃষ্টি হোয়েছে? না ইচ্ছা করলে ওরাও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ হোতে পারে!

একাধারে তিনরূপ যাঁর। জননী জায়া কন্যা। নারী শক্তি কি তুচ্ছ? মহামায়ার মহাশক্তির অংশ যার মধ্যে তার দ্বারা যে কোন অসাধ্য সাধন সম্ভব।

গৌরীমা নিজে জেগে সবাইকে জাগাতে এসেছেন।

গৌরীমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি দূরের মানুষকে কাছে আনতো। কত মানুষ শোকে তাপে জর্জরিত হয়ে তাঁর কাছে এসে সব ভুলে গেছে তার কোন হিসাব নেই।

কত সন্তশোকাতুরা বিধবা আর পুত্রহীনারা এসে তাঁর পায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছে মাগো আমি যে সব হারালাম!

গৌরীমা তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন। মাগো কিছুই হারাও নি! যিনি জগৎস্বামী তিনি তো তোমার আছেন, কিছুই ভাবতে হবে না তোমাকে। তাঁর ওপর নির্ভর করো তিনি তোমার শান্তি দেবেন। কত পুত্রহারা জননীর চোখের জলে তাঁর দুচোখ ভেসে গেছে।

গৌরীমা সান্ত্বনা দিয়েছেন চোখের জল ফেলে পুত্রের অমংগল ডেকে এনো না। যাঁর ছেলে তিনি তাকে কোলে কোরে বসে আছেন তুমি

তাঁরই জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া কোরছিলে মাত্র, বেশীদিন পরের জিনিষ কখনও নিজের কাছে রাখা যায়। কেঁদোনা, এই সংসার কোরতে গিয়ে কত কষ্ট তা তো বুঝতে পারছো। যিনি তাই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন তাঁর দিকে একবার নজর দাও মা অনেক শান্তি পাবে।

আশ্রমে মানুষের ভীড়ের অন্ত নেই! গৌরীমা বিরক্ত হন না বরং পরম প্রীতিভরে সবাইকে ধর্মকথা শোনান।

সবসময় গৌরীমা মনের আনন্দে সবাইকে বলেন—তোমাদের কাউকে আমি আশ্রমে বাস কোরতে বলি না। ঘরে যাঁরা সাক্ষাৎ দেবতা আছেন তাঁদের সেবা করো. তাঁরা হোচ্ছেন স্বামী, পিতা মাতা তাঁদের সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা কোরলেই ঈশ্বরের পূজো করা হবে এর কত পূজা জগতে আর কি আছে।

গৌরীমা যেন সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন দুচোখে সমাজের কি ভাবে দিনের পর দিন অধঃপতন হোচ্ছে! মেয়েরা সাজ পোষাকের দিকে নজর দিচ্ছে বেশী। কি কোরলে তাকে ভাল দেখায় শুধু এই চিন্তা বাইরে এই সজ্জাতে দেহের লজ্জা ঢাকা যায় না।

অন্তরের সজ্জাই আসল সজ্জা। অন্তরের প্রসাধনই আসল প্রসাধন

গৌরীমা চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণার সংগে যারা পরিচয় লাভ কোরেছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন গৌরীমা ছিলেন জলন্ত মশাল, এ মশালের আগুনে দেশের অন্যায় অত্যাচার একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গৌরীমা তো শুধু বাংলায় মেয়ে নয়, ভারতের মেয়ে নয়, তিনি যে স্বয়ং জগৎজননী জীবপালিকা বরাভয়দায়িনী আদ্যাশক্তির অংশ।

গৌরীমার জীবনটা যেন একটা চলমান বাষ্পীয়যান, থামেন অল্প চলেন বেশী। তিনি আবার দেশপরিক্রমায় বার হোলেন, সারা বাংলায় দেশ তো আছেই ভারতেরও বিভিন্ন প্রান্ত তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বিভিন্ন দেশে গিয়ে গৌরীমা যে কত শত প্রশ্নের সম্মুখীন হোয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু তিনি সবাইকেই সহজ সরলভাবে ঈশ্বর ভক্তির কথা জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গৌরীমার সংস্পর্শ, ঈশ্বর সংগ লাভ। কত ভক্ত তাঁর সংস্পর্শে এসে ভক্তি পথের সন্ধান পেয়ে গেছে। এই রকম এক ভক্ত ছিলেন গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পরে ইনি ললিতাসখী নামে পরিচিত হন। তাঁর সাধন-ভজনের মূলে গৌরীমা। তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতে শুনতে তিনি একদিন গৃহত্যাগ কোরে সিদ্ধসাধক চরণ দাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নেন।

তাঁর সংগলাভ যাঁরাই কোরেছেন তারাই উপলব্ধি কোরেছেন যে গৌরীমা অন্তরে পুরুষ বাহিরে প্রকৃতি, দূর থেকে দেখে তাঁকে ভয়ই হয় কিন্তু কাছে গেলে মনে হয় বটগাছের ছায়া। সারা শরীর ঠাণ্ডা হোয়ে যায় ঐ স্নেহছায়ায়।

গৌরীমার চলন্ত জীবন যেন রেলগাড়ী কিন্তু আর তা ভালোভাবে .ত চায় না। তখন বুঝি থামার সময় হোয়েছে।

ষ্টেশন মাষ্টার সবুজ আলোর সংকেত পাঠাচ্ছেন। এটুকু রাস্তা যে ভাবে হোক তাঁকে যেতেই হবে।

গৌরীমার শরীর ক্রমশঃ যেন খারাপই হোতে থাকে। এর মধ্যে লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই।

একজন মহিলা এসেছেন গৌরীমাকে প্রণাম কোরতে।

গৌরীমা বোললেন—দূর থেকেই প্রণাম কোরলেই চলবে, অসুস্থ শরীরে প্রণাম গ্রহণ কোরতে নেই।

মহিলাটি দূর থেকে প্রণাম কোরলেন।

শ্রদ্ধা ভক্তি কে চায় মা আজকাল, সবাই তো চায় রোগ সারিয়ে দাও, ছেলেটা খেতে দেয় না ওর মতিগতি যাতে ফেরে সে ব্যবস্থা কোরে দাও, চাকরী নেই, চাকরী যাতে হয় সেই পথ দেখাও, ভক্তি ঐশ্বর্য কে চায় মা?

গৌরীমা যেন আর কথা বোলতে পারলেন না। সবাই ঘর থেকে

চলে যায়। দিন দিন গৌরীমা দুর্বল হোয়ে পড়েন, আশ্রমের সবাই চিন্তিত হোয়ে পড়লেন।

ডাক্তার আসছেন যাচ্ছেন ওষুধ দিচ্ছেন কিন্তু কোন পরিবর্তন হোচ্ছেনা। সুরু হোল এবার কবিরাজী চিকিৎসা।

কবিরাজ নাড়া দেখে চমকে যান বলেন—নাড়ীর যা কাজ চলছে তাতে তো এ মানুষ যে কি কোরে এখনও আছেন ধরতে পারছি না।

গৌরীমা শীর্ণ দেহ নিয়ে শুয়ে আছেন। গলায় দামোদর বাঁধা আছেন, তিনি যে সংগের সাথী।

কয়েকদিন পর তিনি হঠাৎ বোললেন—ওরে আর বোধহয় থাকবো না।

এবার যে সূতোয় টান পড়েছে—ঠাকুর আবার সূতো জড়াচ্ছেন তাই তো বুঝতে পারছি কেন টান লাগছে।

দামোদর সিংহাসনে বসে আছেন। গৌরীমা তাকে সিংহাসনেই রাখতে বোলেছেন। একদিন শেষরাতে তিনি দামোদরকে তুলে আনতে বোললেন। দামোদরকে বুকে নিয়ে তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন। তাঁর দুচোখে জলের ধারা।

গৌরীমা বোললেন—ভারী সুন্দর লাগছে দামোদরকে—ওগো শুনছো আমাকে আশীর্বাদ করো যেন জনমে জনমে তোমার চরণে আশ্রয় পাই। পরে তিনি মন্ত্রশিষ্যা দুর্গাপুরী দেবীর হাতে দামোদরকে তুলে দিলেন। দুর্গাপুরী দেবা কাঁদছেন।

আর কথা নয়। এবার ঘুম, অনন্ত ঘুম। সারা জীবন ধরে তিনি বহু ঘুরেছেন, কত ক্লান্ত, এবার মায়ের কোলে ফিরে যেতে হ'বে।

ষ্টেশন মাষ্টার সবুজ আলোর সংকেত কোরছেন।

এবার গাড়ী ছাড়তে হ'বে নিত্যধামের দিকে।

১৭ই ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল মংগলবার রাত আটটা পনেরো মিনিটের সময় গৌরীমার জীবনের প্রদীপ নিভে গেল।